শ্রী
পরমাপ্রকৃতি
শ্রীশ্রী
সারদামণি
শ্রী
শ্রী
শ্রী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিগনেট প্রেস ।। কলকাতা ২০

পরমপূজনীয়া

শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণকমলেষু

....

সেবক
অচিন্ত্য

তৃতীয় সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৩৬২
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
ফটোগ্রাফ পাঁচখানা
গগনেন্দ্রনাথের মূল সংকলন
থেকে সংগৃহীত
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
প্রচ্ছদপট ও আর্টপ্লেট
গসেন এণ্ড কোম্পানি
৭।১ গ্রাণ্ট লেন
কাগজ সরবরাহক
রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সনস লিঃ
৩৪এ ব্রেবোর্ন রোড
ব্লক
রূপমুদ্রা লিমিটেড
৪ নিউ বহুবাজার লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রীট
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দাম চারটাকা

... ভূমিকা ...

ভগবানের কাছে আমরা কী চাই? চাই অহেতুকী কৃপা। আর, ভগবান আমাদের কাছে কী চান? চান অমলা অনিমিত্তা ভক্তি। অকারণের ভালোবাসা।

যেমন ভালোবাসা প্রহ্লাদের। ধ্রুব যে তপস্যা করেছিল, বিমাতার দুর্বাক্যে বিদ্ধ হয়ে, মনে অভিমান নিয়ে, রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায়। কাঁচ কুড়োতে এসে মণি পেয়ে গেল। তণ্ডুল যা পেল তা সতুষ তণ্ডুল, কামনার দাগ-ধরা। কিন্তু প্রহ্লাদ যে কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসে তা সে নিজেও জানে না। হাতির পায়ের নিচে ফেলছে তখনও হরি, পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলছে তখনও হরি। তারপর যখন হিরণ্যকশিপু নিহত হল ভগবান প্রহ্লাদকে বর দিতে চাইলেন। প্রহ্লাদ বললে, আমি কি বণিক, আমি কি ব্যবসা করতে বসেছি? আমি তোমাকে ভালোবেসেছি বিনিময়ে কিছু লাভ করবার জন্যে?

সংসারে এমনিধারা কিছু না চেয়ে অপ্রয়োজনে ভালোবাসি আমরা কাকে? একমাত্র মাকে। সন্তান যখন মাকে ভালোবাসে, জিগগেসও করে না, মা, তুমি কি রূপসী, না, বিদুষী, বা, তোমার ক্যাশবাক্সে কত টাকা আছে, বা, তোমার সোয়ামী কী চাকরি করে! তার মা আছে এই তার ঐশ্বর্য। চীরবাসা ভিখারিনী যে মা, তার কোল ছেড়ে তার শিশু যায় না কোনো হাত-বাড়ানো রাজেন্দ্রাণীর কোলে।

ভগবানকে যাতে আমরা অহেতুক ভালোবাসতে পারি তারই জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ 'মা'-মন্ত্র রচনা করেছেন। আর, তিনি শুধু মন্ত্রই দেননি, সঙ্গে-সঙ্গে দিয়েছেন তার বিগ্রহ। 'মা'-মন্ত্রের ঘনীভূত মূর্তিই হচ্ছেন সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত বাক্যের ব্যাখ্যা, সমস্ত কর্মের মূলমর্ম।

সংসারে সঙও আছে সারও আছে। মায়াও আছে বস্তুও আছে। সার যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা মাতৃত্ব ছাড়া আর কি। আর, এই সার যিনি দেন তিনিই সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনার সারভূতা প্রতিমা।

মা যখন সন্তানকে মারেন সন্তান তখনও মাকেই জড়িয়ে ধরে, তখনও মা-মা বলেই কাঁদে। কেননা সে জানে যে নয়ন তিনি অশ্রু দিয়ে ভরেছেন সেই নয়নই তিনি আবার স্নেহচুম্বনে ভরে দেবেন॥

১৩০৫ সাল   পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

'হ্যাঁ রে, বিয়ে করবি?'

দুই বছরের মেয়ে, মা'র কোলে বসে গান শুনছে। শিওড়ে মা'র বাপের বাড়ি, সেই গাঁয়ে। এদিকে বসেছে মেয়েরা, ওদিকে জায়গা ছেলেদের। সব কাছাকাছি, এক ঘেরের মধ্যে।

'কি রে, বিয়ে করবি?' মা'র সখী না আত্মীয়া, কে জিগগেস করল ঝুঁকে পড়ে। স্নেহপ্রসন্ন পরিহাসের ভঙ্গিতে।

করব। দু বছরের মেয়ে দিব্যি ঘাড় কাৎ করল। হাসল গাল ভরে।

'সে কি রে? কাকে বিয়ে করবি?'

আঙুল তুলে স্পষ্ট দেখিয়ে দিল। ওই যে, ওই ছেলে। ওই আমার বর। আমার পুরুষ।

সবাই দেখল অবাক হয়ে।

যাকে দেখাল সে কে? চেন না বুঝি? মেয়ের চেয়ে আঠারো বছরের বড়। নাম গদাধর। কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুজ্জের তৃতীয় ছেলে।

আর যে দেখাল? তার নামটি সারদা। বাপের নাম রাম মুখুজ্জে। বাড়ি জয়রামবাটি।

'আমার জন্যে কোথায় মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ?' তিন বছর বাদে মা

চন্দ্রমণিকে জিগগেস করলে গদাধর। বললে, 'আমার বিয়ের পাত্রী জয়রামবাটি রাম মুখুজ্জের বাড়িতে কুটোবাঁধা হয়ে আছে।'

চিহ্নিত হয়ে আছে। খেতে যখন শশা ফলে প্রথম ফলটিতে চাষা কুটো বেঁধে রাখে। যাতে ভুলে সেটি বিক্রি হয়ে না যায়। যাতে সেটি ঠিক দেবতার ভোগে সমর্পিত হয়।

তেমনি রাম মুখুজ্জের মেয়ে আমার জন্যে নির্বাচিত। নির্ধারিত। নিবেদিত।

কিন্তু যাই বলো, সারদাই আগে দেখিয়ে দিয়েছে, বেছে নিয়েছে গদাধরকে। শক্তিই আগে স্থির করেছে তার শিব।

সারদার যখন চৌদ্দ বছর বয়েস, স্বামীর সঙ্গে মিলতে প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসেছে। সমবেত মেয়েদের নানা উপদেশ শোনাচ্ছে গদাধর। নানা নির্মল কথা। শুনতে-শুনতে সারদা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবখানা বোধহয় এই, ওসব আমার জানা। নতুন করে শোনার কোনো দরকার নেই।

অন্য মেয়েরা গা ঠেলছে সারদার। বলছে, 'এমন কথাগুলো শুনলিনি, ঘুমিয়ে পড়লি?'

'না গো, ওকে তুলোনি।' বাধা দিল গদাধর : 'ও কি সাধে ঘুমিয়েছে? ও এসব শুনলে এখানে আর থাকবেনি, চোঁচা দৌড় মারবে।'

ভাবখানা বোধহয় এই, আচ্ছাদন করে এসেছে। লুকিয়ে রেখেছে স্বরূপটিকে। ওকে ঘাঁটিয়ো না। যদি একবার প্রকৃতিটিকে চিনতে পারে চলে যাবে সমাধিভূমিতে, আর তাকে পাব না জীবসীমায়। গুপ্তরূপে আপ্তলীলা করতে এসেছে, তাই ঘুমুতে দে।

'শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।' শ্রীশ্রীমাকে বললেন একদিন ঠাকুর। 'আমি কী করেছি, তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশি করতে হবে। দেখছ না লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল করছে। তুমি ছাড়া কে দেখবে এদের?'

একদিন বকে ফেলেছিলেন ঠাকুর। ফল-মিষ্টি অঢেল হাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন শ্রীমা, ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'অত খরচ করলে কি করে চলবে?' মা'র মুখখানি অভিমানে ভার হয়ে উঠল। ঠিক চোখে পড়ল ঠাকুরের। একটি কালো মেঘের আভাসে যেন প্রলয়ের সূচনা। ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ডাকিয়ে আনলেন রামলালকে। বললেন, 'ওরে তোর খুড়িকে গিয়ে

শান্ত কর। ও যদি একবার রাগে আমার সব নস্যাৎ হয়ে যাবে।'

'আমাকে বেশি জ্বালাবে না।' ঠাকুর অপ্রকট হবার পর সাংসারিক অশান্তিতে একদিন বলে ফেললেন শ্রীমা, 'আমি যদি চটে-মটে কাউকে কিছু বলে ফেলি তো কারু সাধ্যি নেই আর রক্ষে করে।'

'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিয়ে যেতে এসেছ?' পাংশুল কণ্ঠে জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

তুমি যদি টানো, সাধ্য নেই নিজেকে বেঁধে রাখতে পারি। তোমার স্রোতে ভেসে যাবে ঐরাবত। তাই কৃপা চাই তোমার কাছে। তুমি যদি একটু সম্বৃত হও। স্তম্ভিত হও।

রামকৃষ্ণকে নিশ্চিন্ত করল সারদা। বলল, 'না, তোমাকে ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'

আমি বিদ্যুন্মালিনী বহ্নি, কিন্তু তোমার সাধনার মন্দিরে আমি স্নেহ-শান্ত দীপশিখা।

তারপর কালীর কাছে সেই প্রার্থনা রামকৃষ্ণের : 'মা ওকে ভালো রাখো, ঠাণ্ডা রাখো। ও যদি মুহূর্তের জন্যেও আত্মহারা হয় আমি তলিয়ে যাব। রুখতে পারব না নিজেকে।'

ওর সঙ্গে কি আমি পারি? ও জগৎসংসারের কর্ত্রী—কাপড়ে হলুদের দাগ-লাগানো কর্মব্যস্ত গিন্নি, আর আমি আলবোলায় তামাক-খাওয়া হুঁ-হাঁ-বলা কর্তা। ও যেমন বলবে তেমনি চলবে এই পৃথিবী, তেমনি জ্বলবে ওই সূর্য-চন্দ্র।

ও কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্মহেতুস্বরূপা।

সাধকচক্রবর্তী রামকৃষ্ণ ষোড়শী-পূজা করল সারদাকে। পরমতম প্রণিপাতটি রাখল তার পদমূলে। আর, আশ্চর্য, প্রণামটি ফিরিয়ে দেবার কথা মনেও এল না সারদার। পূজা-অন্তে রামকৃষ্ণ যখন বললে, তুমি এবার যেতে পারো, মুক্ত হরিণীর মত পালিয়ে গেল পলকে।

সারদা অজিতা, অমিতা, আরাধিতা।

গোলোকে রাধা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী। ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী ভারতী। কৈলাসে পার্বতী। মিথিলায় সীতা। দ্বারকায় রুক্মিণী। দক্ষিণেশ্বরে সারদা।

এক দিকে সর্বশত্রুবশঙ্করী কালী, অন্য দিকে সর্বাভয়দায়িনী অন্নপূর্ণা।

ঠাকুর বলেন, ছাইচাপা বেড়াল।

বিবেকানন্দ বলে, জ্যান্ত দুর্গা।

চিঠি লিখছে শিবানন্দকে : 'জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময়-সময় বলি, কো রামঃ? রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বলো দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও।'

... দুই ...

রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু—রুপোর মল বাজছে পায়ে-পায়ে।

শিওড়ে এল্লা পুকুরের পাড়ে কুমোরদের পোয়ান। অদূরে বেলগাছ। বেলতলায় ঘাটে গেছেন শ্যামাসুন্দরী, একটি ছোট্ট মেয়ে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। কোত্থেকে এল এই মেয়ে? কুমোরদের পোয়ানের ধার ঘেঁষে, না, বেলগাছ থেকে?

রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু—শ্যামাসুন্দরী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

রাম মুখুজ্জে ঘুমুচ্ছেন দুপুরবেলা, স্বপ্ন দেখলেন কে একটি ছোট্ট মেয়ে তাঁর পিঠের উপর পড়ে গলা জড়িয়ে ধরল। কি তার রূপ, কি বা তার অলঙ্কার! কে গো মা তুমি? কেন এসেছ? এই এমনি এলুম তোমার কাছে। মিলিয়ে গেল স্বপ্ন।

বারোশো ষাট সালের আটুই পৌষ জন্ম নিল সারদা।

যিনি সার দেন তিনিই সারদা। কী সার এই সংসারে? সংসারে সার যদি কিছু থাকে, সারাৎসার যদি কিছু থাকে, তবে তা মা। জ্ঞানস্তন্য-দায়িনী স্নেহময়ী মা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মাতৃ-অঙ্ক। মা'র কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। নির্ভয়, নিষ্কলঙ্ক।

আমি যে ঘুমিয়ে আছি এ নিদ্রাটুকুও মা। তিনি শুধু প্রত্যয়রূপিণী নন তিনি আমার সুষুপ্তিরূপিণী। নিদ্রা হয়ে ভ্রান্তি হয়ে বিস্মৃতি হয়ে আমার সমস্ত বিক্ষেপ সমস্ত চাঞ্চল্য জুড়িয়ে দিচ্ছেন। ভুলিয়ে দিচ্ছেন সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা। রোজ যে ঘুমুই রোজই তো মাকে পাই, ডুবে যাই মাতৃস্পর্শে। রোজ যে জাগি রোজই তো মাকে দেখি, ভেসে যাই তাঁর লীলানন্দে।

'কেমন ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলুম গা,' শ্যামাসুন্দরী দুঃখ করছেন : 'সংসার করতে পেল না। ছেলেপুলে হল না একটিও—'

ভাগ্যিস হয়নি। হলে কি আর আমাদের মা হতেন? বিমাতা হয়ে যেতেন। হতেন বা পাতানো মা। কেঁদে উঠলে তক্ষুনি-তক্ষুনি শুনতেন না, দেরি করে ফেলতেন। পক্ষপাতী হতেন। নিজের পেটের ছেলেকে শাঁস দিয়ে আমাদের দিতেন খোসাভূষি। টাটকা দুধটুকু তাকে দিয়ে আমাদের দিতেন জল-মেশানো দুধ।

'ঈশ্বর কি তোর পাতানো মা যে চাইতে কুণ্ঠিত হবি?' বললেন ঠাকুর, 'আঁচল টেনে গায়ের জোরে আদায় করে নিবি তোর হকের পয়সা, তোর সম্পত্তির অংশ।'

পেটে যদি একটা ছেলে ধরত, ষোলো আনা হিস্‌সা তাকেই দিয়ে দিত। মুখ ম্লান করে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতুম। আজ স্বভাব-সাহসে একেবারে কোলে চেপে বসেছি। বলছি তুই যখন আমারও মা, আমার ক্ষুধার অন্ন জুগিয়ে দে।

'একটি-দুটি ছেলে নিয়ে কী করবে আপনার মেয়ে?' শাশুড়িকে বলেছিল রামকৃষ্ণ : 'তার এত সন্তান হবে যে মা-ডাকের জ্বালায় তিষ্ঠোতে পারবে না।'

সারদা জীবজগতের মা। দীর্ঘ ঘোররাত্রির শিয়রে বিতন্দ্রা জননী। চিরপ্রহরের প্রহরিণী। অভয়দাত্রী অন্নপূর্ণা। যাকে পেলে সন্তানের আর কিছু পাবার ইচ্ছে থাকে না, একমাত্র যাকে পেলেই তার সকল ভোগের অবসান, সেই মা। নিত্যানন্দময়ী কল্যাণবৃষ্টি।

যদি একবার ঈশ্বরকে মা বলে ভাবা যায় তা হলে আর ভাবনা থাকে না। যেহেতু কিছুই আর চাইতে হয় না তাঁর কাছে। কৃপা? মা'র কৃপা তো স্বাভাবিকী। অগ্নির কাছে কেউ কি আর দীপ্তি কামনা করে? জলের কাছে শীতলতা?

'আমি কি শুধু সতের মা?' বললেন শ্রীমা। আমি সত্যের মা। তাই, 'আমি শুধু সতের মা নই, আমি অসতেরও মা।'

যে ছেলে ধুলো-বালি মেখে আসে তাকে কি মা ধরেন না? তাকে আরো বেশি করে ধরেন।

গুণরহিত পুত্রে অধিকদয়া।

শিরোমণিপুরের আমজাদ। ডাকাতি করে জেলে গিয়েছিল। জেল

থেকে ফিরে এসে বড় কষ্টে পড়েছে। একে মুসলমান তায় ডাকাত, কেউ মজুরি খাটাতেও চায় না। মা-ই প্রথম কাজ দিলেন তাকে। শুধু কাজ নয় খেতে দিলেন।

বারান্দায় বসেছে আমজাদ, মা'র ভাইঝি নলিনী পরিবেশন করছে। দেবার কি ছিরি, দূর থেকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারছে। পাছে ছোঁয়া লেগে জাত যায়। গায়ের হাওয়া লেগে অশুচি হয়।

মা রেগে উঠলেন। 'এ কি দেবার ছিরি! এমনি করে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিলে কেউ তৃপ্তি করে খেতে পারে? দে আমাকে দে।'

থালা কেড়ে নিয়ে মা নিজে পরিবেশন করতে লাগলেন ঝুঁকে পড়ে। বললেন, 'পেট ভরে খেয়ো আমজাদ। লজ্জা কোরো না।'

পেট কি শুধু ব্যঞ্জনে ভরে? পেট ভরে আতিথেয়তার ব্যঞ্জনায়।

খাওয়ার পর আমজাদের এঁটো ধুলেন মা। নলিনী চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কি, পিসি, তোমার জাত যাবে যে।'

'চুপ কর। সন্তানের এঁটো নিলে মা'র জাত যায়! খুব বুঝেছিস তুই। যেমন শরৎ আমার ছেলে তেমনি আমজাদও আমার ছেলে।'

এই মা সারদা। সর্ববান্ধবরূপিণী জগন্মাতা। শশিরুচিকোমলা, কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা।

তুলোর চাষ করে রাম মুখুজ্জে। খেতে গিয়ে তুলো তোলে শ্যামাসুন্দরী। তুলোর খেতের মধ্যে শুইয়ে রাখে সারদাকে।

ছোট্টটি থেকেই কাজ করে সারদা। পুকুরে নেমে গলা-জলে দাঁড়িয়ে গরুর জন্যে ঘাস কাটে। চেয়ে দেখে তারই মত আরেকটি মেয়ে গলা ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছে জলের মধ্যে। সমবয়সী, কৃষ্ণাঙ্গী। তাকে দল টেনে-টেনে দিচ্ছে। এগিয়ে দিচ্ছে হাতের কাছে। তাকে কি চেনে সারদা? কে জানে। কোনো কথা কইছে না পরস্পরে। শুধু এ-ওর দিকে তাকিয়ে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই কালো মেয়েটির সঙ্গে, আরো পরে, আরেকবার দেখা হয়েছিল সারদার। যেবার সে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে, তপ্ত রোদে মাঠ ভেঙে-ভেঙে।

এমন অদৃষ্ট, হু-হু করে জ্বর এসে গেল। সঙ্গে বাবা ছিলেন, মেয়ে নিয়ে উঠলেন পাশের চটিতে। এত দিনের এত আশা, সব ভেস্তে গেল বোধহয়।

শুধু গা পুড়ছে না মনও পুড়ছে। কে জানে এত পথ হেঁটে এসে ফিরে যেতে না হয়! মিলনের পাত্রটি না বিচ্ছেদে ভরে ওঠে!

এমন সময়, চেয়ে দেখল, কে একটি মেয়ে তার পাশে এসে বসেছে। কি আশ্চর্য, সেই কালো মেয়েটি। সারদা যেমন বড় হয়েছে সেও বড় হয়েছে। তেমনি টানা-টানা ভাসা-ভাসা চোখ। দেখেই কেমন আপন বলে মনে হয়, চোখের দৃষ্টিটি এত সকরুণ। জ্বরো গায়ে হাত রেখেছে যেন মর্মমূল পর্যন্ত জুড়িয়ে যাচ্ছে।

'কে তুমি গা?' জিগগেস করল সারদা।

'তোমার বোন।' বলল সেই কালো মেয়ে।

'বোন!' তৃপ্তিতে যেন শীতল হল সারদা। বললে, 'কোত্থেকে আসছ বলো তো?'

'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।'

'বলো কি! আমি তো দক্ষিণেশ্বরেই যাচ্ছিলুম। কিন্তু আমার মনোবাঞ্ছা আর পূর্ণ হল না।'

'না, না, হবে বৈ কি।' কালো মেয়ে মমতায় আরো ঘন হয়ে এল। 'তারই জন্যে তো এসেছি আগ বাড়িয়ে। তোমাকে নিয়ে যেতে। তোমার জন্যে ঠাকুর পথ চেয়ে বসে আছেন।'

'আমার জন্যে?'

'তুমি ছাড়া তাঁর সাধনা যে পূর্ণ হবার নয়। তিনি অগ্নি তুমি তার দাহিকা। তিনি জল তুমি তার শীতশক্তি। তোমাকে ছাড়া তিনি অঙ্গহীন। তুমিই তাঁর পরিপূরক। তুমি ঘুমোও চুপটি করে, কাল তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে। তোমার জন্যে পাঠিয়ে দেব পালকি।'

শুধু পুকুরের দল-ঘাস কাটা নয়, খেতে মজুরদের জন্যে খাবার নিয়ে যায় সারদা। সেবার পোকায় ধান নষ্ট করেছে, বহু ধান শিষ থেকে ঝরে পড়ে রয়েছে মাটিতে। আঙুলে করে খুঁটে-খুঁটে কুড়োচ্ছে তাই সারদা। খেলাধুলোয় মন নেই মন শুধু গেরস্তালিতে। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে যদি কখনো খেলেও, গিন্নিবান্নির পাট নেয়। পুতুলও ঢের আছে এদিক-ওদিক, কিন্তু লক্ষ্মী আর কালীর পুতুলই তার বেশি পছন্দ। একদিন তো ফুল আর বেলপাতা নিয়ে সেই পুতুলই সে পুজো করলে।

কে একজন বললে এ পুতুলের নাম জগদ্ধাত্রী। বা, বেশ নামটি তো! কি হল সারদার, সেই দেবীর কথা ভাবতে বসল। মনে হল ভাবতে-ভাবতে

সেই যেন সে দেবী হয়ে গিয়েছে। কাছ দিয়ে যাচ্ছিল হলদিপুকুরের রাম-হৃদয় ঘোষাল। সারদাকে দেখে ভয়ে সে শিউরে উঠল। আনন্দলতিকা বালিকার মাঝে এ কী ভয়ঙ্করের আবেশ!

একবার কি দুর্ভিক্ষই লাগল দেশ জুড়ে। সারদাদের আগের বছরের ধান মরাই-বাঁধা ছিল, তাই লোক আসতে লাগল দলে-দলে। ভাতের ঘ্রাণে। চালে-ডালে খিচুড়ি রান্না হতে লাগল—খিচুড়ির ঘ্রাণে। হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ি। যে আসবে সে খাবে। বাড়ির লোকেরও এই ব্যবস্থা। 'শুধু আমার সারদার জন্যে দুটি ভালো চালের ভাত করবে।' বললেন রাম মুখুজ্জে। 'সে এসব খেতে পারবেনি।'

কন্যার জন্যে অবার্য মমতা।

তৈরি খিচুড়িতে কুলোয় না এককে দিন। এত লোক চলে আসে। তখন আবার নতুন করে হাঁড়ি চাপাও। হাঁড়ি যদি নামে, গরম খিচুড়ি জুড়োতে দেয় না। সবাই একেবারে পড়ে হুমড়ি খেয়ে। গরম গরমই সই, মুখ পোড়ে তো পুড়ুক, পোড়া পেটের মত পোড়ামুখ আর কী আছে।

কোত্থেকে একটি পাখা নিয়ে এসেছে সারদা। তাল-পাতার হাত-পাখা। তার ডাঁটটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে সারদা হাওয়া করতে লাগল। হাওয়া করতে লাগল ঢালা খিচুড়ির উপর। যাতে শিগগির করে জুড়োয়, ক্ষুধা-র্তেরা বড়-বড় থাবা দিয়ে গিলতে পারে গোগ্রাসে।

সেবারূপিণী লক্ষ্মী। ধান্যদা ধনদায়িনী।

সেদিন একটি মেয়েলোক এসেছে, রুক্ষ চুল, পাগলের মত চেহারা। গরুর ডাবায় কুঁড়ো ভেজানো ছিল, দিশেহারার মত তাই খেতে শুরু করলে।

'আহা, একটু রোসো গো রোসো।' সারদা ব্যস্ত হয়ে উঠল : 'বাড়ির ভেতর খিচুড়ি আছে এনে দিচ্ছি—'

কে শোনে কার কথা। সব কিছু ধৈর্য মানে, ক্ষুধার ধৈর্য নেই।

খিদের জ্বালা কি কম! দেহ ধরলেই খিদে-তেষ্টা। ক্ষুধা বিশ্বগ্রাসিনী বহ্নিবন্যা।

'অসুখের সময় মাঝরাতে এমনি একদিন আমার খিদে পেল।' বলছেন শ্রীমা : 'সরলা-টরলা সব ঘুমিয়েছে। আহা, ওরা এই খেটে-খুটে শুয়েছে, ওদের আবার ডাকব! নিজেই শুয়ে-শুয়ে চার দিকে হাতড়াতে লাগলুম। দেখি একটা বাটিতে চারটি খুদ-ভাজা রয়েছে। বালিশের পাশে দুখানা

বিস্কুট। তখন ভারি খুশি। খিদের জ্বালায় যে খুদ-ভাজা খাচ্ছি তার খেয়াল নেই—'

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা—

আমার তো শুধু অন্নের ক্ষুধা নয়, আমার জ্ঞানের ক্ষুধা প্রেমের ক্ষুধা আনন্দের ক্ষুধা। আমার পেট ভরলেই তো বুক ভরে না। ঘর ভরলেই তো ভরে না আমার অন্তর। মা তুমি আমার সেই চিরন্তনী ক্ষুধামূর্তি। আমার পঞ্চকোষের পঞ্চক্ষুধার সংহতি-মূর্তি। কিন্তু তুমি যেমন ক্ষুধা তেমনি আবার তুষ্টি। তুমি যেমন ক্ষুধার প্রকাশিকা তেমনি আবার ভব-ক্ষুধানিবারিণী। আমি ক্ষুধিত পুত্র আর তুমি অন্নদায়িনী বসুন্ধরা।

... তিন ...

সারদার পাঁচ বছর বয়েস আর গদাধরের তেইশ—দুজনের বিয়ে হল। শক্তি মিলল শিবের সঙ্গে।

তিনশো টাকা পণ পেল রাম মুখুজ্জে। কন্যা-পণ। কিন্তু বউকে গয়না দিচ্ছ কী?

চন্দ্রমণি গয়না পাবে কোথায়? তাদের বড় দৈন্য। নগদ টাকা দিতেই প্রাণান্ত। গদাধরের পাগলামি সারুক, সংসারে মন পড়ুক তারি জন্যে তার বিয়ে দেওয়া!

কিন্তু গয়না কিছু না দিলে তো নয়! লোকে বলবে কি! লাহাদের বাড়ি থেকে ধার করল গয়না। বউকে সাজাবার জন্যে পাঠিয়ে দিল চন্দ্রমণি।

সুরজুর বাপের কোলে চড়ে বউ এসেছে কামারপুকুর। বৈশাখের শেষাশেষি। খেজুর পাকবার সময়। পাকা খেজুর কুড়োবার জন্যে কোল থেকে নেমে পড়ল সারদা।

ধর্মদাস লাহা জিগগেস করলে, 'এই বুঝি নতুন বউ?'

সুরজুর বাপ আবার কোলে তুলে নিল।

বউ পেয়ে চন্দ্রমণির খুশি আর ধরে না। কিন্তু যতই আনন্দ করো, গায়ের গয়না ফিরিয়ে দিতে হবে এবার। যতই সে কথা ভাবেন চোখ ছাপিয়ে জল আসে। এমন সোনার প্রতিমাকে কি করে নিরাভরণ করবে!

গদাধর বললে, ভয় নেই, আমি খুলে নেব।

সরল শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে সারদা। একটি-একটি করে গদাধর সব গয়না খুলে নিল গা থেকে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই টের পেল সারদা। জিগগেস করতে লাগল জনে-জনে, কে আমার গয়না নিলে? কোথায় গেল? বা, এই যে পরে শুলুম রাত্তির বেলা—

সহ্য হল না চন্দ্রমণির। দু হাতে সারদাকে কোলের উপর চেপে ধরলেন। বললেন, 'ও গেছে গেছে। গদাই তোমাকে আরো ভালো-ভালো গয়না দেবে।'

সে সবই তো আসল অলঙ্কার। সেবা আর ব্রত, নিষ্ঠা আর সংযম, করুণা আর ভালোবাসা, নিরভিমানিতা আর সারল্য। ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা, ত্যাগ আর তিতিক্ষা, সুখে-দুঃখে ঔদাসীন্য আর কর্মোদ্‌যাপনে অক্লান্তি।

'ওরে হৃদে, দ্যাখ তো তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে।' হেঁকে বললেন একদিন ঠাকুর।

সাত টাকা করে পান মন্দির থেকে। যদিও নিজে ছোঁন না, ছুঁতে পারেন না, জমে গিয়ে সিন্দুকে।

হৃদয় গুনে বললে, 'তিনশো।'

'ওকে ভালো করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে। আর ডায়মন-কাটা বালা দে একজোড়া। ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই সাজতে ভালোবাসে।'

তারই জন্যে তো কান্না সারদার, পাঁচ বছরের সারদার—আমার গায়ের গয়না কে খুলে নিলে।

সঙ্গে, সে বাড়িতে, ছিল তার এক খুড়ো, ব্যাপার দেখে ভীষণ চটে উঠল। এ কি ছলনা! এ কি কারচুপি! সারদাকে কোলে তুলে নিয়ে ফিরে চলল। সোজা জয়রামবাটি।

চন্দ্রমণি চিন্তিত হলেন। গদাধরের চিন্তা নেই। উদাসীনের মত বললে, যাবে কোথায়? বিয়ে হয়ে গিয়েছে না? বাঁধন কি আর আলগা হয়?

গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছে, তবু গদাধরের উপর রাগ নেই সারদার। সারদা তখন সাতে পড়েছে, শ্বশুরবাড়ি এসেছে গদাধর। কেউ বলে দেয়নি, নিজের থেকে সারদা জল নিয়ে এল ঘটি করে। গদাধরের পা ধুয়ে দিলে। নুয়ে পড়ে চুল বুলিয়ে দিলে পায়ে। উঠে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া করতে লাগল।

সবাই বলছে, পাগলা জামাই!

বলবেই বা না কেন শুনি? বেশ আছে, হঠাৎ একসময় লাফ মেরে চেঁচিয়ে উঠল গদাধর : 'এবার আমি কাউকে ছাড়ছি না, যবন হোক, চণ্ডাল হোক, যেই হোক না কেন—'

সবাই বলে উঠল : 'এই দেখ! দেখেছ? পাগল আর কাকে বলে!'

যে যাই বলুক, সারদার বেশ ভালো লাগে লোকটিকে। তাকিয়ে থাকতে চোখে তৃপ্তি লাগে। মনে হয় আনন্দের একটি পূর্ণঘট যেন বুকের মধ্যে বসানো!

জোড়ে ফিরল দুজনে। গদাধর বললে, 'যদি কেউ জিগগেস করে, কবে তোমার বিয়ে হয়েছিল, সাত বছর বয়সে বোলো না যেন, বোলো পাঁচ বছর বয়সে। ছেলেমানুষ, বছর গুলিয়ে ফেলো না যেন—'

ভাগ্নে হৃদয় কোত্থেকে কতগুলো পদ্মফুল নিয়ে এসেছে। সারদাকে পুজো করবে। সারদা তো পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে পেরে ওঠা অসাধ্য।

এক ভক্ত এসে শ্রীমাকে বললে, 'মা, তোমার পুজো করব। তোমার কোন ফুল পছন্দ?'

'না, না, আমাকে পুজো কেন? ঠাকুরের পুজো করো। ঠাকুর শাদা ফুল ভালোবাসতেন।'

ভক্তের মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। মমতাময়ীর চোখ এড়াল না। বললেন, 'আচ্ছা কিছু হলদে ফুলও এনো।'

ভক্ত ফুল নিয়ে এল। মা বললেন, শাদা ফুল ঠাকুরকে দাও। আর হলদে ফুল আমাকে।

বগলাপূজায় পীতপুষ্প বিহিত। কে একজন জিগগেস করলে মাকে, মা আপনি কি বগলা?

'কি যে বলো তার ঠিক নেই।' কথাটা চাপা দিলেন।

অবগুণ্ঠিতা হয়ে রইলেন। রইলেন আত্মবিলুপ্তিতে।

আমি কে তা জেনে তোমার লাভ কি। দেখ তোমার অন্তরে একটি বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল কিনা। তাতে ধরল কিনা অনুরাগের রঙ! লাগল কিনা শরণাগতির সৌরভ। তা যদি হয়ে থাকে তবে তোমার সেই চিত্তকমলটিই পূজার পুষ্প। বীণাবাদিনীর পা রাখবার জায়গা।

বড়টি হয়ে প্রথম যখন কামারপুকুরে এল সারদা, তার বয়স তখন

তেরো কি চৌদ্দ। গদাধর দক্ষিণেশ্বরে। কালীর জন্যে আকুল। সেই আকুলতাটি যেন ছুঁয়ে আছে সারদাকে। তাই দূরে থেকেও দূর মনে হয় না। অদর্শনই সুদর্শন।

হালদারপুকুরে নাইতে যাবে সারদা। একে নতুন বউ তায় ছেলেমানুষ। লজ্জায় জড়সড়, কি করে পাঁচজনের সমুখ দিয়ে যাবে-আসবে! খিড়কির ছোট দরজাটির পাশে দাঁড়িয়ে গড়িমসি করছে। অমনি, কোথা থেকে কে জানে, আট-আটটি সমবয়সী মেয়ে এসে হাজির। কিগো, নাইতে যাবে? বেশ তো, চলো আমাদের সঙ্গে। আমরা তোমায় ঘিরে নিয়ে যাব, কেউ দেখতে পাবে না। তোমরা কে গা? জিগগেস করল সারদা। আমরা? আমরা এই পাড়ারই মেয়ে, তোমার বন্ধু। চারজন আগে চারজন পিছনে, এমনি করে নিয়ে চলল সারদাকে। নাওয়া হয়ে গেলে আবার ফের পোঁছে দিয়ে গেল। এমনি রোজ। যতদিন ছিল সে কামারপুকুর।

'মাগো, ওরা কি তোমার অষ্ট সখী?' একদিন জিগগেস করল এক ভক্ত।

'কে জানে বাপু! তোমার খালি ঐ সব কথা।'

পঞ্চবটীতে বসে লাটু-মহারাজ ধ্যান করছে। ওদিকে যেতে-যেতে ঠাকুর দেখতে পেলেন। বললেন, 'কার ধ্যান করছিস রে লেটো?'

লাটু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

'ওই নবত ঘরে যা। সেখানে সাক্ষাৎ ভগবতী আছেন। রুটি বেলছেন বসে-বসে। যা তাঁর রুটি বেলে দে গে যা।'

দৃকপাত না করে লাটু ছুটল নবতে। সেবার চেয়ে আর বড় পুজা কি আছে!

'মাকে মানা কি সহজ কথা রে?' বলছেন লাটু-মহারাজ। 'ঠাকুরের পুজো গ্রহণ করেছেন—বুঝো ব্যেপার। মা-ঠাউন যে কি তা শুধু তিনি বুঝেছিলেন, আর কিঞ্চিৎ স্বামীজী বুঝেছিল। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। তাঁর দয়া বুঝতে গেলে বহুৎ তপস্যা দরকার।'

বলরাম বোসের বাড়ি থেকে মা জয়রামবাটি ফিরে যাচ্ছেন। একে-একে সবাই মাকে প্রণাম করল, কিন্তু লাটুর দেখা নেই। ঘরে পাইচারি করছে আর বলছে, 'সন্ন্যাসীকো কো পিতা, কো মাতা, সন্ন্যাসী নির্মায়া।'

মা শুনতে পেলেন সেই কথা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাবা নাটু, তোমার আমাকে মেনে কাজ নেই।'

তড়াক করে লাফ মেরে মা'র পায়ে পড়ল লাটু। প্রণাম করবে না কাঁদবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঠিক করতে পেল না।

মা'র চোখ দুটিও ভিজে উঠল। গায়ের চাদর দিয়ে মা'র চোখ মুছিয়ে দিল লাটু। বললে, 'বাপ-ঘরে যাচ্ছ মা? কাঁদতে নেই। শরোট আবার শিগগির তোমাকে নিয়ে আসবে। কেঁদো না মা, যাবার সময় ফেলতে নেই চোখের জল।'

ঠাকুরের ভাই-ঝি লক্ষ্মী। বছর সাতেকের ছোট সারদার চেয়ে। কোত্থেকে একখানা বর্ণ-পরিচয় যোগাড় করে এনেছে। দুজনে মিলে তাই পড়ছে লুকিয়ে-লুকিয়ে।

হৃদয়ের চোখ এড়ানো গেল না। হাতের থেকে বই কেড়ে নিলে জোর করে। বললে, 'মেয়েছেলের লেখাপড়া শিখতে নেই। শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?'

সরাদা ছেড়ে দিল। কিন্তু লক্ষ্মী ঝিয়ারী-মানুষ, সে হারল না। নিজে গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসতে লাগল। পড়ে এসে লুকিয়ে-লুকিয়ে শেখাতে লাগল সারদাকে।

সারদা তখন দক্ষিণেশ্বরে, বাগানের পীতাম্বর ভাণ্ডারীর এগারো বছরের ছেলেকে ঠাকুর বললেন লক্ষ্মী আর তার খুড়িকে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়ে দিতে।

ভালো করে শেখা হয় আরো পরে, ঠাকুর যখন অসুখ হয়ে শ্যামপুকুরে আছেন একা-একা। ভব মুখুজ্জেদের একটি মেয়ে নাইতে আসে গঙ্গায়। অনেকক্ষণ ধরে থাকে মা'র সঙ্গে-সঙ্গে। পড়িয়ে যায়, পড়া নেয় রোজ-রোজ। শাক-পাতা যা জোটে মা'র, তাই দেন তাকে গুরুদক্ষিণা।

দিব্যি রপ্ত হয়ে উঠলেন কদিনে। একটানা পড়তে পারেন রামায়ণ-মহাভারত। কঠিন-কঠিন শব্দেরও মানে শিখে নিলেন আস্তে-আস্তে।

'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং। মার্গশীর্ষ মানে কি?'

'মার্গশীর্ষ মানে অগ্রহায়ণ মাস।' দিব্যি বলে ফেললেন।

লেখাপড়া দিয়ে কী হবে? ভগবানে মতি হওয়াই আসল। সরল না হলে মতি আসবে কি করে? আর, পদবী থেকে মুক্ত হতে না পারলে আসবে কি করে সারল্য?

'ঠাকুর তো লেখাপড়া কিছুই জানতেন না।' বলছেন শ্রীমা, 'নাই জানুন, তবু এবার তিনি এসেছেন ধনী-নির্ধন পণ্ডিত-মূর্খ সবাইকে

উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে চারদিকে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। যার মধ্যে এতটুকু সার আছে, বাঁশ আর ঘাস ছাড়া সব চন্দন হয়ে যাবে। তোমাদের ভাবনা কি, তোমরা তো আমার আপন লোক—তবে কি জানো?' থামলেন একটু শ্রীমা : 'বিদ্বান সাধু যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।'

ভক্তি হাতির দাঁত, জ্ঞান হচ্ছে সোনার বন্ধনী।

এদিকে ঠাকুর বলছেন, 'নরেন আমাকে যত মুখখু বলে আমি তত মুখখু নই। আমি অক্ষর জানি।'

বর্ণলিপি জানি আর সমস্ত বর্ণে ও লিপিতে যিনি অবর্ণনীয় জানি সেই ব্রহ্মকে।

... চার ...

কিন্তু পাড়া-পড়শীদের অনুকম্পা সইতে পারে না সারদা। সইতে পারে না পতিনিন্দা। 'আহা, শ্যামার মেয়ের কি-একটা পাগলের সাথে বিয়ে হল।' সইতে পারে না এ লোকগঞ্জনা।

হয়েছে তো হয়েছে! তোমরা কী বুঝবে সেই পাগলের মহিমা! আমিই তো নিজের থেকে সেই পাগলকে নির্বাচন করেছি। আমিও তো উন্মাদিনী।

পার্বতীর বিয়ের দিনটি মনে করো। বাপ হিমালয় কত বড় সভা সাজিয়েছেন। হাঁসের পিঠে চড়ে প্রথমে এলেন ব্রহ্মা, কত শোভা-সম্পদের ছড়াছড়ি। গরুড়ের পিঠে চড়ে এলেন তারপর বিষ্ণু, তারই বা কত আড়ম্বর। তারপর এল প্রজাপতিরা, দিকপালেরা—হৈ-হৈ পড়ে গেল। ঐশ্বর্যে বিলাসে ঝলসে গেল দশদিক। শেষকালে বর এল—ওমা, এই বর, এই তার চেহারা! বাঘের ছাল পরে ষাঁড়ে চড়ে এসেছে। সাপ ঝুলছে ঘাড়ে-বুকে। নেশার ঝোঁকে চোখ ঢুলু-ঢুলু করছে। তাও দুচোখ নয়, তিন চোখ! সঙ্গে আবার দুটো ভূত-প্রেত, নন্দী-ভৃঙ্গী।

বৎসে, বণ্ডিতাসি—আত্মীয়েরা আক্ষেপ করে উঠল। রাজার মেয়ে তুমি, তোমার এ কী মন্দ ভাগ্য। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ছেড়ে দিই, আর যে-কোনো বরযাত্রী এ বরের চেয়ে বরণীয়। এ কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠে ভরা বিষ!

কিন্তু গৌরী নির্বিচল। যাতে মন একবার স্থির করেছি তার থেকে ভ্রষ্ট হব না। নিম্নমুখী জলকে কে প্রতিরোধ করবে? যতই নিন্দা করো, ওই আমার সাধনার ধন, আমার তপস্যার নিধি।

সারদারও সেই অবস্থা। যতই নিন্দা করো আমার আনন্দের ঘটটি কানায়-কানায় পরিপূর্ণ।

পাড়ায় কারু বাড়িতে যায় না বেড়াতে। মাঝে-মাঝে ভক্তিমতী ভানু-পিসির কাছে আসে। তার দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে।

নিষ্কম্পশিখা সহিষ্ণুতা।

'সহ্যগুণ বড় গুণ।' বলছেন শ্রীমা, 'এর চেয়ে আর গুণ নেই।'

তপস্যার আর কোনো আমার অস্ত্র নেই এই ধৈর্যই আমার আয়স-কঙ্কট।

'তাঁর অনন্ত ধৈর্য।' বললেন আবার শ্রীমা : 'এই যে তাঁর মাথায় ঘটি-ঘটি জল ঢালছ দিন-রাত, তাতেই বা তাঁর কি! আর শুকনো কাপড় দিয়ে ঢেকে পুজো কর তাতেই বা তাঁর কি! তাঁর অসীম ধৈর্য।'

পেটের অসুখ করে কামারপুকুরে এসেছে গদাধর। সঙ্গে হৃদয় আর বামুন-ঠাকরুন। ভৈরবী যোগেশ্বরী। সারদা তখন বাপের বাড়ি। খবর গেল, দেখবে এস আমাদের। পাখির মত উড়ে এল সারদা।

কোথায় পাগল! এ যে রূপের ধবলগিরি! সব-ভোলানো ভোলানাথ!

রাত থাকতে উঠে সারদাকে উদ্দেশ করে হাঁক দেয় : 'ওগো এই-এই সব রান্না কোরো গো—' বলে ফিরিস্তি ঝাড়ে।

কোথাও কিছু ত্রুটি হলে চলবে না। ছেলেমানুষ বউ, সব নিখুঁত করে রাখে।

একদিন হয়েছে কি, পাঁচফোড়ন নেই। বড় জা, লক্ষ্মীর মা বললে, 'তা অমনিই হোক। না থাকলে আর কি হবে!'

ঠিক কানে গিয়েছে গদাধরের। ফোড়ন দিয়ে বলছে, 'এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তাতে তা বাদ দিলে চলবে কেন?'

শ্রীশ্রীমা'রও সেই কথা : 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন।'

এক মেমসাহেব এসেছে মা'র সঙ্গে দেখা করতে। মাকে প্রণাম করতেই মা তার হাত ধরল। অনেকটা হ্যাণ্ড-সেক করার মত। যেখানে যেমন সেখানে তেমন।

বামুন ঠাকরুন আবার ঝাল বেশি খান। মেজাজটিও ঝুনো সরষে। গদাধর মা বলে, তাই সারদাও তাকে শাশুড়ির মত ভয় করে।

নিজে রান্না করেন। ঝালে-পোড়া। সারদা চোখ মোছে আর খায়।

'কেমন হয়েছে?' জিগগেস করে যোগেশ্বরী।

সারদা ভয়ে-ভয়ে বলে, 'বেশ হয়েছে।'

লক্ষ্মীর মা না বলে পারে না, 'ঝাল হয়েছে।'

তাই শুনে চটে যায় যোগেশ্বরী। বলে, 'তোমার বাপু কিছুতে ভালো হয় না। ছোট বৌমা তো বললে ভালো হয়েছে। যাও, তোমাকে আর দেব না বেন্নুন।'

নম্রতায় নতশাখা সারদা। লজ্জার নবমঞ্জরী।

ফুল-মালা দিয়ে ঠাকুরকে একদিন সাজালো যোগেশ্বরী। ভাবারূঢ় হলেন ঠাকুর। ঠিক যেন গৌরাঙ্গের মত। ব্রাহ্মণী সারদাকে ডেকে নিয়ে এল সামনে। জিগগেস করলে, কেমন হয়েছে?

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখল একটু সারদা। ভাবাবেশে রয়েছেন ঠাকুর, দেখে কেমন ভয় করতে লাগল। অস্ফুটস্বরে বললে, 'বেশ হয়েছে।' বলে কোনো রকমে একটা প্রণাম সেরে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল সারদা।

দেখল আনন্দের পূর্ণঘটটি টইটুম্বুর হয়ে আছে। এক কণা জলও চলকে পড়েনি।

কিন্তু ঠাকুর যখন মাকে ষোড়শী-পূজা করলেন, সমস্ত সাধনাকে একটি প্রগাঢ় প্রণামে পর্যবসিত করে নিবেদন করে দিলেন মা'র পায়ে, মা ফিরিয়ে দিলেন না সেই প্রণাম। ভুলে গেলেন, না, আর-কিছু? শ্রীরাম-কৃষ্ণ কি তখন স্বামী, না সাধকচক্রবর্তী? সারদা কি তখন স্ত্রী, না, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী কালিকা?

রাত তিন প্রহর, পূজা-অন্তে ঠাকুর বললেন, এবার তুমি যেতে পারো।

খাঁচা খুলে দিলে পাখি যেমন উড়ে পালায় তেমনি বেরিয়ে গেল সারদা। বাইরে এসে মনে হল, এ কি করলাম! ঠাকুরের প্রণামটি ফিরিয়ে দিলাম না?

মনে-মনে প্রণাম করল সারদা। হে মনোবাসী, হে মনোনীত, আমার প্রণামটি গ্রহণ করো।

'মনই প্রথম গুরু।' বললেন শ্রীমা, 'শেষ গুরুও ওই মন।'

বৈশাখ ১৩১২ সাল — পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

বারুইদের মেয়ে সুশীলা। সে-রাত্রে রাঁধুনি আসেনি। রুটি যা হোক করা গেল, এখন তরকারি কে রান্না করে? সুশীলা মাকে গিয়ে বললে, 'মা, আমি যদি রান্না করি, খাবে?'

'তোমরা আমার মেয়ে, তোমাদের রান্না খাব না তো কার রান্না খাব?' সুশীলার আনন্দ আর ধরে না।

চলে যাচ্ছে, কেদারের মা মুখিয়ে এল। ঝাঁজিয়ে উঠল মা'র উপর: 'তুমি বামুনের মেয়ে হয়ে এদের হাতের রান্না কেন খাবে? ঠাকুর না হয় সন্নেসী ছিলেন তুমি তো আর সন্নেসী হওনি।'

সুশীলাকে ফেরালেন মা। মুখখানিতে মলিন একটি ছায়া পড়েছে, হয়তো বা মমতার ছায়া। বললেন অনুতপ্ত গলায়, 'এদের জ্বালায় কিছু হবে না। শুনলে তো, এইরকম সব বলে। তা তুমি মনে কিছু কষ্ট কোরোনি। ঠাকুর যদি সুযোগ দেন তো হবে।'

মনে কিছুই করেনি সুশীলা। মা যে খেতে চেয়েছেন তার হাতে, এই তার অনন্ত তৃপ্তি।

মনই মধু। মনই সুধা।

লোকাচার মানতে হয়, কিন্তু মনের টানে ছিঁড়ে যায় বিধি-নিষেধের জঞ্জাল।

খাওয়া হয়ে গিয়েছে, শালপাতা কুড়িয়ে জায়গা নিকোবে ভক্তের দল, মা বলে উঠলেন, 'থাক, লোক আছে।'

লোক আর কে! লোক স্বয়ং মা। কত জাতের ভক্ত, কিন্তু মা'র এক ধর্ম এক জাত। নিজের হাতে সবাইর এঁটো সাফ করতে লাগলেন।

'তুমি বামুনের মেয়ে, এদের গুরু, এরা তোমার শিষ্য, তুমি এদের এঁটো নাও কেন?' নালিশ করে সহবাসিনীরা : 'এতে যে ওদের অমঙ্গল হবে।'

বলে কী অলক্ষুনে কথা! আমি যে এদের মা গো! ছেলেরটা মা করবে না তো আর কে করবে!

ঈশ্বর দয়াময়—এ আবার কেমন বুলি! বললেন ঠাকুর। ঈশ্বর বাপ-মা। ছেলেকে বাপ-মা দেখবে না তো দেখবে কি ভিন-পাড়ার লোক? দয়া আবার কি! যোগের টান, নাড়ীর টান। না দেখে যাবে কোথায়! একশো বার দেখবে।

সেই যে কামারপুকুর থেকে চলে গেল গদাধর আর তার দেখা নেই।

খবর যা আসে তা শুনতে মোটেই ভালো নয়। সত্যি-সত্যি নাকি পাগল হয়ে গিয়েছে। কেবল মা-মা করে কাঁদে, মাটিতে মুখ ঘষে। পুজোর জন্যে রয়েছে মন্দিরে, পুজোতেও আর মন নেই। লাঠি কাঁধে করে মন্দিরের চার পাশে ঘুরে বেড়ায়। গায়ে জামা-কাপড় রাখে না, চুলও ঝাঁকড়-মাকড়।

মন বড় উতলা হয়, চোখের কোণে জল জমে। একবার নিজের চোখে দেখে এলে হয় না? তিনি কি সত্যি বদলে যেতে পারেন? কতদিন আগে সেই যে দেখেছিল তাঁকে, পুণ্য-পবিত্র সদানন্দ পুরুষ, সে কি পাগল হয়ে যেতে পারে? যদি কাছে গিয়ে বসে চিনবে না কি সারদাকে, নেবে না কি তার স্নিগ্ধ হাতের শুশ্রূষা? কে জানে! কে বললে, চোখ দুটো নাকি সব সময়ে লাল! দয়ায় ভরা সেই যে দুটি প্রসন্ন চোখ সে কি বিমুখ হয়ে থাকবে? কণ্ঠস্বরে সেই যে ভালোবাসা সে কি ক্ষয় হয়ে যাবার মত?

মন কিছুতেই সায় দেয় না। তিনি ডাকবেন সেই আশায় এত দিন প্রতীক্ষা করে আছি। আমি শাশ্বতী প্রতীক্ষা। শাশ্বতী সহিষ্ণুতা। কিন্তু কই, ডাকছেন কই?

না, এসেছে ডাক। ফাল্গুনী পূর্ণিমা গৌরাঙ্গের জন্মতিথি। সে উপলক্ষে আত্মীয়ারা কেউ-কেউ যাচ্ছে কলকাতায়, গঙ্গাস্নান করতে। তাদের সঙ্গে গেলে হয়! গিয়ে দেখে আসতে পারি! তাঁকে দেখাই আমার গঙ্গাস্নান! তাঁকে দেখাই আমার ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

বাবাকে বলব? কি না-জানি মনে করবেন! হয়তো বুঝে নেবেন অন্তরের কথাটি। লজ্জায় মরে গেল সারদা।

স্নানার্থিনীদের কেউ কথাটা তুলল সারদার বাপের কানে। তিনি এক কথায় রাজী। শুধু রাজী নন, তিনি নিজে যাবেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

পায়ে-হাঁটা পথ, ট্রেন-স্টিমারের নাম-গন্ধ নেই। এক পালকি, তায় অত খরচ করবার মত অবস্থা নয় রাম মুখুজ্জের। সুতরাং মাঠ ভেঙে-ভেঙে চলো—মাঠের পর মাঠ, মাঠের সমুদ্র। মুক্ত হাওয়ার মতই খুশি-খুশি মন, মাটির ঢেলা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলেছে সারদা। ক্ষীণাঙ্গী, শামলা মেয়ে। আঠারো বছর বয়স। কোনোদিন পথে নামেনি, খোঁজেনি দিগন্তের ঠিকানা। ধু-ধু করছে মাঠ, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ, কোথায় একটু গাছের ছায়া, কোথায় একটু পুকুরের জল! শুধু পথ আর পথ, পথচিহ্নহীন প্রান্তরের ঔদাসীন্য! এ কি দুরন্ত অভিসার! তবু ক্লান্ত দেহে পা টেনে-টেনে

চলেছে সারদা। দুদিন কাটল আর বুঝি কাটে না। প্রবল জ্বর এসে গেল সারদার।

অফুরন্ত মাঠের দিকে চেয়ে রইল সে শূন্য চোখে। এত দূর টেনে এনে এইখানে শেষে ঠেলে ফেলবে!

সামনের চটিতে নিয়ে গিয়ে তুললেন রাম মুখুজ্জে। উপায় কি! যত দিন জ্বর না ছাড়ে, দেহ না সুস্থ হয়, যাত্রা স্থগিত রইল। কে জানে বিধি বাম হলে ফিরে যেতে না হয় জয়রামবাটি।

সেই জ্বরের ঘোরে, চটিতে, সেই কালো মেয়েটির সঙ্গে দেখা। সেই কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী কল্যাণী। তার প্রেমতরল দুটি চোখ। স্নেহবারিভরিত স্পর্শ।

এক পা ধুলো নিয়ে বিছানার পাশে বসে পড়ল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। জ্বরে-পোড়া গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল মুহূর্তে।

'কেউ তোমাকে পা ধুতে জল দেয়নি?' জিগগেস করল সারদা।

'না, বোন, আমি এখুনি চলে যাব। তোমাকে দেখতে এসেছি। ভয় নেই, ভালো হয়ে যাবে।'

কোয়ালপাড়ায় মা'র জ্বর হয়েছে। জ্বরে একেবারে বেহুঁস। কোথায় পাই এমন ভক্ত যার স্পর্শে জ্বরের জ্বালা ঠাণ্ডা হবে!

মোটাসোটা কাঞ্জিলাল। ডাক্তার। ভক্ত। মা'র চিকিৎসা করে। তারই ঠাণ্ডা মোটা পেটটিতে হাত দিয়ে শুয়ে থাকেন শ্রীমা।

সেই কাঞ্জিলালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। একদিন এসে মাকে বললে প্রণাম করে, 'মা, আশীর্বাদ করুন আপনার ছেলের যেন উপায় হয়!'

মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'বৌমা এমন আশীর্বাদ করব যাতে সকলের অসুখ হোক, সকলে কষ্ট পাক? এমনটি পারব না বলতে। বরং এই আমার আশীর্বাদ, সকলে ভালো থাক, সকলের মঙ্গল হোক।'

ঠাকুরের প্রবল অসুখের সময় বলছেন তিনি নাগমশাইকে : 'ওগো এগিয়ে এস, এগিয়ে এস, আমার গা ঘেঁষে বোস। তোমার ঠাণ্ডা শরীর ছুঁয়ে আমার দগ্ধ শরীর শীতল হোক।' বলে তাকে জড়িয়ে ধরলেন ঠাকুর।

দারুণ গরম পড়েছে। মা তখন কোয়ালপাড়ায়। বলছেন আকাশের দিকে চেয়ে, 'আঃ, একটু বৃষ্টি হলে ধরিত্রীটা ঠাণ্ডা হত।'

কিছুক্ষণ পরেই শুরু হল ঝড়বৃষ্টি। শিল পড়তে লাগল। আনন্দ-চপলা কিশোরীর মত মা শিল কুড়োতে লাগলেন। মুখে পুরতে লাগলেন তুলে-তুলে। জলে ভিজে লাভ হল এই, আবার জ্বর হল। জ্বরের সঙ্গে-সঙ্গে দুঃসহ গাত্রদাহ।

মেয়েরা মা'র বিছানার দুপাশে বসেছে ঘন হয়ে। তাদের বুকে-পিঠে হাত রাখছেন মা। বলছেন, 'আঃ, এতগুলো মেয়ে, কারু গা ঠাণ্ডা নয়।'

শরৎ মহারাজকে খুঁজছেন জ্বরের ঘোরে। খবর পেয়ে ডাক্তার কাঞ্জিলালকে নিয়ে এসেছে শরৎ। ছটফট করতে-করতে বারে-বারে হাত বাড়াচ্ছেন মা। গায়ের জামা খুলে ফেলল শরৎ। মা'র পাশে বিছানায় গিয়ে বসল তাড়াতাড়ি। মা তার পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, 'আঃ, আমার সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হল। শরতের গা-টি যেন পাথর।'

পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল। পথে বেরিয়েই পেয়ে গেল এক পালকি। বাপে-মেয়ে চলল দক্ষিণেশ্বরের দিকে।

গঙ্গার উপরে নৌকোয় বারবেলা কাটিয়ে নিল। যখন দক্ষিণেশ্বরে পেঁছুল তখন রাত নটা।

... পাঁচ ...

তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী। তুমিই বুদ্ধি, তুমিই শুদ্ধবোধস্বরূপা। তুমিই হ্রী, তুমিই লজ্জা। পুষ্টি-তুষ্টি, শান্তি-ক্ষান্তিও তুমিই।

কেউ সৌভাগ্যে আরূঢ় হয়েছে, দেখি শ্রীরূপিণী তুমি, তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ প্রতাপে পর্বতায়মান হয়েছে, দেখি ঈশ্বরীরূপিণী তুমি, তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ দুষ্কার্য করে নিন্দার ভয়ে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছে, দেখি হ্রীরূপিণী তুমি, তাকে বসে আছ কোলে নিয়ে। তোমার কোল ছাড়া আর স্থান নেই। যে বুদ্ধিবলে বিশ্বজগৎকে প্রতিভাত দেখি তুমি সেই বুদ্ধিরূপে বিদ্যমান। আবার যখন জগৎসত্তা ছেড়ে অনুভব করি শুধু আত্মসত্তা তুমি তখন আবার সেই স্বচ্ছ নির্মলবোধ। ধ্যানমন্থনে অখণ্ডানন্দ। যখন দেখি কেউ প্রকাশ-কুণ্ঠিত হয়ে আছে, রহস্যটি সম্পূর্ণ উন্মোচিত করতে চাইছে না, মনে হয় তুমিই লজ্জারূপে বিরাজ করছ। যখন দেখি কারু প্রতিপত্তি, ভুলতে

পারি না এ তোমারই পালন-পোষণ। যখন দেখি কারো সন্তোষে নিবাস, দেখি তোমারই সেই অম্লান রাজমুকুট। যখন দেখি কেউ জগতের সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আত্মজ্ঞানে তখন বুঝি তুমিই শান্তি। প্রতিকারের শক্তি থেকেও যখন দেখি কেউ অনায়াসে সহ্য করছে অপকার তখন দেখি তুমিই ক্ষমা, তুমিই সর্ববরদা মধুমধুরা করুণা।

আর সকলে গেল নবতে, সারদা সোজা চলে এল রামকৃষ্ণের ঘরে। অর্থ যেমন এসে সমন্বিত হয় বাক্যের সঙ্গে।

'তুমি এসেছ?' রামকৃষ্ণ তৃপ্তস্বরে বললে, 'বেশ করেছ।' বলেই হাঁক দিলে : 'ওরে মাদুর পেতে দে রে—'

কে একখানা মাদুর পেতে দিল। বসল তাতে সারদা।

'এখন কি আর আমার সেজবাবু আছে?' দুঃখ করল রামকৃষ্ণ : 'আমার ডান হাত ভেঙে গেছে।' আবার বলছে জের টেনে : 'কয়েক মাস হল মারা গেছে। সে থাকলে তোমাকে আজ অট্টালিকায় রাখত!'

সারদা বললে, 'আমি নবতের ঘরে গিয়ে থাকি!'

'না, না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধে হবে। এ ঘরেই থাকো।'

রাতের খাওয়া-দাওয়া সব হয়ে গিয়েছে, হৃদে ক'ধামা মুড়ি নিয়ে এল। তাই কটি চিবিয়ে সারদা শুয়ে পড়ল সেই মাদুরের উপর। একটি সঙ্গী মেয়ে শুল তার পাশটিতে।

কী স্নেহশান্ত রাত্রি! চাটিতে সেই কালো মেয়েটির করপল্লবের মত সুকোমল। ক্লান্তকায়ে দক্ষিণসমীরের স্পর্শটির মতন এই ঘুম! অন্তরের আনন্দঘটটির দিকে তাকালো আবার সারদা। দেখল কানায়-কানায় ভরা।

যত সব বাজে গুজব শুনেছিল! লোকের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, কেবল মিথ্যে রটানো। কেমন কর্পূরগৌর কান্তি, কেমন দয়াঘন আর্দ্র চোখ, কেমন দুঃখভঞ্জন কণ্ঠস্বর! কে বলে এ পাগল! এ যে পাগল-করা!

মেঝেতে শুয়ে শান্তিতে ঘুমুলো সারদা।

বলছেন শ্রীমা, 'আগে মেঝেতে শুতাম, তখনো ঘুম আসত, এখন ভক্তেরা পালঙ্কে এনে শোয়াচ্ছে, এখনো ঘুম আসে। কই আমি কিছু তফাত বুঝি না তো!'

ঘুম এসে গেলে আর বিছানা লাগে না। তেমনি ভালোবাসা এসে গেলে লাগে না আর আবরণ-আভরণ। আসল হচ্ছে ঘুম, আসল হচ্ছে ভালোবাসা।

শাশুড়ির কথাও ভাবছে সারদা। কুঠিঘরেই আগে থাকতেন চন্দ্রমণি। অক্ষয়, ঠাকুরের ভাইপো, ঐ কুঠিঘরেই মারা যায়। তার মারা যাবার পর কুঠিঘর ছেড়ে দিলেন চন্দ্রমণি, বললেন, 'আর থাকব না ওখানে। নবতের ঘরে থাকব, গঙ্গাপানে মুখ করে রইব। দরকার নেই আমার কুঠিঘরে।'

কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ না করে ছেড়ে দেবে না রামকৃষ্ণ। ডাক্তার ডেকে আনল। ওষুধ খাওয়াতে লাগল নিজের হাতে। দাগ মেপে, ঘড়ি ধরে।

কত সেবা, কত যত্ন। কত স্পর্শহীন পবিত্র স্পর্শ।

'স্বামীর সঙ্গে গাছতলাও রাজ-অট্টালিকা।' স্বামীর প্রতি উদাসীন এক সধবা মেয়েকে বলছেন শ্রীমা। আবার স্ত্রীর প্রতি বিমুখ এক স্বামীকে বলছেন, 'স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থেকো। দুজনে যেখানেই থাকো, সেখানেই রামরাজ্য।'

রাধুর স্বামীর নাম মন্মথ। একদিন রাধু এসে শ্রীমা'র কাছে নালিশ করলে স্বামী তাকে চড় মেরেছে।

'কেন, কি করেছিলি?' জিগগেস করলেন শ্রীমা।

'গামছা ছুঁড়ে মেরেছিলাম।'

'একটা গামছা ছুঁড়ে মারলেই কি একটা চড় মারতে পারে?' শ্রীমা অবাক মানলেন।

একজন সধবা ভক্ত-স্ত্রীকে সালিস মানলেন। জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ বৌমা, এই রকম হয়?'

'তা রাধু যদি রাগ করে গামছা ছুঁড়ে মেরে থাকে,' বললে সেই স্ত্রী-ভক্ত, 'তা হলে তো তার স্বামী ওরকম করতেই পারে!'

'তাই কি বৌমা?' বালিকাস্বভাব শ্রীমা স্বচ্ছমুখে বললেন, 'তোমাদের ওরকম করে? ঠাকুরের সঙ্গে আমার তো কোনোদিন ওরকম ব্যবহার হয়নি, তাই ওসব জানি না। তা হলে রাধুরই দোষ! শোন্, ঐ যে বৌমা বলে, স্বামীকে ওরকম করতে নেই।'

রাধু কি শ্রীমাকেও কম যন্ত্রণা দিয়েছে? বায়ুরোগে পাগলের মতন হয়ে আছে তখন কোয়ালপাড়ায়। শ্রীমা খাইয়ে দিচ্ছেন। এমন গেরো, মুখে খাবার নিয়ে প্রায়ই ফেলে দিচ্ছে মা'র গায়ে। বিরক্ত হয়ে মা বলে উঠলেন, 'দেখ মা, এ শরীর দেবশরীর। এতে আর কত অত্যাচার সহ্য হবে? ঠাকুর আমাকে কখনো ফুলের ঘা-টি পর্যন্ত দেননি। কখনো তুমি ছাড়া তুই বলেননি। একবার আমাকে লক্ষ্মী মনে করে তুই বলে কী

অপ্রস্তুত! তক্ষুনি জিব কামড়ে বললেন, ওমা, তুমি? কিছু মনে করোনি। আমি লক্ষ্মী মনে করে তুই বলে ফেলেছি!'

মন স্থির করে নিতে দেরি হল না সারদার। এইখানেই সে তার বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে, এই তরুমূলে, বিস্তীর্ণ ছায়ায় সংক্ষিপ্ত আঁচল পেতে। এই তৃণাসনই তার রাজেন্দ্রাণীর সিংহাসন।

মেয়েকে তো কই গদাধর ত্যাগ করেনি, বরং সাদরে গ্রহণ করেছে, স্বহস্তে সেবা করে নীরোগ করে তুলেছে—তৃপ্ত মনে বাড়ি ফিরলেন রাম মুখুজ্জে। স্ত্রীকে গিয়ে দেবেন সেই সুখবর।

'আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?' নহবৎখানায় বন্দিনী সারদাকে জিগগেস করে রামকৃষ্ণ।

'না, তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ।'

সমান বৃক্ষের ডালে আমরা দুই সখার মত দুই পাখি একেবারে পাশাপাশি বসে আছি, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। আমি আর তুমি। অগ্নি আর সোম। আদিত্য আর চন্দ্রমা।

শক্তি আর শিব। প্রপঞ্চরূপিণী আর নিষ্প্রপঞ্চ।

... ছয় ...

এবার অগ্নিপরীক্ষা।

তোতাপুরী স্পর্ধা করে বলেছিল রামকৃষ্ণকে, 'স্ত্রীকে দেশে রেখে খুব কামজয়ের বড়াই করছ। থাকত তোমার সঙ্গিনী হয়ে বুঝতুম কেমন বাহাদুর।'

অন্তরে একটি দীনতা ছিল রামকৃষ্ণের। তাই কোনো ঔদ্ধত্য দেখায়নি। বিনীতের মত অগ্নিপরীক্ষার পূত-দীপ্ত মুহূর্তটির জন্যে প্রতীক্ষা করেছে।

সেই মুহূর্তটি সমাগত। মা, বল দে, বীর্য দে, আমার প্রাণপবন-স্পন্দকে দৃঢ়ভাবনাভূমিতে বিনিশ্চল কর্।

নবত-ঘরে আছে তখন সারদা, চন্দ্রমণির কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে ডেকে পাঠাল। এখন থেকে আমার এখানে শোবে। চন্দ্রমণি ভাবলেন, সংসারে মতি হল বুঝি গদায়ের।

পাশাপাশি দুটি খাট। বড় খাটটিতে রামকৃষ্ণ ব'সে। ছোটটিতে লজ্জাবৃতা হয়ে ঘুমিয়ে আছে সারদা।

বিচার-বিতর্ক করছে রামকৃষ্ণ। মনের মুখোমুখি বসে করছে অনেক খণ্ডন-প্রতিপাদন। সংসার নারীকে ভোগবতী করেছে, তুই একে ভগবতী কর। ক্ষণিক মর্তসীমা ছেড়ে চলে আয় ভূমার নিকেতনে। তুই যদি ষোলো আনা করে যাস তবেই তো লোকে এক পয়সা অন্তত করবে। নারীর মধ্যে দেখবে সেই হরসহচরীকে। অন্তত সত্তার মধ্যে দেখবে সেই সম্ভাবনা, যেমন পুষ্পশাখে আত্ম-দিৎসু ফলের প্রতিশ্রুতি। 'যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না—যা শ্রী স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু।' আর তুই যদি হাল ছেড়ে দিস সংসারজলধি পাবে না সেই স্বর্ণস্বর্গের ঠিকানা। এই সাধনা একমাত্র তোর। আর সবাই হয় স্ত্রীকে বর্জন করেছে, নয়তো ভয়ে-অভিভবে অর্জনই করেনি। তুই শুধু দেখাবি একবার স্ত্রীর মহিমা। কাকে বলে সহধর্মিনী। 'কথং ত্বং জননী ভূত্বা মম বধূরূপেণ সংস্থিতা?' জননী হয়ে কেমন করে আবার বধূরূপে আমার ঘরে বিরাজ করো? ঘরে তোর তিন দেবতা—পিতা, মাতা আর স্ত্রী। তোর এই শেষ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিতা করে যা সংসারে। সেই তোর সদাকারা সদানন্দা স্বয়ংপ্রভা প্রতিমা। নিত্যা অক্ষর-সুধা। 'সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে।' নারীর উত্তুঙ্গতম গৌরবের মুকুট পরিয়ে দে তার মাথায়। ভবনেশ্বরীর মধ্যে ভুবনেশ্বরীকে দ্যাখ।

কিন্তু রামকৃষ্ণের মনেও কি ভয় নেই? আছে। ভয়, পাছে সারদা মোহিনীরূপ ধরে। তাকে তার অমৃতের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। তাই ভবতারিণীর কাছে এই শুধু আকুল প্রার্থনা রামকৃষ্ণের : 'মা, আমার স্ত্রীর ভিতর থেকে কামভাব দূর করে দে।'

কোনো ভয় নেই। আমি শিরাকঙ্কালগ্রন্থিশালিনী মাংসপাঞ্চালি নই। আমি ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। আমি প্রতিনিয়তা শক্তি। আদিভূতা। চিন্ময়ী চিদ্‌বিলাসিনী। তোমার সর্বতপস্যার সিদ্ধি। তোমার মন্ত্রঘনীভূতা প্রতিমা। স্বল্পাক্ষরময়ী হয়েও সারবতী অখিলবিদ্যা।

মাকুকে তিরস্কার করছেন শ্রীমা : 'সংসারে যে কি সুখ তা তো দেখছিস! স্বামী-সুখও দেখলি! লজ্জা হয় না, আবার স্বামীর কাছে যাস? এতদিন আমার কাছে থেকে কী দেখলি? এত আকর্ষণ কেন, কেন এত পশুভাব? কী সুখ পাচ্ছিস? ফের যদি যাবি, দূর করে দেব।

পবিত্র ভাবটা কি স্বপ্নেও তোদের ধারণা হয় না? এখনো কি ভাই-বোনের মত থাকতে পারিসনে?'

কে একটি স্ত্রীলোক এসেছে মা'র কাছে। কণ্ঠস্বর অনুতাপে ভরা। 'মা, আমাদের উপায় কী হবে?'

মা ঈষৎ বিরক্ত হলেন। বললেন, 'তোমাদের বছর-বছর ছেলে হবে, একটুও সংযম নেই! এখন আমার কাছে এসে, আমাদের উপায় কী, বললে কী হবে বলো?'

সেজে-গুজে একজন মহিলা এসেছে মা'র কাছে। পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতেই মা বললেন, 'ওখানেই করো না মা, পায়ে কেন?'

মহিলাটির স্বামীর খুব অসুখ। তাকে ভালো করে দিতে হবে তার জন্যে মাকে পীড়াপীড়ি করছে। 'আপনাকে এর উপায় করতেই হবে। আপনি বলুন তিনি ভালো হবেন।'

'আমি কি জানি মা, ঠাকুরই সব। ঠাকুর যদি ভালো করেন তবেই হবে।'

'আপনি বলুন ঠাকুরের কাছে। আপনার কথা কি ঠাকুর ঠেলতে পারবেন?' কাঁদতে লাগল মহিলা।

'ঠাকুরকে ডাকো তিনি যেন তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় রাখেন।'

মহিলা চলে গেল প্রণাম করে।

'সব লোকের জ্বালাতাপে শরীর জ্বলে গেল মা।' গায়ের কাপড় ফেলে মা শুয়ে পড়লেন। 'অমন বিপদ, ঠাকুরের কাছে এসেছে, মাথা-মুড় খুঁড়ে মানসিক করে যাবে--তা নয়, কি সব গন্ধ-টন্ধ মেখে কেমন করে এসেছে দেখ! অমন করে কি ঠাকুর-দেবতার স্থানে আসতে হয়? এখনকার সবই কেমন একরকম!'

এমনি আরো কত দিন হয়েছে।

উত্তরের বারান্দায় বসে জপ করছেন মা, পাঁচ-ছটি স্ত্রীলোক এসে হাজির। কি ব্যাপার? একজনের পেটে টিউমার হয়েছে, ডাক্তার বলেছে অস্ত্র করতে হবে, তাই তিনি ভয় পেয়েছেন। এখন মা'র পায়ের ধুলোয় টিউমারটি যদি আরাম হয়! কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিলেন না মা। বললেন, 'ঐ চৌকাঠ থেকে ধুলো নাও।'

'আপনি আশীর্বাদ করুন যেন ও সেরে ওঠে—'

'ঠাকুরকে ডাকো, উনিই সব।' চঞ্চল হয়ে বললেন, 'তবে তোমরা এখন

এস, রাত হল।' ওরা চলে যাবার পর মা বললেন নবাসনের বউকে, 'গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে ফেল—'

তেমনি একদিন হয়েছিল ঠাকুরের বেলায়। কামারপুকুর থেকে কে একজন দেখতে এসেছিল তাঁকে। লোকটা ভালো নয়। সে চলে যাবার পর ঠাকুর বলে উঠলেন, 'ওরে দে, দে, ওখানটায় এক ঝোড়া মাটি ফেলে দে।' কেউ ফেলতে গেল না। তাই দেখে ঠাকুর নিজেই কোদাল নিয়ে ঠনঠন করে খানিকটা মাটি ফেলে দিয়ে তবে ছাড়লেন। বললেন, 'ওরা যেখানে বসে মাটি শুদ্ধ অশুদ্ধ হয়।'

গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঝাঁট দিয়ে দিল বউ। নিচের বিছানায় শুয়ে গায়ের কাপড় খুলে ফেলে বলে উঠলেন মা, 'আমাকে বাতাস করো, বাতাস করো, শরীর জ্বলে গেল। গড় করি মা কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কারো বা পঁচিশটা ছেলে-মেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে—মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু! সংযম নেই কিছু নেই। জোরে বাতাস করো মা, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না।'

মাঝে-মাঝে মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে যায় সারদার। ঘোমটাটি সরিয়ে পরিপূর্ণ চোখে দেখে ঠাকুরকে। এখনো বসে আছেন খাটের উপরে। ঘুম তো দূরের কথা, পাষাণের মত নিশ্চল, নিশ্বাস পড়ছে কিনা কে জানে! ভয় পেল সারদা। ঘরের বাইরে বারান্দায় শুয়েছিল কালীর-মা, তাকে জাগাল ব্যস্ত হয়ে। সে গিয়ে হৃদয়কে ডেকে আনলে। হৃদয় মন্ত্র শোনাতে লাগল ঠাকুরকে। মন্ত্র শুনতে-শুনতে সংহত তুষার বিগলিত হল, সমাধি-ভূমি থেকে নেমে এল রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ তারপর নিজেই সারদাকে শিখিয়ে দিল যত্ন করে, কোন লক্ষণে কোন মন্ত্র বলে ভাঙাতে হবে সমাধি। সারদার আর ভয় নেই, এখন তার আনন্দ, অবিচ্ছিন্ন আনন্দ। তার এখন ঘুমিয়েও আনন্দ, জেগে উঠেও আনন্দ। রামকৃষ্ণের সাধনার সমস্ত চাবিকাঠিটি এখন তার হাতে।

তুমি সমাধি আমি মন্ত্র। তুমি অর্গল আমি কুঞ্চিকা।

তুমি কাব্য আমি ব্যাখ্যা। তুমি ভাব আমি মূর্তি।

সরলা বালিকাকে কে একজন বুঝিয়ে দিয়েছে, স্বামীর কাছ থেকে তোর পাওনা-গণ্ডা ষোলো আনা আদায় করে নিবি। সন্তান না হলে স্ত্রী-লোকের সংসারই বা কি, ধর্মই বা কিসের। স্বামী অসংসারী হয়েছে বলে

তুই তো আর সন্ন্যাস নিসনি! তুই তোর আদায়-উশুল ছাড়বি কেন?

শরতের শেফালিকার মতই সরল-শুভ্র সে বালিকার রূপ। মাথা নামিয়ে সলজ্জ মুখে বললে একদিন সারদা, 'তাই তো, ছেলেপুলে একটাও হবেনি, সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে?'

সর্বজীবের যিনি জননী হবেন তার মধ্যে এই সন্তান-আকাঙ্ক্ষা তো স্বাভাবিক। যে মাতৃত্বের উন্মেষ হবে সারদার মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাটি তো তারই সৌরভসংবাদ। এ আকাঙ্ক্ষা তো দেহসুখের ছলনা নয়, এ ভুবন-প্লাবিনী পরমপাবনী স্নেহগঙ্গা।

যেন খুশি হল রামকৃষ্ণ। বললে, 'একটা ছেলে খুঁজছ কি গো! তোমার এত ছেলে হবে যে তাদের মা-ডাকের চোটে টিকতে পারবে না।'

আমি জগতের মা হব না তো আর কে হবে? 'অহং রাষ্ট্রী, সংগমনী বসুনাং।' আমিই একমাত্র অধিশ্বরী, আমিই পার্থিব ও অপার্থিব ধন-দাত্রী। আমিই প্রকৃতি বিকৃতিশূন্যা। আমিই সর্বাবভাসিকা বুদ্ধি। আমিই সর্বাশ্রয়দাত্রী মহামায়া।

'তাই আজ দেখছি বাবা, কত দেশদেশান্তর থেকে কত ছেলেই যে আমার আসছে।' বললেন শ্রীমা। 'নরেন, বাবুরাম, ওরা সব কত কষ্ট করে গেছে। এখন তোমাদের মহারাজ—সেই রাখালকেও কতদিন ভাতের হান্ডা মাজতে হয়েছে—'

'একদিন একটু মিছরির পানা খেতে দিয়েছিলাম বাবুরামকে। বাবু-রামের তখন পেটের অসুখ। ঠাকুর তা দেখতে পেয়েছিলেন। আমাকে ডেকে বললেন, তুমি বাবুরামকে কী খেতে দিয়েছিলে? আমি বললুম, মিছরির পানা। ঐ কথা শুনে ঠাকুর বললেন, ওদের যে সাধু হতে হবে। ও সব কী অভ্যেস করাচ্ছ?' মিছরির পানা আর নেই, কিন্তু মায়ের প্রাণের অনুক্ত কান্নাটি যেন তারও চেয়ে মিষ্টি, তারও চেয়ে স্নিগ্ধকর!

বাবুরাম মহারাজ দেহ রাখবার পর মা বলছেন স্ত্রী-ভক্তদের, 'আজ আমার বাবুরাম চলে গেল। সকাল হতে আমার চক্ষের জল পড়ছে।' বলতে-বলতেই চোখের জলের বন্যা নেমে এল। 'বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি, সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত—'

নরেনের কথা বলতেও মা গদগদ : 'আহা, নরেন আমাকে মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম দুর্গাপুজো করলে। আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা

দেওয়ালে পুজুরীকে। পুজোর দিন লোকে লোকারণ্য, ছেলেরা সব খাটা-খাটনি করছে, এমন সময় নরেন এসে আমায় বললে, মা, আমার জ্বর করে দাও। সে কি কথা? ওমা, বলতে-না-বলতেই খানিকবাদে হু-হু করে জ্বর এসে গেল নরেনের। ওমা, একি হল, এখন কি হবে? নরেন বললে, কিছু ভোবো না মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম, নইলে কখন কোন ছেলেটার কাজে কী ত্রুটি দেখে রেগে উঠে থাপ্পড় মেরে বসব ঠিক নেই। তখন ওদেরও কষ্ট আমারও কষ্ট। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে। তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই বললুম, ও নরেন এখন তা হলে ওঠো। হ্যাঁ, মা, এই উঠলুম আর কি। বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল।'

'মা ঠাকুরুণ যে কি বস্তু বুঝতে পারিনি, এখনো কেউই পারো না, ক্রমে পারবে।' শিবানন্দকে আমেরিকা থেকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ : 'শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির সেখানে অবমাননা বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে! এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই, মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে ছাই হবে। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি? শক্তির পুজা, শক্তির পুজা। তবু এরা অজান্তে পুজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পুজা করবে, তাদের কি কল্যাণ হবে না? আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন-দিন সব বুঝতে পারছি। তাই তো বলছি, আগে মায়ের জন্যে মঠ চাই।'

আর শরৎ? শরৎ তো মা'র বাসুকি।

'আমার ভার নেওয়া কি সহজ?' বলছেন শ্রীমা, 'শরৎ ছাড়া কেউ ভার নিতে পারে এমন তো দেখিনি। সে আমার বাসুকি, সহস্রফণা ধরে কত কাজ করছে, যেখানে জল পড়ছে সেখানেই ছাতা ধরছে।'

মা'র আরেক ছেলে, ডঙ্কা-মারা ছেলে, দুর্গাচরণ। ওরফে নাগ-মশাই।

'আহা, তার কি ভক্তিই ছিল! এই তো দেখ শুকনো কটকটে শালপাতা, এ কি কেউ খেতে পারে? ভক্তির আতিশয্যে, প্রসাদ ঠেকেছে বলে পাতাখানা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেলে। আহা, কি প্রেমচক্ষুই ছিল তার! রক্তাভ চোখ, সর্বদাই জল পড়ছে। কঠোর তপস্যায় শরীরখানি শীর্ণ। আহা,

আমার কাছে যখন আসত, ভাবের আবেগে সিঁড়ি দিয়ে আর উঠতে পারত না, এমনি—' মা নিজে উঠে দেখালেন সেই ভাব— 'থর থর করে কাঁপত, এখানে পা দিতে ওখানে পড়ত। তেমন ভক্তি আর কারু দেখলুম না।'

সেই দুর্গাচরণকে মা একখানা কাপড় দিয়েছেন। পাগড়ির মত করে সে তা মাথায় জড়িয়ে রেখেছে। আর যখন-তখন উল্লাসে লাফ দিয়ে বলছে, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল।'

মাকে যেদিন প্রথম দেখতে আসে সেদিন মা'র একাদশী। কোনো পুরুষ-ভক্তই মাকে তখনো সাক্ষাৎ-দর্শন করতে পায় না, সিঁড়িতে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। ঝি শুধু হেঁকে নাম বলে দেয়, মা মনে-মনে আশীর্বাদ করেন।

সেদিন ঝি বললে, 'মাগো, নাগমশাই কে? তিনি প্রণাম করছেন তোমাকে। কিন্তু এত জোরে মাথা ঠুকছেন, রক্ত বেরুবে যে। পেছন থেকে মহারাজ কত বলছেন থামবার জন্যে, কিন্তু কোনো বাক্যই নেই। যেন হুঁশ নেই কিছুতেই। পাগল নাকি মা?'

মা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওগো, যোগেনকে বলো এখানে পাঠিয়ে দিক।'

যোগেন ধরে নিয়ে এল দুর্গাচরণকে। মা দেখলেন, কপাল ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে অঝোরে। এখানে পা ফেলতে ওখানে ফেলছে, চোখের জলে দেখতে পাচ্ছে না মাকে। মুখে শুধু ঠাকুরের মন্ত্র—মা-মা ধ্বনি। পাগল অথচ শান্ত, বিহ্বল অথচ গম্ভীর।

মা উঠে এলেন। ধরে বসালেন দুর্গাচরণকে। নিজের হাতে মুছে দিলেন চোখের জল।

এই তো মা। সন্তান যখন ঠিক-ঠিক কাঁদে, কান্নার মধ্যে আকুলতার অগ্নিস্পর্শ লাগে, তখন এমনি করেই উঠে আসেন। ধরে বসান। চোখের জল মুছে দেন নিজের হাতে।

মা'র কাছে খাবার ছিল—লুচি, মিষ্টি, ফল। নিজে কিছু খেয়ে নিয়ে খাইয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু কিছু কি খেতে পারে? খাবার দিকে মন নেই, শুধু মা-মা রব! মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বসে আছে উন্মনার মত।

মা'র তখন খাবার সময়। মেয়েরা বলতে লাগল, 'মা, তোমার খাওয়া বুঝি হল না। মহারাজকে বলি এঁকে সরিয়ে নিতে।'

মা বাধা দিলেন। বললেন, 'না, না, থাক। একটু স্থির হয়ে নিক।'

দুর্গাচরণের গায়ে-মাথায় হাত বুলুতে লাগলেন মা। ঠাকুরের নাম করতে লাগলেন। তবে হুঁশ এল।

মা খেতে লাগলেন, সঙ্গে-সঙ্গে খাওয়াতে লাগলেন দুর্গাচরণকে।

এই না হলে মা!

খাওয়া হয়ে গেলে ধরাধরি করে দুর্গাচরণকে নিয়ে গেল নিচে। যাবার সময় বলে গেল মাকে, 'নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু!'

এই না হলে সন্তান!

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল রামকৃষ্ণ। না, কি সারদাই তাকে উত্তীর্ণ করিয়ে দিল? পালে অনুকূল বায়ু সঞ্চার করে নিয়ে গেল সচ্চিদানন্দের অলোকতীর্থে!

রামকৃষ্ণের পদসেবা করছে সারদা। এক সময় কি ভেবে হঠাৎ জিগগেস করে বসল, 'আমি তোমার কে?'

'তুমি? তুমি আমার আনন্দময়ী।' বললে রামকৃষ্ণ।

তুমি অরূপের রূপসাগর। তুমিই মধুরূপিণী মহামায়া। সর্বতোভদ্রা, অক্লিষ্টমুখী, সুপ্রসন্নাস্যা। অন্নপূর্ণা নিত্যতৃপ্তা। দুর্বৃত্তবৃত্তশমনী হয়ে আবার পরমার্তিহন্ত্রী।

'যে মা মন্দিরে সে মা-ই নহবতে।' বললে আবার রামকৃষ্ণ: 'আবার সেই এখন আমার পদসেবা করছে।'

তুমি বহুরূপিণী শক্তি। সর্বেশ্বরেশ্বরী। প্রসন্না ও বরদারূপে সন্নিহিতা হয়েছ সংসারে। আর ভয় নেই। যে আনন্দের সংবাদ পেয়েছে তার আর ভয় কি।

...সাত...

সেই শক্তিস্বরূপিণীকে পূজা করল রামকৃষ্ণ। ষোড়শী পূজা। ফলাহারিণী অমাবস্যায় কালিকা-পূজা।

ভালো-মন্দ কিছুই বুঝতে পারে না সারদা। রামকৃষ্ণ বলে দিলে রাত নটার সময় এস। তোমার পূজা করব। সে আবার কি! তবু যখন বলেছেন ঠিক নটার সময় হাজির হল সারদা।

লুকিয়ে পুজো হচ্ছে। সারদা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'বোসো।'

রামকৃষ্ণের চৌকির উত্তর পাশে গঙ্গাজলের জালার দিকে মুখ করে পশ্চিমমুখো হয়ে বসল সারদা। রামকৃষ্ণ বসল পুবমুখো হয়ে। প্রথমেই সারদার পা দুখানিতে আলতা পরিয়ে দিলে, কপালে-সিঁথিতে মাখিয়ে দিলে সিঁদুর। পরিয়ে দিলে নববস্ত্র।

কত আয়োজন-সম্ভার। কত মন্ত্রোচ্চারণ, কত স্তোত্রপাঠ। কিছুই বুঝতে পারছে না সারদা। তন্গতের মত বসে আছে। তার পায়ে ফুল ফেলছে রামকৃষ্ণ, স্পর্শ করছে তার পা, তবু কিছু বলতে-কইতে পারছে না। দিব্যি পুজাটি গ্রহণ করছে নীরবে।

এই রামকৃষ্ণের শেষ পুজা, শ্রেষ্ঠ পুজা। এতদিন দীর্ঘ সাধনায় যত-কিছু বস্তুভার জমেছিল তার, যত-কিছু আসন-বসন, মালা-কবচ, সব সারদার পায়ে বিসর্জন দিলে। শুধু তাই নয়, সমস্ত সাধনার সার একটি প্রণিপাতে ঘনীভূত করে উৎসর্গ করলে। আর তা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করল সারদা।

সারদার হুঁশ নেই, রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। রাত যখন প্রায় তিন প্রহর সমাধি ভাঙল। সারদাকে বললে, এখন যাও ফিরে নবতে।

বাইরে বেরিয়ে এসে মনে হল সারদার, কি আশ্চর্য, প্রণাম তো ফিরিয়ে দিলাম না! হে অন্তর্যামী, নাও আমার আত্মনিবেদন। মনে-মনে প্রণাম করল সারদা।

সেই শক্তিস্বরূপিণী, যাকে ঠাকুর পুজো করেছিলেন, তিনি আছেন কোথায়? যিনি পূজিতা, বন্দিতা, আরাধিতা, কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান?

'বাবা, জানো তো, জগতের প্রত্যেকের উপর ঠাকুরের মাতৃভাব।' একজন ভক্তকে বললেন শ্রীমা: 'সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্যে আমাকে এবার রেখে গেছেন।'

সেই জগতের যিনি মা, কোথায় তাঁর ঘর-দোর?

এই একমুঠো ঘর, ছোট্ট একটুখানি দরজা। ঢুকতে গেলে মাথা ঠুকে যায়। ঘরের চারপাশে একফালি বারান্দা, তাও দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারই নাম নবত—দক্ষিণেশ্বরের নবত!

ওই একটুখানি ঘরে কত কাণ্ড। প্রকাণ্ড এক সংসারের আয়োজন। যত রাজ্যের জিনিস-পত্তর, হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাসন-কোসন। ভাঁড়ারের সাজ-

সরঞ্জাম, তেল-নুন থেকে ফোড়ন-তেজপাতা। শুধু তাই নয়, খাবার-জলের জালা। শিকেতে ঠাকুরের যত পথ্যের যোগাড়। হাঁড়িতে মাছ জিয়োনো। সারা রাত কলকল করে সে-মাছ।

কলকাতা থেকে দেখতে আসে মেয়েরা। বলে, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো! যেন বনবাস গো।'

কলিযুগের সীতা। নির্বাসিতা। নির্বাসনায় অধিষ্ঠিতা।

'কী চাইবি ভগবানের কাছে?' বললেন শ্রীমা।

'কেন পিসিমা,' নলিনী বললে, 'জ্ঞান ভক্তি সুখ-সম্পদ—যাতে মানুষ সংসারে শান্তিতে থাকে—এই সব।'

'না, চাইবার যদি কিছু থাকে, তবে তা নির্বাসনা।'

সারদার নির্বাসনটিই নির্বাসনা।

কিন্তু ঠাকুর রসিকতা করে বলেন, খাঁচা। লক্ষ্মী এসে থাকে সারদার সঙ্গে, তাই বলেন, খাঁচায় শুকসারী থাকে। সারদা নথ পরে বলে নাকের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে ইশারায় বোঝান রামলালকে। 'ওরে খাঁচায় শুক-সারীকে ফলমূল ছোলাটোলা কিছু দিয়ে আয়।'

লোকে ভাবে, সত্যি-সত্যি বুঝি পাখি আছে খাঁচায়। রামলাল বোঝে তার খুড়ি আর বোনের কথা বলছেন।

ষোড়শীপুজোয় যেসব শাঁখা-শাড়ি পেয়েছে তা নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সারদা। তার তো গুরু-মা নেই যে তাকে দিয়ে দেবে! তাই রামকৃষ্ণকে গিয়ে জিগগেস করল।

'তা তোমার গর্ভধারিণী মাকে দিতে পারো। কিন্তু দেখো,' গম্ভীর হল রামকৃষ্ণ, 'তাঁকে যেন মানুষ জ্ঞান করে দিও না। দিও সাক্ষাৎ জগদম্বা ভেবে।'

কথা শুনে তৃপ্তিতে ভরে গেল সারদা। যা দিয়ে সে পুজো পেয়েছে তাই দিয়ে সে আবার পুজো করবে।

নানান জায়গা থেকে মেয়েরা আসে সারদাকে দেখতে। ঠাকুর বলেন, রূপ ঢেকে এসেছে কিতু সে রূপেরও যেন অবধি নেই। পরনে চওড়া লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি। সিঁথেয় সিঁদুর। কালো ভরাট মাথার চুল পা পর্যন্ত ঠেকেছে। গলায় সোনার কণ্ঠহার। নাকে নথ, কানে মাকড়ি। মধুরভাব সাধনের সময় মথুরবাবু যে চুড়ি দিয়েছিলেন ঠাকুরকে, সেই চুড়ি দুহাতে।

মেয়েরা দেখে আর আপশোষ করে, এমন মেয়ের সংসার হল না গো!

ঠাকুর সব বুঝতে পারেন। বলেন এসে মাকে, 'ওরা সব হাঁস-পুকুরের চারধারে ঘুরে বেড়ায়, কি সব নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে। আমি সব শুনতে পাই। তুমি ওদের পরামর্শ শুনোনি বাপু। ওরা সব বলবে, আমার মন ফেরাতে ওষুধ-পালা করো। দেখো বাপু, ওদের কথায় আমায় যেন ওষুধ-পালা কোরোনি। আমার সব আছে। তবে ভগবানের জন্যে সব শক্তি তাঁকে দিয়ে রেখেছি—'

'না, না, সে কি কথা!' সারদা বললে দৃঢ়স্বরে।

ঐটুকু ঘরের মধ্যে সারদা কি চুপচাপ বসে থাকে? দিবারাত্র কাজ করে। গৃহস্থালীর ছোট-বড় সকল কাজ রামকৃষ্ণ তাকে শিখিয়ে দিয়েছে নিজের হাতে। সলতে পাকিয়ে কি করে রাখতে হয় প্রদীপে, তা পর্যন্ত। বসে থাকতে দেয়নি। 'কর্ম করতে হয়, মেয়েলোকের বসে থাকতে নেই, বসে থাকলেই যত বাজে চিন্তা—' সারদাকে উপদেশ দিয়েছে। একদিন তো কতগুলো পাট এনে রাখল সারদার কাছে, বললে, এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও। ছেলেদের জন্যে আমি সন্দেশ রাখব, লুচি রাখব। তথাস্তু। শিকে পাকিয়ে দিল। আরো কিছুদূর গেল সারদা। ফেঁসোগুলো দিয়ে বালিশ বানালো। পটপটে মাদুরের উপর ফেঁসোর বালিশে মাথা রেখে ঘুমুলো পরম শান্তিতে। ক্লান্তিই টেনে আনলো নিদ্রার করুণা।

একজন সধবা বৃদ্ধা এসে মা'র কাছে নালিশ করলেন, 'সংসার-সংসার করেই মরছি, এ কাজ হল না সে কাজ হল না—এই কেবল করছি দিবা-নিশি—'

'কাজ করা চাই বই কি।' তাপমোচন হাসি হেসে বললেন শ্রীমা, 'কর্ম করতে-করতেই কর্মের বন্ধন কেটে যায়, নিষ্কাম ভাবের উদয় হয়। এক দণ্ডও কাজ ছাড়া থাকবে না।'

কাজই তো পূজা। আমরা কি আর কোনো আরাধনা-উপাসনা জানি? আমরা জানি যেখানে আমাদের শ্রম সেখানেই আমাদের আশ্রম। সংসার আমাদের মহান প্রতিষ্ঠান আর তার মহান অনুষ্ঠানটিই কর্ম।

কর্ম করতে-করতে ক্লান্ত হব। ক্লান্তিটিই হচ্ছে নৈবেদ্য। ক্লান্ত হলেই মলয়সমীরের স্পর্শটি উপভোগ্য হবে। তেমনি ক্লান্ত হলেই আস্বাদ্য হবে কৃপার শীতলতা।

'কর্মই হচ্ছে লক্ষ্মী।' বলছেন শ্রীমা : 'আমার মা বলতেন যে খুব ভালো করে রেঁধে-বেড়ে লোকজনকে খাওয়ায় তার ঘরে মা অন্নপূর্ণার নিত্য বসতি।'

ঠাকুরও বলেন সেই কথা। 'মেয়েছেলে কী নিয়ে থাকবে? রান্নাবাড়া নিয়ে থাকবে। সীতা রাঁধতেন। পার্বতী রাঁধতেন। দ্রৌপদী রাঁধতেন। স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধে খাওয়াতেন সবাইকে।'

সারদাও রাঁধে ঠাকুরের জন্যে। সমস্ত মশলার উপর আরেকটি অতিরিক্ত মশলা মেশায়। সে মশলা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সেটি তার অন্তরের সুধা, হৃদয়ের ভক্তি।

তবু ঠাকুর তাকে পরিহাস করে বলেন, 'ছিনাথ হাতুড়ে।'

কামারপুকুরে একদিন খেতে বসেছেন হৃদয়ের সঙ্গে। সারদার সঙ্গে-সঙ্গে তার বড় জা, লক্ষ্মীর মা-ও রেঁধেছে সেদিন। খেতে-খেতে ঠাকুর বলছেন, 'ও হৃদু, এটা যে রেঁধেছে সে রামদাস বদ্যি। আর এটা যে রেঁধেছে সে ছিনাথ হাতুড়ে।'

লক্ষ্মীর মা'র রান্নায় তার বেশি তাই সে রামদাস। আর সারদার রান্নায় তার কম তাই সে ছিনাথ।

'তা বটে।' হৃদয় গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। বললে, 'কিন্তু তোমার ছিনাথ হাতুড়েকে তুমি সব সময়ে পাবে—গা টিপতে, পা টিপতে—ডাকলেই হল। একেবারে হাতের মুঠোয়। আর রামদাস বদ্যি, তার ষোলো টাকা ভিজিট, তাকে পাবে না সব সময়। তা ছাড়া লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে। সে তোমার সব সময়ের বান্ধব।'

'তা বটে, তা বটে।' সানন্দে সায় দিলেন ঠাকুর। 'এ আমার সব সময়ে আছে।'

তাই, ঠাকুর জানেন, সারদার রান্নায় তার না থাক, সার আছে।

'আচ্ছা, আবার বিয়ে কেন হল বল দেখি?' খেতে বসেছেন ঠাকুর, খেতে-খেতে বলছেন বলরামকে, 'স্ত্রী আবার কেন হল? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই, তার আবার স্ত্রী কেন?'

ঠাকুরই উত্তর দিলেন। পরিহাসপ্রসন্নস্বরে বললেন, 'ও, বুঝেছি। এই, এর জন্যে হয়েছে।' বলে থালা থেকে তরকারি তুলে দেখালেন বলরামকে, 'নইলে কে আর এমন করে রেঁধে দিত বলো? হ্যাঁ গো, তাই, নইলে কে আর এমন করে দেখত খাওয়াটা। সব রকম খাওয়া তো আর

পেটে সয় না আর সব সময় খাওয়ার হুঁশও থাকে না।' সারদার প্রতি ইঙ্গিত করলেন : 'ও বোঝে কি রকম খাওয়া সয়! এটা-ওটা করে দেয়, তাই ও যদি চলে যায় মনে হয় কে করে দেবে!'

একটি অন্তরঙ্গ আলেখ্য। মাধুর্যরসের রঙ দিয়ে আঁকা। কিন্তু ঐ কি সারদার তাৎপর্য?

তাকিয়ে দেখ একবার মন্দিরের দিকে। তারপর এই নবতের দিকে। মন্দিরে পাষাণময়ী ভবতারিণী, নবতে প্রাণময়ী সারদা।

ঠাকুরের একাক্ষর মন্ত্র যে 'মা', তারই ঘনীভূত বিগ্রহ। ঠাকুর শুধু মন্ত্রই উচ্চারণ করেননি, বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সমস্ত জীবের যিনি ক্ষুধাহরণ করবেন তারই রেখে গেছেন উদাহরণ।

এমন পরিপূর্ণ সাধনা আর কে করেছে এই পৃথিবীতে? বুদ্ধদেব স্ত্রী ত্যাগ করেছেন। স্ত্রী ত্যাগ করেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। আর অন্যান্যরা স্ত্রী গ্রহণই করেননি, যেমন শঙ্করাচার্য। স্ত্রীকে নিয়ে এমন দিব্য সাধনা আর কার? সমস্ত সাধনাকে কে স্ত্রীতে সারভূতা করেছে? মন্ত্রকে কে দিয়েছে মূর্তি? প্রার্থনাকে নিয়ে এসেছে শরীরীপ্রতিমায়?

উত্তর, শ্রীরামকৃষ্ণ। এই সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ একক। অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এককথায়, রামকৃষ্ণ 'গীতা'। সারদা 'চণ্ডী'।

সেই রাজ্যেশ্বরী সাধ করে কাঙালিনী সেজেছেন। কাঙালিনী সেজে ঘর নিকোচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, রাঁধছেন-বাড়ছেন, এমনকি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পরিষ্কার করছেন!

কাঙালিনী না সাজলে কাঙালেরও মা হবেন কি করে?

জয়রামবাটিতে আছেন তখন মা। তেল মেখে পুকুরে স্নান করতে যাবেন। কিন্তু পুকুরে না গিয়ে কোন দিকে যে গেলেন কেউ দেখেনি। খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, মা গোয়ালের পিছনে বসে গোবর চটকে ঘুঁটে দিচ্ছেন।

যিনি ঘুঁটেকুড়ুনি তিনিই সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী ভুবনেশ্বরী। সর্বাণী সিংহসংবাহা।

আরো নানা বিষয়ে সারদাকে উপদেশ দেন ঠাকুর। কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, কি ভাবে দেবতা-গুরু-অতিথির সেবা, কি ভাবে বা টাকার সদ্ব্যয়! তারপর সেবার যখন রামলালের বিয়েতে দেশে যাচ্ছেন মা, ঠাকুরকে প্রণাম করতে এলেন একবার উত্তরের বারান্দায়। প্রণাম সারা

হবার পর ঠাকুর বলছেন গাঢ়স্বরে, 'সাবধানে যাবে। নৌকোয়-রেলে কিছু ফেলে-টেলে যেয়ো না—'

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঠাকুর দেখলেন তাঁর যাওয়া। ভাবলেন মনে-মনে, ও কে না কে গেল যেন। পরেই ফের ভাবনা ধরল, ও না হলে কে রান্না করে দেবে!

তবেই বোঝো, যিনি গেলেন তিনি অন্নপানদায়িনী জীবধাত্রী। মায়ায় বাঁধা পড়ে আছেন এই সংসারে।

'তোমাকে এই যে দেখছি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত বসে-বসে রুটি বেলছ,' একদিন এক ভক্ত জিগগেস করল মাকে, 'এর মানে কি? মায়া?'

মা হাসলেন মৃদু-মৃদু। বললেন, 'মায়া বই কি। মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।'

অম্বিকা বাগদি জয়রামবাটির চৌকিদার। মা তাকে অম্বিকে-দাদা বলে ডাকেন। একদিন চুপি-চুপি এসে সে মাকে বললে, 'লোকে আপনাকে দেবী, ভগবতী, কত-কি বলে, কই, আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।'

মা হাসলেন কথা শুনে। বললেন, 'তোমার বুঝে দরকার নেই। তুমি আমার অম্বিকে-দাদা, আমি তোমার সারদা-বোন।'

এই প্রশ্ন নিয়ে চন্দ্র দত্তও এসেছিল মা'র কাছে। চন্দ্র দত্ত উদ্বোধন-আপিসের কর্মচারী। দেশ-দেশান্তর থেকে এত লোক আসছে-যাচ্ছে, দেবীজ্ঞানে এত সাধন-আরাধনা, কিন্তু মা'র ঐ তো শাদামাঠা চেহারা। দশ হাতও নেই, সিংহও নেই, নেই বা রক্তচর্চিত খড়্গ। একদিন তাই সে বললে চুপি-চুপি, 'মা, কত দূর দেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে আপনাকে। আপনি তো ঘরের ঠাকুমার মত পান সাজেন শুপুরি কাটেন, ঘর ঝাঁট দেন। আপনাকে দেখে, কই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।'

স্মিতহাস্যে মা বললেন, 'চন্দ্র, তুমি বেশ আছ। আমাকে তোমার বুঝে কাজ নেই।'

'আপনি যে ভগবতী তা আমরা বুঝতে পারি না কেন?' এক স্ত্রী-ভক্ত সরাসরি জিগগেস করল মাকে।

মা বোধহয় এবার একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, 'সকলেই কি আর ঠিকঠিক চিনতে পারে মা? ঘাটে একখানা হীরে পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে সেখানা এক প্রকাণ্ড হীরে। মহামূল্য।'

রাঙন চুষিকাঠি ফেলে আমরা যখন ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চেঁচাব, আর তুমি ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে দুদ্দাড় শব্দে ছুটে আসবে, ছুটে এসে আমাদের কোলে টেনে নেবে, তখন আমরাও বুঝব তুমি আমাদের মা। সকলের মা হয়ে আমার একলার মা!

... আট ...

ষোড়শী পূজার পর সারদা দেশে ফিরল। দেশে ফিরেই দুর্ঘটনা। বাবা মারা গেলেন। বুকে বড় বাজল। কিন্তু কি করা! ভগবান যত দুঃখ-কষ্ট দিচ্ছেন তা তো বুক পেতে নিতে হবে। তিনি যা করবেন তাই তো হবে সংসারে।

দক্ষিণেশ্বরে আবার ফিরে এল। যদি দক্ষিণ-ঈশ্বরের সান্নিধ্যে শোকের জ্বালা স্নিগ্ধ হয়।

আছেন সেই নবতে। সরলা বালিকার মূর্তিতে। চন্দ্রমণির পক্ষচ্ছায়ে।

প্রথম যেবার কলকাতায় এল, কল-ঘরে গিয়েছে, দেখে, কলের মধ্যে সোঁ-সোঁ করে গজরাচ্ছে সাপের মত। দেখেই তো ভয় পেয়ে দে-ছুট। মেয়েদের কাছে গিয়ে বলছে ত্রস্ত হয়ে, 'ওগো, কলের মধ্যে একটা সাপ ঢুকেছে দেখবে এস। সোঁ-সোঁ করছে।' শুনে মেয়েরা তো হেসে কুটপাট। 'ওগো, ও সাপ নয়, ভয় পেয়ো না। জল আসবার আগে অমনি শব্দ হয় কলের মধ্যে।' তখন সারদাও হেসে আটখানা।

এ কাহিনীটিই পরে বলছেন স্ত্রী-ভক্তদের। বলছেন আর হাসছেন। সে সরল হাসির নির্মলতা দেখে কে!

নবত তো নয়, দরমা-ঢাকা অন্ধকূপ। তার মধ্যে আছে বন্দিনী হয়ে। বন্দিনী তবুও আনন্দিনী।

মন্দিরের খাজাঞ্চী বলে, 'তিনি আছেন শুনেছি কিন্তু কখনো দেখতে পাইনি।'

কি করে দেখবে! শুধু আছেন এই জানলে কি দেখা হয়?

যদি দেখতে চাও, কাঁদো। মা বলে আর্তনাদ করো। 'মা'-নামের যে আ-কার, তা আর্তির আকার, আকুলতার আকার, আন্তরিকতার আকার। সেই আ-কার দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত করে দাও।

বরিশালে একটি ভক্ত-ছেলের অসুখ করেছে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। মরবার আগে মাকে একবার দেখতে বড় সাধ। কিন্তু নিজের তো যাবার সাধ্য নেই। মা যদি আসেন! মা'র আবার অসাধ্য কি!

একখানা চিঠি লিখল মাকে। মা, আমার নিদারুণ অসুখ, বাঁচবার বিন্দুমাত্র আশা নেই। সাধ, মরবার আগে তোমাকে একবার দেখি। আমি এখন নিঃস্ব, রুগ্ন, অসমর্থ—তোমার কাছে যাই এমন ক্ষমতা নেই। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে বরিশালে এসে আমাকে দেখে যেতে পারো। দয়া করে একবার আমাকে দেখে যাও।

মা তাঁর একখানি ফোটো পাঠিয়ে দিলেন। লিখলেন, 'বাবাজীবন, ভয় নেই, তোমার অসুখ সেরে যাবে। আমার যে ফোটোটি পাঠালাম তাই দেখো—'

ছায়া-কায়া ঘট-পট সমান। মাকেই দেখল সেই ছবিতে। দেখল মা'র সেই রোগহরণ ক্ষমামধুর চক্ষু দুটি। অসুখ মুছে গেল দেহ থেকে।

ব্রজেশ্বরীর হিস্টিরিয়া। হাতে একগাছি রুপোর তাগা। রোগের প্রতিকারের আশায় কে পরিয়ে দিয়েছে। প্রতিকার দূরস্থান, কেউ বরং তাগা দেখে আধি-ব্যাধির কথা জিগগেস করে বসে। আর জিগগেস করে বসলেই রোগের কথা মনে পড়ে যায় ব্রজেশ্বরীর। আর যেই মনে পড়া অমনি মূর্চ্ছা।

সেদিন ঠিক তাই হল। মা'র ভাজ, সুরবালা, জিগগেস করল ব্রজেশ্বরীকে, 'ও তাগা কেন পরেছ?' মা'র কানে গেল সেই প্রশ্ন। ফলাফল বুঝতে পেরেছিলেন, তাই বিরক্তির সুরে শাসন করলেন ভাজকে, 'কেন, সব কথা জিগগেস করবার কী দরকার?' বলেই তাকালেন ব্রজেশ্বরীর দিকে। বললেন অমিয়ভাষে, 'কোনো ভয় নেই মা, তাগা তুমি খুলে ফেল হাত থেকে। তোমার ও-রোগ অমনিতেই সেরে যাবে।'

নিশ্চিন্ত হয়ে তাগা খুলে ফেলল ব্রজেশ্বরী। সেরে গেল হিস্টিরিয়া।

চাষারা এসে কেঁদে পড়েছে মা'র কাছে। মাগো, দেবতা মুখ তুলে চাইল না, আকাশ খাঁ-খাঁ করছে, এক ফোঁটা মেঘের দেখা নেই। ছেলেপুলে নিয়ে মরতে হবে না খেয়ে।

মা একবার তাকালেন আকাশের দিকে। তারপরে খেতের দিকে। যেন সর্বশূন্য শ্মশানের চেহারা। চোখের জল উথলে উঠল। বললেন, 'ঠাকুর, এ কি করলে? শেষটায় এরা না খেয়ে মরবে?'

মা'র সেই কান্না বর্ষার জল হয়ে নেমে এল সেই রাত্রে। আকাশ-ভাঙা বর্ষা। চাষাদের ঘরে-ঘরে আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল। শুকনো মাঠ ভরে গেল সোনার ধানে।

রাত্রে ঘুম নেই ঠাকুরের। অন্ধকার থাকতে-থাকতেই বেরিয়ে পড়েন ঘর ছেড়ে। এক-একদিন নবতের কাছে এসে লক্ষ্মীকে ডাকেন : 'ও লক্ষ্মী, ওঠ রে ওঠ। তোর খুড়িকে তুলে দে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চলল। মা'র নাম কর্।'

হয়তো শীতের রাত, ঘুম পাতলা হয়ে এলেও লেপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হয় না। লেপের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে সারদা আস্তে-আস্তে বলে লক্ষ্মীকে, 'তুই চুপ কর্। ওঁর কি! ওঁর চোখে ঘুম নেই। এখনো ওঠবার সময় হয়নি। কাক-কোকিল রা কাড়েনি। সাড়া দিসনি।'

সাড়া না পেয়ে ঠাকুর ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসেন। দরজার গোড়া দিয়ে বিছানা-লেপের উপর জল ছিটিয়ে দেন। তখন না উঠে উপায় কি।

এমনিতে চারটের সময় নাইতে যায় সারদা। নেয়ে এসে জপে বসে। বিকেলের দিকে একটু রোদ আসে, পড়ন্ত বেলার নিভন্ত রোদ, তাইতে চুল শুকোবার চেষ্টা করে। ওই টুকুন রোদে চুল কি শুকোয়? এক কাঁড়ি চুল। যোগেন-মা সন্ধের দিকে যখন আসে চুল বাঁধতে, তখন দেখে চুল ভিজে। প্রায়ই চুল বাঁধা হয় না। কেনই বা বাঁধবে? মা যে আলুলায়িত-কুন্তলা।

'ওরে হৃদু,' হৃদয়কে ডাক দিয়ে বলেন ঠাকুর, 'আমার বড় ভাবনা ছিল, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে—কে জানে এখানে কোথায় শৌচে যাবে। হয়তো লোকে নিন্দে করবে, আর তখন লজ্জা পাবে। তা, ও কিন্তু এমন, কখন যে কি করে কেউ টেরও পায় না। আমিও দেখলুম না কখনো বাইরে যেতে।'

কথা কটা কানে ঢুকল সারদার। ভয় ঢুকল মনের মধ্যে। ঠাকুর যখন যা চান তখন তাই তাঁকে দেখিয়ে দেন ভবতারিণী। এইবার বাইরে গেলে নির্ঘাত তাঁর চোখে পড়তে হবে! এখন উপায়! ব্যাকুল হয়ে জগদম্বাকে ডাকতে লাগল সারদা। আমাকে বাঁচাও, আমার লজ্জা রক্ষা করো।

তথাস্তু। জিতে গেল সারদা। জগজ্জননী দুই পাখা মেলে সারদাকে ঢেকে রাখলেন। তেরো বচ্ছর ছিল নবতখানায়, কারুর চোখেই পড়ল না কোনোদিন।

'বুনো পাখি, খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়।' সারদাকে বলেন এসে ঠাকুর : 'মাঝে-মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।'

মাঝে-মাঝে দুপুরবেলা যায় একটু এদিক-ওদিক। ঠাকুরই তাকে দাঁড়িয়ে দেন পথের উপর। বলেন, এখন এদিকে কেউ নেই গো, বেরোও টুক করে। খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সারদা। পাড়ার মধ্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ি একটু ঘুরে এসে আবার সন্ধের আগেই খাঁচায় ঢোকে।

মন্দিরের কাছে জমি নিইয়ে দিলেন শম্ভু মল্লিক। কাপ্তেন শালকাঠ পাঠিয়ে দিল। তাই দিয়ে তৈরি হল চালাঘর। নবতে জায়গার সঙ্কুলান হয় না বলে চালাঘরে উঠে এল সারদা। একটি ঝি রইল তার তত্ত্ব করতে।

সেই ঘরেই ঠাকুরের জন্যে রান্না করে সারদা। বড় থালায় বড়-বড় বাটি সাজিয়ে খাবার নিয়ে যায় ঠাকুরের ঘরে। যাই খান না খান, সজনে খাড়া বা পলতার শাক, বাটির ঐশ্বর্য আছে ঠাকুরের। ছোট বাটি দিলে বলেন, আমি কি পাখি যে ঠুকরে-ঠুকরে খাব? অন্নপূর্ণার ভান্ডারে অনটন নেই কিছুর। পাত্র যদি রিক্তও হয় ভরা থাকবে তা অন্তরের অমৃতে।

দূর থেকেই ঠাকুর সব দেখা-শোনা করেন। নিঃসঙ্গে রেখেও পাঠান একটি অন্তরঙ্গতার সুর। একদিন বিকেলবেলা হঠাৎ হাজির হলেন সেই চালাঘরে। আর তখুনি এমন বৃষ্টি নামল যে ধরল না সারারাত।

'তবে এখানেই চাট্টি রেঁধে খাওয়াও।'

অন্নপূর্ণার মন্দিরে এসে কে কবে অভুক্ত থাকে। সারদা রাঁধল ঝোল-ভাত। কাছে বসে খাওয়াল ঠাকুরকে।

বৃষ্টির আর বিরাম নেই। তবে, উপায় নেই, এ ঘরেই আজ রাত্রি-বাস।

কি রকম একটা ঘনিষ্ঠতার আবেশ আনলেন ঠাকুর। বললেন, 'সেই যে কালীঘরের বামুনরা রাত্রে বাড়ি যায় এ যেন তেমনি হল। তাই না?'

তার চেয়ে বেশি। ওরা যেখানে যায় সেটা শুধু-ঘর, আর যেখানে সারদা থাকে, যেখানে ঠাকুর আসেন, সেটা কালী-ঘর।

ঊনিশ শো আঠারো সালের দুর্গাপুজোর সময় মাস্টারমশাই বললেন এক ভক্তকে, 'মাকে দর্শন করেছ? মহামায়া দেহ ধারণ করে কত ভক্তকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করছেন। যাও, কাল মহাষ্টমী, কালই কিছু পদ্মফুল নিয়ে তাঁর পাদপদ্ম পুজো করে এস।'

পদ্মফুল নিয়ে ভক্ত গেল মা'র মন্দিরে, বাগবাজার-মঠে। যেতে-যেতে দুপুর হয়ে গেল। গিয়ে শুনল সেদিনের মত পুরুষ-ভক্তদের দর্শন হয়ে গিয়েছে। মায়ের পা জ্বলছে, বরফ দেওয়া হচ্ছে। বিকেল থেকে স্ত্রী-ভক্তদের দর্শন চলবে শুধু।

হতাশায় বসে পড়ল ভক্ত। হাতে-ধরা পদ্মগুলি শুকিয়ে আসতে লাগল। তবু ওঠে না, জায়গা ছাড়ে না। অন্তরের পদ্মদল তো ম্লান হবার নয়।

এমন সময় শোনা গেল দুটি স্ত্রী-ভক্ত পথ হারিয়েছে। ঠিক পথ হারায়নি, ঠিকানা ভুলে গিয়েছে। মেডিকেল কলেজের পিছনের গলিতে বাড়ি কিন্তু নম্বর মনে নেই। এখন কে তাদের পৌঁছে দেয়? এমন কি কেউ আছেন এখানে যিনি ও-পথ দিয়ে ফিরবেন?

পদ্মহাতে সেই ভক্তটি উঠে দাঁড়াল। মা'র দর্শন যখন পাব না, তখন যাঁরা মা'র দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন তাঁদের কাউকে যদি একটু সেবা-সাহায্য করতে পাই তবে তাই আমার দর্শন। কলেজ স্ট্রিট হয়ে শেয়ালদা স্টেশনে যাব আমি, আমিই পারব পৌঁছে দিতে।

উপর থেকে খবর এল মা ডেকেছেন। সিঁড়ি বেয়ে টলতে-টলতে উঠতে লাগল ভক্ত। মা এসে দাঁড়ালেন তার তৃষ্ণার্ত চোখের সমুখে, তাকালেন তার মুখের দিকে। কিন্তু এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছে ভক্ত, মা'র মুখের দিকে না তাকিয়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। পদ্মফুল রাখল তাঁর পায়ে। শিশির আর তখন কোথায়, বিকচ হয়ে উঠেছে নয়নের শিশিরে।

'হ্যাঁ, এর দ্বারাই হবে।' মা মনোনীত করলেন। বললেন, 'একে প্রসাদ দাও।' নেবে না কিছুতে ভক্ত, তবু মা তাকে একখানি কাপড় ও একটি টাকা দিলেন। পথহারা স্ত্রী-ভক্ত দুটিকে দিলেন তার হেপাজতে।

অন্ধকারে অনেক ঘোরাঘুরি করে স্ত্রী-ভক্ত দুটিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ভক্ত চলে এল মাস্টারমশায়ের কাছে। সব বললে আগাগোড়া। কিন্তু সর্বশেষে দুঃখের নিশ্বাস ফেললে। বললে, 'কিন্তু মা'র সঙ্গে তো কোনো কথা হল না।'

'কথা হয়নি কি বলছ! মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চেয়েছেন, আর তোমার কি চাই!' বলে নতুন কাপড়খানি পাগড়ির মত করে ভক্তের মাথায় জড়িয়ে দিলেন মাস্টারমশাই। 'সাক্ষাৎ জগজ্জননীকে দর্শন করেছ সশরীরে, তোমার মানবজন্ম সফল হল!'

মা'র মুখখানি দেখিনি, তাঁর পা দুখানি দেখেছি। মা'র মুখে যা অভয় তাই তাঁর চরণে আশ্রয়। মুখে আশ্বাস, চরণেই শাশ্বতী স্থিতি।

সারদার মুখখানি ঘোমটা দিয়ে ঢাকা। চিররহস্যের অবগুণ্ঠন দিয়ে। ঠাকুরের সামনে বসে যখন খাওয়ায় তখনও ঘোমটাটি ছোট হয় না।

কে সইবে সেই অনাবৃত মুখের রূপচ্ছটা! তাই মহামায়া এই যবনিকাটি রচনা করেছেন। শুধু বিস্তৃত করেছেন একটি আভাসের আকাশ। আভাসের অন্তরালে রয়েছেন বিভাত হয়ে।

ঠাকুরের তখন কঠিন আমাশা, সারদা আছে চালাঘরে। ডাক পড়েনি তাই সারদা যাচ্ছে না ঠাকুরের সেবায়। শুধু প্রতীক্ষা করছে। কখন ডাকটি আসে! শুধু ডাকই প্রার্থনা নয়, প্রতীক্ষাও প্রার্থনা।

এমন সময় কাশী থেকে কে একটি মেয়ে এসে হাজির। কেউ জানে না তার নাম-ঠিকানা, লেগে গেল ঠাকুরের শুশ্রূষায়। বোধহয় ঠাকুরের কাজেই এসেছে, চলে যাবে কাজ ফুরুলে। কোন দিকে যাবে কেউ টের পাবে না ঘূণাক্ষরে।

কাশীর মেয়ে এসে অবাক মানল। স্বামীর অসুখ, অথচ স্ত্রী রয়েছে দূরে সরে। ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে। একদিন সন্ধেবেলা কাশীর মেয়ে সারদাকে টেনে আনল হিড়হিড় করে। টেনে আনল ঠাকুরের ঘরে। এনেই একটানে খুলে ফেলল মুখের ঘোমটা।

অঘটন ঘটে গেল। ঠাকুর উঠে বসে স্তব করতে শুরু করলেন।

তুমিই চিতিশক্তিরূপিণী। তুমি পরমা আদ্যা প্রকৃতি। বিশুদ্ধা বোধ-স্বরূপা।

যাকে সাংখ্য বলে পুরুষ, বেদান্ত বলে ব্রহ্ম, উপনিষদ বলে আত্মা, তুমি তাই। তুমি অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশক্তি।

...নয়...

চালাঘরে থেকে সারদার অসুখ করে গেল। শম্ভু মল্লিক ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা করলেন বটে কিন্তু পুরোপুরি সারল না। ঠাকুর বললেন, বাপের বাড়ি ঘুরে এস। যদি স্থানপরিবর্তনে সুফল হয়।

জয়রামবাটিতে এসে বেড়ে গেল অসুখ। সেখানে আর ডাক্তার-বদ্যি

কোথায়, কে বা ব্যবস্থা করে! কলুপুকুরের ধারে শৌচে যায়, বারে-বারে হে'টে যেতে কষ্ট, পুকুর-পাড়েই শুয়ে পড়ে থাকে। একদিন পুকুর-জলে ছায়া দেখে বিতৃষ্ণা এল সারদার—এ হাড়-সার দেহ রেখে লাভ কি! এইখানেই দেহটি থাক, এইখানেই দেহ ছাড়ি। তক্ষুনি কে একটি মেয়ে, গাঁয়ের মেয়েই হবে হয়তো, এদিকপানে চলে এসেছে। দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। ওমা, তুমি এখানে পড়ে কেন? চলো, চলো, ঘরে চলো। বলে তুলে টেনে নিয়ে গেল ঘরে।

তখন আর কি করা, শেষ উপায়, সারদা সিংহবাহিনীর মণ্ডপে গিয়ে হত্যে দিলে। গ্রাম্য দেবী এই সিংহবাহিনী। কোনো নাম-ডাক নেই, কেউ মাড়ায় না তার এলাকা। তারই শরণাপন্ন হল সারদা। হয় দেহ নাও নয় আরোগ্য দাও।

'তুমি কেন পড়ে আছ গো?' সিংহবাহিনী নিজে এসে তুলে দিলেন মাকে। ওলতলার মাটি দিলেন খেতে। অসুখ সেরে গেল।

সারদার অসুখ সারিয়ে দিয়ে নিজেরও অখ্যাতি সারিয়ে নিলেন। দিকে-দিকে রব উঠে গেল, গ্রাম্য দেবী সিংহবাহিনীকে জাগিয়ে দিয়েছে সারদা।

'বড় জাগ্রত দেবতা, সেখানকার মাটি কৌটোয় করে রেখেছি।' বললেন শ্রীমা : 'নিজে খাই, রাধুকেও রোজ খেতে দিই একটু-একটু করে।'

'বোস মা বোস।' একজন স্ত্রী-ভক্তকে বললেন সেদিন শ্রীমা : 'এটি আমার ভাইঝি। নাম রাধারানী। ওর মা পাগল হতে আমিই ওকে মানুষ করি।'

কিশোরী একটি মেয়ে। মায়ের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। কত রকম বুঝিয়ে তার চুল বে'ধে দিলেন, কাপড় পরিয়ে দিলেন, খাইয়ে দিলেন নিজের হাতে।

মহামায়ার এ আবার কোন মায়া!

'এই যে রাধি-রাধি করি, এ তো একটা মোহ নিয়ে আছি!'

দুই পাঁজরার নিচে খুব ব্যথা হয়েছে রাধুর। কাছে বসে মা সে'ক দিচ্ছেন। একটি স্ত্রী-ভক্ত মাকে প্রণাম করে বসল পাশটিতে।

'রাধুর কি হয়েছে মা?'

'রাধুর সেই ব্যথা ধরেছে। দেখ না ছেলে আমার সারা হয়ে গেল।' মায়া ফেটে পড়ল মা'র কণ্ঠস্বরে : 'পোড়া ব্যথা কোথা থেকে এল বলো

দেখি। এত দেখানো হচ্ছে, কত ঠাকুরের মানসিক করেছি, কেউ শোনে না গা?'

ঠাকুরের অসুখে হত্যে দিয়েছিলেন তারকেশ্বরে। একদিন যায় দুদিন যায় পড়েই আছেন। রাতে হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলেন। যেন অনেকগুলো সাজানো হাঁড়ির মধ্যে একটা হাঁড়ি কেউ ঘা মেরে ভেঙে দিলে। আশ্চর্য, সেই শব্দে সব মায়া কাটিয়ে অদ্ভুত একটা বৈরাগ্য এল মনের মধ্যে। ভাবলেন এ সংসারে কে কার? কে কার স্বামী এ সংসারে? কার জন্যে আমি এখানে প্রাণ বলি দিতে বসেছি? উঠে পড়লেন চট করে। কে যেন তুলে দিলে! অন্ধকারে হাতড়াতে-হাতড়াতে চলে এলেন মন্দিরের পিছনে। কুন্ড থেকে স্নানজল নিয়ে দিলেন চোখে-মুখে। পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে গিয়েছে, খেলেন খানিকটা। তবে একটু সুস্থ হলেন। পরদিনই ফিরে এলেন কাশীপুর।

'কি গো, কিছু হল?' জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'কিছু না তো? আমি জানি কিছু হবার নয়। আমিও স্বপ্ন দেখলুম। হাতি ওষুধ আনতে গেছে। মাটি খুঁড়ছে ওষুধের জন্যে। এমন সময় গোপাল এসে স্বপ্ন ভেঙে দিলে।'

কাল পূর্ণ হয়েছে। খেলা শেষ করেছি। বাকি খেলা এবার তুমি খেলবে।

তারপরে মা গেলেন ভবতারিণীর মন্দিরে। দেখলেন মা-কালী ঘাড় কাৎ করে রয়েছেন।

'মা, তুমি এমন করে কেন আছ?'

কালী বললেন, 'ওর ঐ ঘায়ের জন্যে। আমারও গলায় ঘা হয়েছে।'

এক অসুখ ছাড়ে তো আরেক অসুখ ধরে। এবার ধরল ম্যালেরিয়া। সবাই বলে, পিলের দাগ নাও। পিলের দাগ ছাড়া সারবে না এই কম্পজ্বর।

সে এক অমানুষিক ব্যাপার। রুগীকে স্নান করিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয় মাটিতে। তিন-চারজন লোক তার হাত-পা চেপে ধরে জোর করে, যাতে সে যন্ত্রণায় না পালায়। তারপর হাতুড়ে জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়ে পেটের খানিকটা জায়গায় ঘষতে থাকে। পোড়ার যন্ত্রণায় রুগী তীব্রস্বরে আর্তনাদ করে। যত চেঁচায় তত তাকে চেপে রাখে প্রাণপণে।

সারদা স্নান করে এল। তার মা বললেন হাতুড়েকে, 'বাবা, বেলা হয়েছে। নতুন আগুন করে আমার মেয়েটির পিলে দেগে দাও।'

তিন-চারজন দুর্ধর্ষ লোক তাকে ধরতে এল। সারদা বললে, 'না, কাউকে ধরতে হবে না। আমি নিজেই পারব চুপ করে শুয়ে থাকতে।'

কুলকাঠের আগুন দিয়ে পিলে দেগে দিল সারদার। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করল স্থির থেকে। অস্ফুট একটি কাতরোক্তিও বেরুল না মুখ দিয়ে।

স্থির থাকো। যন্ত্রণায় স্থির থাকো, স্থির থাকো সমর্পণে, শরণাগতিতে। যেখানে আছ সেখানেই তোমার স্থির।

মাকু আক্ষেপ করছে : 'কি, এক জায়গায় থির হয়ে বসতে পারলুম না!'

'থির কি গো?' মা বললেন, 'যেখানে থাকবি সেখানেই থির। স্বামীর কাছে গিয়ে থির হবি ভাবছিস? সে কি করে হবে? তার অল্প মাইনে, চলবে কি করে? তুই তো বাপের বাড়িতেই রয়েছিস। বাপের বাড়ি লোকে থাকে না?'

যেখানেই শান্তি সেখানেই তিষ্ঠ। মনে নেই ঠাকুরের কথা?

'মা, তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ করা কি ভালো?'

মা বললেন, 'মন যদি একস্থানে শান্তিতে থাকে তবে তীর্থ-ভ্রমণের কি দরকার?'

আসল তীর্থ হচ্ছে চিত্ত। চিত্তে যদি তীর্থ না থাকে তবে কোথায় তোমার তৃপ্তি?

ম্যালেরিয়ার জন্যে ঠাকুরও পিলে দাগিয়েছিলেন। তাই তো বললেন, 'যা ভোগ আমার উপর দিয়েই হয়ে গেল। তোমাদের আর কারুকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। জগতের সকলের জন্যে আমি ভোগ করে গেলুম।'

গ্রামের কালীপুজার কর্তারা আড়াআড়ি করে শ্যামাসুন্দরীর চাল নিলে না। তাই দেখে শ্যামাসুন্দরী কাঁদছেন। কালীর জন্যে চাল করলুম, এ চাল আমার কে খাবে?

রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন কে এক লালমুখী দেবী দোরগোড়ায় পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন। কতক্ষণ পরে গা চাপড়ে ওঠালেন শ্যামাসুন্দরীকে। বললেন, 'কাঁদিসনে, কালীর চাল আমি খাব।'

ঘুম থেকে উঠে শ্যামাসুন্দরী সারদাকে জিগগেস করলেন, 'লাল রঙ, পায়ের উপর পা দিয়ে বসা—এ কোন ঠাকুর রে সারদা?'

সারদা বললে, 'জগদ্ধাত্রী।'

'আমি জগদ্ধাত্রীর পুজো করব।'

কিন্তু এমন বৃষ্টি, ধান আর শুকোনো যাচ্ছে না। শ্যামাসুন্দরী আবার কাঁদতে বসলেন, 'যদি ধানই না শুকুতে পারি, কি করে তোমার পুজো হবে?'

শেষকালে, ছোট্ট একটুখানি রোদ উঠল। সে আবার কি কথা? হ্যাঁ, তাই—এক চ্যাটাই রোদ। চারদিকে বৃষ্টি হচ্ছে অঝোরে, শুধু যে চ্যাটাইয়ে ধান শুকুতে দিয়েছে সেই পরিমাণ রোদ!

হয়ে গেল পুজো। প্রতিমা বিসর্জনের সময় কানের একটি গয়না খুলে রাখলেন শ্যামাসুন্দরী। তারপর কানে-কানে বলে দিলেন, 'মা জগাই, আবার আর-বছর এসো।'

পর বছরে পুজোর সময় সারদার কাছে কিছু চাঁদা চাইলেন শ্যামা-সুন্দরী। যেন খুব উপযুক্ত রোজগেরে জামাইয়ের হাতে মেয়ে দিয়েছেন, সাহায্য করবার ক্ষমতা রয়েছে যথেষ্ট। সারদা বললে, 'একবার হল, হল, আবার ল্যাঠ্যা কেন? ও আমি পারবনি।'

রাত্রে স্বপ্নে তিনজন এসে হাজির। একা জগদ্ধাত্রী নয়, সঙ্গে জয়া-বিজয়া। সারদাকে বললে সরাসরি, 'আমরা তবে যাই।'

'না, না, তোমরা কোথায় যাবে?' সারদা ধড়মড় করে উঠল। 'তোমরা থাকো। তোমাদের যেতে বলিনি।'

কী চাঁদা দিতে পারে সারদা? শরীরের শ্রম দিতে পারে। বাসন মাজতে পারে।

সেই থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় সে গ্রামে আসে আর বাসন মাজে।

মায়ের আরেক ছেলে যোগীন। ঠাকুর বলেন অর্জুন। তার ধ্যানারক্ত চোখ দুটিকে বলেন অর্জুনচক্ষু।

যখন যে দু-এক আনা পয়সা পায় মা'র নামে তুলে রাখে। তিল-তিল করে ছশো টাকা সঞ্চয় করেছে। তাই থেকে সে কাঠের বাসন কিনে দিলে, বারকোষ, লটকেন আর সিংহাসন। জয়রামবাটির জগদ্ধাত্রী পুজোর বাসন। মাকে বললে, 'মা, তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না।'

তা ছাড়া—মাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করা দরকার—তিনশো টাকা দিয়ে তিন বিঘে জমি কিনে দিল। সেই আয়ে পুজো হবে বছর-বছর।

যোগীন একখানা লেপ করিয়ে দিয়েছিল মাকে। সেটা বড় পুরোনো হয়ে গিয়েছে, আর ব্যবহারের যোগ্য নয়। ওটার তুলো পিঁজে নতুন খোলে

চড়ালে দিব্যি নতুন লেপ হয়ে যাবে। কিন্তু মা কিছুতেই রাজী হন না। বলেন, 'না, ওটাকে বদলে দিয়ে কাজ নেই। এই লেপ যোগীন দিয়েছিল, দেখলেই যোগীনকে মনে পড়ে।'

বিয়ে করেছিল যোগীন। তার অন্তিম সময়ে তার স্ত্রীকে মা নিয়ে এলেন তার পাশটিতে। যোগীন কিছুতে নেবে না তার সেবা, মা তা হতে দিলেন না। মায়ের আদেশে স্ত্রীর সেবা নিতে হল যোগীনকে। মা বললেন, 'যোগীন, একে দু-একটি কথা বলো। একটু উপদেশ দাও।'

'আমি ওসব পারবো না, সে সব আপনি বুঝুন।' যোগীন মুখ ফিরিয়ে নিল।

যোগীন যখন দেহত্যাগ করল, তখন নরেন্দ্রনাথ বললে, 'কড়ি খসল। এবারে ধীরে-ধীরে বর্গাও সব খসে পড়বে।' আর মা বললেন, 'বাড়ির এক-খানা ইট খসল, এবারে সব যাবে।'

... দশ ...

'কে যায়?' আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে জনহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হুমকে উঠল বাগদি-ডাকাত।

'তোমার মেয়ে গো—' উচ্চারিত হল বাণী নির্মলমুক্তি। বন্ধনমোচনী বিঘোষণা।

যা মেয়ে তাই মা। যা মা তাই মেয়ে। মা পার্বতী, মেয়ে গৌরী।

ঠাকুরের সেই যে মাতৃমন্ত্র তারই উজ্জ্বলন্ত বিগ্রহ এই সারদা। মন্ত্রের জীবন্ত রূপান্তর।

আমার মেয়ে? থমকে গেল বাগদি-ডাকাত। এই নিশ্বাসরেখাহীন পরিত্যক্ত মাঠে পথহারা আমার জননী? সাপের মাথায় ধুলো পড়ল। বন্ধ্যা মাটিতে জেগে উঠল মমতার শ্যামলতা। এক পা এক পা করে এগুতে লাগল ডাকাত। সত্যিই তো, চেনা-চেনা লাগছে। ওই কোমলকুমার মুখ-খানি, ক্লান্তকায়ের কৃশিমা। কোন জন্মের মেয়ে কে জানে, ইহ জন্মের মা।

কত বার এর মধ্যে যাওয়া-আসা করেছে সারদা। একবার তো শ্যামা-সুন্দরীকে নিয়ে গিয়েছিল। হৃদয় যা ব্যবহার করলে, অভাবনীয়। নিজের বাড়ি শিওড়, তাই শিওড়ের মেয়ে শ্যামাসুন্দরীকে মোটে আমোলই দিলে

না। বললে, 'এখানে কি? এখানে কি করতে এসেছ? এখানে কিছু হবে না।' বলে প্রায় তাড়িয়ে দিল। শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'চল দেশে ফিরে যাই। এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?' যার কাছে রাখবার কথা তিনি হৃদয়ের ভয়ে হাঁ-না কিছুই বললেন না। রামলাল পারের নৌকো এনে দিলে। মাকে নিয়ে সারদা ফিরে এল।

উপেক্ষিত, প্রায় অপমানিত হয়ে ফিরে এল। হৃদয় যেন ভেবেছিল তার কালীবাড়ির বরাদ্দে এরা ভাগ বসাতে এসেছে! কি লজ্জা! অন্য কোনো মেয়ে হলে, এই অবস্থায় এ-ই হয়তো সংকল্প করত, আর কোনো দিন যাব না দক্ষিণেশ্বর। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হলে, অন্য কোনো মেয়ের বেলায়, লাগত অনেক সাধ্যসাধনা। ওগো, চলো, পায়ে পড়ি, ঘাট হয়েছে, আর কোনোদিন হবে না এমন অনাদর—লাগত অনেক স্তবস্তুতি। কিন্তু সারদা অনন্যা। সে মূর্তিমতী প্রস্তুতি, মূর্তিমতী শরণাগতি। ভবতারিণীর দিকে মুখ করে সে শুধু বললে, 'মা গো, এবার স্থান দিলে না। কিন্তু আর যদি কোনোদিন আনাও তো আসব।'

আসব না নয়, যদি আনাও তো আসব। এই তো নিজেকে ঢেলে দেওয়া। এই তো ডাক শোনবার জন্যে উৎকর্ণ থাকা। এই তো যোগ-তাৎপর্য।

তারপর এল সেই করুণ চিঠি। ঠিক চিঠি নয়, কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে খবর পাঠালেন ঠাকুর। হৃদয় তখন চলে গেছে দক্ষিণেশ্বর থেকে, আর নতুন পূজারী হয়ে রামলাল নিজেকে নিয়েই মাতোয়ারা। তখন বলে পাঠালেন লক্ষ্মণকে দিয়ে : 'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে। রামলাল মা-কালীর পুজুরী হয়ে বামুনের দলে মিশেছে। এখন আর আমাকে তত খোঁজখবর করে না। তুমি অবিশ্যি আসবে। ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।'

একমুহূর্তও দেরি করল না সারদা। পালকি-ডুলিও দ্রুত নয়, যদি পারত পাখি হয়ে উড়ে যেত।

এত যাকে প্রয়োজন তাকে আবার সেবার ফিরিয়ে দিলেন নির্বিচারে। সেবার রেললাইনের উপর পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে ঠাকুরের, সারদা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। হিসেব করে দেখলেন সারদার রওনা হবার অল্প পরেই এই দুর্ঘটনা। আরো হিসেব করে দেখলেন, যে সময়ে সারদা যাত্রা করেছিল সেটা বিষ্যুৎবারের বারবেলা। তখন বললেন অনুযোগ করে,

'তুমি বিষ্যুৎবারের বারবেলায় রওনা হয়ে এসেছ বলেই আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাত্রা বদলে এস।'

সারদা তখুনি চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত। ঠাকুরের বোধহয় মায়া হল একটু। বললেন, 'আচ্ছা আজ থাকো, কাল যেও।'

পরদিনই সারদা ফিরে চলল। এক রাত্রি থাকবার পর ফিরে চলল যাত্রা বদলে আসতে।

কিন্তু সেবারের যাত্রা দুঃসাহসিক। সেটা বোধহয় তৃতীয়বারের যাত্রা।

ভূষণ মণ্ডলের মা গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে। সঙ্গে আরো কজন সহযাত্রী। তা ছাড়া লক্ষ্মী আর শিবরাম। সারদা বললে, আমিও যাব।

যাওয়া পায়ে হেঁটে। ট্রেন-স্টিমারের বাষ্প নেই কোথাও। পদব্রজেই ব্রজধাম। ভ্রমণ মানে মন্দির-প্রদক্ষিণ। গমন মানে তীর্থগমন।

কামারপুকুর থেকে আরামবাগ আট মাইল। তারপরেই তেলো-ভেলোর মাঠ। সেই মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বর। সেই মাঠ এক নিশ্বাসের পথ নয়, প্রায় দশ মাইল। আগে ঐ মাঠ তো পেরোও তবে তারকেশ্বরের নাম কোরো।

কেন, সেই মাঠে কী? সেই মাঠে ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাতের বাসা। ঘাপটি মেরে বসে আছে অন্ধকারে। দরাজ হাতে লুট-তরাজ করতে। হেসে-হেসে মাথা কাটতে। কখনো আগে হত্যা, পরে লুট।

আরো আছে। মাইল দুয়েক মাঠ ভেঙেই ডাকাতেকালীর থান। চণ্ড-মুণ্ডবিখণ্ডিণী বৈরিমর্দিণী রণরামা। বলতেই বলে, তেলোভেলোর ডাকাতেকালী। দেখতে ঘোরদর্শনা, ভয়ালকরালা। দেখতে কি, শুনতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

যাত্রীদের সবায়ের চেষ্টা সন্ধ্যা লাগবার আগেই যাতে পেরোতে পারে তেলোভেলো। সেই উদ্দেশে পা চালাচ্ছে প্রাণপণে। কিন্তু ওদের সঙ্গে পা মিলিয়ে সমান তালে চলতে পারছে না সারদা। পিছিয়ে পড়ছে। বারে-বারেই পিছিয়ে পড়ছে। ক্লান্তিতে পা আর চলতে চাইছে না।

পুরোবর্তীরা অভিযোগ করছে : তাড়াতাড়ি পা চালাও। এখনো অনেকখানি পথ। আঁধার নামবার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে মাঠ ছেড়ে।

থামছে সারদার জন্যে। সারদা এসে সঙ্গ ধরছে। আবার কখন পিছিয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে। 'তোমার একার জন্যে সকলে আমরা মারা পড়ব ডাকাতের হাতে?' ধমকে উঠল অগ্রগামীর দল।

তা কি করব, শরীরে দিচ্ছে না, পারছি না হাঁটতে, এমন কথা বলল না সারদা। কিংবা, যে করেই হোক, কোলে করে হোক কাঁধে করে হোক আমাকে নিয়ে চলো তোমাদের সঙ্গে—এমন কথাও না। ওকি, আমাকে একা ডাকাতের মুখে ফেলে তোমরা কোথায় পালাচ্ছ, এমন কথা বলেও ডুকরে কেঁদে উঠল না। সারদা বিবেচনা করে দেখল, সত্যিই তো, তার জন্যে কেন আর সকলে বিপন্ন হবে, বিড়ম্বিত হবে। তার নিজের ক্লান্তি কেন অন্যের কণ্টক হবে, তার নিজের অক্ষমতা কেন হবে অন্যের প্রতিবন্ধক! সে নিজে হাঁটতে পারছে না তার ফলাফল সে নিজে বহন করবে, কেন সে বেড়ী হয়ে থাকবে পরের পা জড়িয়ে? তাই সে বললে, স্পষ্ট স্বচ্ছকণ্ঠে : 'তোমরা যাও। পারি তো আমি যাচ্ছি তোমাদের পিছনে। যদি পারো, তারকেশ্বরের চটিতে আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

আশ্চর্য, সঙ্গীরা সারদাকে ত্যাগ করে চলে গেল স্বচ্ছন্দে। যেতে পারল? জনপরিশূন্য মাঠ, আতঙ্কভরা নিস্তব্ধতা, করালী সন্ধ্যা আসছে ঘনতর হয়ে, একটি একাকিনী তরুণীকে ফেলে চলে যেতে পারল? সারদাও কাঁদল না, কাটল না, নিজের সমস্ত ভার নিজেই তুলে নিল দুহাতে। কিসের তার দুঃসাহস?

অনুক্ত প্রশ্নটি এইখানে, কিসের তার দুঃসাহস? কেন সে ভেঙে পড়ল না? কেন সে সঙ্গীদের হাত টেনে ধরে আটক করল না? কিসের ভরসায় সে তারকেশ্বরের চটির কথা শোনাল?

সারদা জানে, কী মন্ত্র সে ধরে, কী অমোঘ মন্ত্র। এই মন্ত্রে পাথর ফেটে দুধ বেরোয়, বন্ধ্যা মৃত্তিকায় ফুল ফোটে। এই মন্ত্র মাতৃমন্ত্র। এই মন্ত্র—আমি তোমার মেয়ে, আমি তোমার মা।

ঠিক মত উচ্চারণ করা চাই। মেশানো চাই ঠিক মত আন্তরিকতার সুর, সরলতার টান। উদ্যত সাপ ফণা নোয়াবে। উদ্ধত ডাকাত মাথা নোয়াবে।

'কে যায়?' হুমকে উঠল বাগদি-ডাকাত।

'তোমার মেয়ে গো—' কোমলকরুণ স্বরে উত্তর দিল সারদা।

আমার মেয়ে! সমস্ত মাঠ ও আকাশের শূন্যতা একটি অপরূপ কান্নায় ভরে গেল। আমি তোমার মেয়ে, আমি তোমার মা—এই প্রথম কান্না, পরম কান্না!

'ঢুলি ভাই, বাজনা থামাও, আমি একটু মায়ের কাঁদন শুনি—'।

বিয়ের পর কন্যা চলেছে পতিবাসে। বাজনা বাজছে। কিন্তু সমস্ত বাজনার অন্তরালে বাজছে তার মায়ের কান্না। তাই কন্যা বলছে ঢুলিকে, 'ঢুলি ভাই, বাজনা থামাও, আমাকে আমার মায়ের কান্নাটি শুনতে দাও।'

তেমনি সংসার বাজিয়ে চলেছে তার নানাযন্ত্রের বাদ্যধ্বনি। বলছি, সংসার, তোমার বাজনাটা একটু থামাও। বিশ্বজননীর কান্নাটি একটু শুনি কান পেতে।

স্তব্ধ মাঠে বাগদি-ডাকাত শুনল বুঝি সেই জননীর কান্না।

লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল। করাল-ভয়াল দুর্দান্ত চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে লম্বা লাঠি। কণ্ঠে সিংহনাদ।

একটুও ভয় পেল না সারদা। বললে, 'যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বর তোমার জামাইয়ের কাছে। আমার সঙ্গীরা আমায় ফেলে চলে গিয়েছে আগে-আগে। তুমি যদি এখন আমাকে পৌঁছে দিয়ে এস—'

'কোথায় জামাই? কি করে?'

'দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন—'

পতিগৃহযাত্রিনী মেয়ের গলা আরো একজন শুনতে পেল। সে বাগদি-ডাকাতের বউ। সেও এল এগিয়ে। পথহারা মেয়েকে পাখা দিয়ে ঢেকে রাখতে।

'আমি তোমার মেয়ে গো—সারদা।' ডাকাত-বউয়ের হাত দুটো চেপে ধরল। বললে, 'আর আমার ভয় কি। আমার বাবা-মাকে পেয়েছি, বিপদ-আপদ কেটে গিয়েছে—'

যে রক্ষক সে ভক্ষক হয় এ হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু যে ভক্ষক সে রক্ষক হয় এই প্রথম দেখা গেল!

গাঁয়ের এক ছোট্ট দোকানে নিয়ে গেল সারদাকে। মুড়িমুড়কি কিনে আনল, তাই খাওয়াল রাতের মত। বাগদি-বউ নিজের হাতে পেতে দিল বিছানা। ছোট মেয়েকে যেমন ঘুম পাড়ায় তেমনি ঘুম পাড়াল সস্নেহে। লাঠি হাতে দুয়ারে জেগে রইল বাগদি-ডাকাত।

যে লুণ্ঠন করবে সেই দাঁড়াল প্রহরী হয়ে। একটি মাত্র মন্ত্রে এই অসাধ্যসাধন। আরোগ্যসাধন।

সকালবেলা উঠে সারদাকে নিয়ে চলল তারকেশ্বর। পথে কড়াই-শুঁটির খেত। কড়াইশুঁটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে বালিকার মত খেতে লাগল সারদা।

তারকেশ্বরে পৌঁছে ডাকাত-বউ বায়না ধরল, 'কাল সারা রাত কিছু

খায়নি আমার মেয়ে। যাও, বাবার পুজো দিয়ে চট করে বাজার করে এস। মাকে একটু খাওয়াই ভালো করে।

পুজো হল, বাজার হল, মেয়ের জন্যে রাঁধতে বসল বাগদি-বউ। মেয়ের টানে সেও এই দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে। নিজের হাতে রেঁধে দিচ্ছে স্নেহব্যঞ্জন।

মেয়ের টানে না মন্ত্রের টানে!

সংগীদের সংগে মিলিয়ে দিল সারদাকে। তারা বোধহয় ভাবতেও পারেনি এমন সুস্থ-তৃপ্ত অবস্থায় তাকে দেখতে পাবে। বলিস কি, বেঁচে আছিস? কে এরা?

'মা-বাবা। মাঠের অন্ধকারে এঁরা যদি কাল না এসে পড়তেন কি যে হত ভাবতেও পারি না।'

বদ্যিবাটির দিকে চলল এবার যাত্রীদল। বাগদি-ডাকাত আর তার বউ কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে। সারদাও ভেঙে পড়ল কান্নায়। তরুলতাও কাঁদতে লাগল নিঃশব্দে। বিদায়ের আকাশ তাকিয়ে রইল অশ্রুমুখ হয়ে।

'যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী সংগে না থাকত তোমাকে বাবার কাছে পেঁছে দিয়ে আসতুম।' বললে বাগদি-ডাকাত।

আর বাগদি-মা খেত থেকে কড়াইশুঁটি ছিঁড়তে লাগল। ছিঁড়ে বেঁধে দিলে সারদার আঁচলে। বললে, 'মা সারু, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি তখন খাস এই কড়াইশুঁটি।'

সারদারা বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে চলে গেল। বাগদি আর বাগদিনী তাকিয়ে রইল তার যাওয়ার দিকে। তার অপস্রিয়মান অঞ্চলের শেষ প্রান্তটির দিকে।

বাগদিরা গেল ডাইনের রাস্তা দিয়ে। যায়-যায় আর ফিরে-ফিরে তাকায়। তাকায় আর কাঁদে।

ঠাকুর বলেন, 'ডাকাতরূপী নারায়ণ।'

তার ডাকাতি দেখ, দেখবে না তার পিতৃত্ব? তার নিষ্ঠুরতা দেখ, দেখবে না তার মাতৃভক্তি?

পথ চিনে-চিনে একদিন তারা এল দক্ষিণেশ্বরে। সংগে মোয়া আর নাড়ু। এনেছে মেয়ে-জামায়ের জন্যে।

'আমাকে তোমরা এত স্নেহ করো কেন গা?' জিগগেস করলে সারদা।

'তুমি তো সাধারণ মেয়ে নও। তোমাকে যে আমরা কালীরূপে দেখলুম!'

'সে কি গো?' হাসল সারদা।

'না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম। আমরা পাপী বলে তুমি রূপ গোপন করছ!'

'কি জানি বাপু, আমি তো কিছু জানিনি।'

যে দেখবার সে দেখে। যে শোনবার সে শোনে।

আমি যে ডাকাতেরও মা।

একটি পতিতা এসেছে মা'র কাছে। মা তাকে টেনে আনলেন কাছে, মার্জনামধুর সান্ত্বনা দিলেন। এই নিয়ে কথা উঠল—ওরা কেন এখানে আসে? মা বললেন, 'ওরা আমার কাছে না আসবে তো কার কাছে আসবে? আমি কাউকে বাদ দিতে পারব না। ঠাকুর বলেছেন, এবার আমি কাউকে ছাড়ছি না। ঠাকুর কি কেবল রসগোল্লা খেতে এসেছেন?'

একটি কুলবধূ বিপথে পা দিয়েছে। হৃতসর্বস্ব হয়ে এসেছে মা'র কাছে। অনুতাপের দাহ উঠেছে বুকের মধ্যে। চোখে জল অবিশ্যি অবিরল কিন্তু সে-দাহের নির্বাণ হচ্ছে না।

ঠাকুরঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এটুকুও মনে হয় স্পর্ধার মত।

কিন্তু মা যে পরমপাবনী ক্ষমামূর্তি। সমস্ত ক্লেশ-ক্লেদ মুছে দেবেন বলেই তো তাঁর বসনাঞ্চল। তিনি ডাকলেন : 'এসো মা, ঘরে এসো। পাপ যখন বুঝতে পেরেছ তখন আর পাপ নেই। এসো, তোমাকে মন্ত্র দেব। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও, ভয় কি।'

করুণাদ্রবা জাহ্নবীর স্পর্শে শুচি হল মৃত্তিকা।

থিয়েটারের অভিনেত্রীরা এসেছে। মা সবাইকে আদর করে প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন। বিল্বমঙ্গলের পাগলীর গান ধরেছে তিনকড়ি। গান শুনে মা সমাধিস্থা।

বাগবাজারের পদ্মবিনোদ পাঁড় মাতাল। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়ার পার্ট করে। মাঝে-মাঝে আসে বলরাম-মন্দিরে, ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্লায়'। শরৎ-মহারাজকে দোস্ত ডাকে।

দোতলায় মা শুয়েছেন, নিচে শরৎ-মহারাজ, আশুতোষ মিত্র, আরো কেউ-কেউ।

'দোস্ত, দোস্ত!' দুপুর রাতে ডাকাডাকি শুরু হল।

শরৎ-মহারাজ চুপি-চুপি সকলকে বলে দিলেন, পদ্মবিনোদ এসেছে।

খবরদার, কেউ দরজা খুলে দিসনি। মাতাল হয়ে এসেছে, এমন চেঁচামেচি শুরু করবে মা-ঠাকরুন জেগে উঠবেন।

সবাই চুপ করে রইল। বন্ধ দরজায় টোকা মারল বাইরে থেকে, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

'আমি ব্যাটা এত রাত্তিরে এলাম, আর দোস্ত, তুমি একবারটিও উঠলে না, জানলার পাখি তুলে দেখলেও না একটিবার।' বলে চলে গেল পদ্ম-বিনোদ।

পরের রাত্রে আবার এসেছে। সেই মত্ত-মুক্ত অবস্থা। এবার আর দোস্ত নয়। সোজা মাতৃসম্ভাষণ। 'মা, ছেলে এয়েছে তোমার, ওঠো মা।' বলেই সুকণ্ঠে গান ধরল :

> 'ওঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটির-দ্বার,
> আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।
> সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে,
> আমি ডাকিতেছি মা-মা বলে, নিদ্রা কি ভাঙে না তোমার?'

উপরের ঘরের জানলার একটা পাখি খুলে গেল।

'এই রে, মাকে তুলেছে।' নিচে শরৎ-মহারাজ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

শুধু একটি খড়খড়ি নয় খুলে গিয়েছে সম্পূর্ণ জানলা।

'উঠেছ মা?' রাস্তা থেকে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বলে উঠল পদ্মবিনোদ : 'সন্তানের ডাক কানে গেছে? উঠেছ তো পেন্নাম নাও।' বলে বলা-কওয়া নেই রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

উঠে আবার চলল আপন মনে। গান ধরল :

> 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
> মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি,
> আর যেন কেউ নাহি দেখে।
> দোস্ত যেন নাহি দেখে॥'

'ছেলেটি কে?' পর দিন উঠে জিগগেস করলেন মা।

সব বৃত্তান্ত শুনলেন একে-একে। বললেন, 'দেখেছ, জ্ঞানটুকু টনটনে।'

'ছাই টনটনে!' বলে উঠল ভক্তের দল : 'আপনার ঘুমের যে ব্যাঘাত করে।'

'তা করুক। ওর ডাকে যে থাকতে পারি না। দেখা দিই।'

একটি ভক্ত-মেয়ে মাকে স্বপ্ন দেখেছে। যেন তাঁকে চণ্ডীজ্ঞানে পুজো করছে ও পুজো অন্তে লালপেড়ে শাড়ি দিচ্ছে। পর দিন একখানা লাল-পেড়ে শাড়ি নিয়ে এসেছে সে মা'র কাছে। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারছে না। দিদি, তুমি বলো। আরেকজন ভক্ত-মেয়েকে দিয়ে বলাল অনেক করে। মা বললেন, 'জগদম্বাই স্বপ্ন দিয়েছেন, কি বলো মা? তা উঠি, দাও শাড়িখানা—পরতে তো হবে!'

চওড়া লালপেড়ে শাড়িখানি পরলেন। দুর্গাপ্রতিমা যেন ঝলমল করে উঠল। ভক্ত-মেয়েদের চোখে জল এল। স্বপ্ন-দেখা মেয়েটি বললে, 'একটু সিঁদুর দিলে বেশ হত।'

তাতে মায়ের আপত্তি নেই। বরং বললেন সহাস্যে, 'তা দেয় তো সিঁদুর!'

সিঁদুর আনা হয়নি। তাতে কি, মা তাঁর চুলের পিছনে রাখেন একটু সিঁদুরের চিহ্ন। মা চিরসীমন্তিনী। শিবসীমন্তিনী।

মঠে দুর্গাপুজা হচ্ছে। দেবীর বোধন। সন্ধেবেলা মা আসবেন। বাবুরাম ছুটোছুটি করছে, বলছে, কি করে মা আসবেন? এখনো কলাগাছ আর মঙ্গলঘট বসানো হয়নি। বোধন সাঙ্গ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মা এসে হাজির। চারদিক দেখে-শুনে মা বলছেন হেসে-হেসে, 'সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা-দুর্গাঠাকরুন এলুম।'

... এগারো ...

সেই দুর্গাপ্রতিমা, সেই জীব-জগতের মা, রয়েছেন বন্দীশালায়। সঙ্কীর্ণ নবতের ঘরে। দরমা দিয়ে ঘেরা দুর্ভেদ্য দুর্গে। যিনি জগতের বন্দিতা তিনিই কারাগারে বন্দিনী।

তিনি জানেন তিনি কে। তবু নিয়েছেন এই সাধনব্রত। সন্তোষের সাধন। তিতিক্ষার তপস্যা।

আর যিনি পাঠিয়েছেন এই বনবাসে তাঁর প্রতিই সুগভীর ভালোবাসা।

যাঁকে বলা যেতে পারত নির্মম, তাঁকেই কিনা দয়াময় ও প্রেমময় বলে মনে-মনে মাল্যদান!

হৃদয় রঙ্গ করে বলে, 'তুমি মামাকে বাবা বলে ডাকো না!'

এতটুকু আড়ষ্ট হল না সারদা। প্রাণভরা আবেগ নিয়ে বললে, 'তিনি বাবা কি বলছ, তিনি পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন—সব তিনি।'

সারদার জিহ্বায় একটি মন্ত্র লিখে দিয়েছেন ঠাকুর। কুলকুণ্ডলিনী ষটচক্র এঁকে দিয়েছেন। নবতের পশ্চিম বারান্দায় বসে দক্ষিণ দিকে মুখ করে, ঠাকুরের দিকে মুখ করে জপ করে সারদা। আর চাঁদের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করে, তোমার জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।

আরো একটু বেশি বলে। বলে, 'তোমাতেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমি যেন নি-দাগ থাকি।'

ঠাকুর বলে দিয়েছেন, চাঁদা মামা সকলের মামা, ঈশ্বর সকলের ঈশ্বর, সকলের আপনার।

দূরেই থাকুন দূরেই রাখুন ঠাকুরও আমার আপনার।

সাহেব-বাড়ি থেকে মা'র ফোটো তৈরি হয়ে এসেছে। কেমন হয়েছে দেখুন তো? মা'র হাতে দেওয়া হল দেখতে। প্রথমেই মা মাথায় ঠেকালেন। ছবিখানি কার মা? কেন—আমার! সবাই হেসে উঠল। হাসছ কেন? মা তাকালেন অবাক হয়ে। নিজের ছবি নিজেই প্রণাম করলেন? হাসতে-হাসতে মা বললেন, কেন এর মধ্যেও তো ঠাকুর আছেন।

তাই সেদিন বললেন ব্রহ্মবাদিনীর ভাষায়, 'আমার মাঝেও যিনি, তোমার মাঝেও তিনি। দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি।'

বিশ্বহিতধ্যানে মগ্ন মাতৃমূর্তিকে একবার দেখ! হাওয়ায় আঁচল চুল উড়ে যাচ্ছে তবু লজ্জারূপিণীর দেহবুদ্ধির লেশ নেই। সে মহিমময়ী মূর্তি একদিন দেখতে পেল যোগীন। ঠাকুরের খোঁজে যাচ্ছে পঞ্চবটীর দিকে, দেখল সমাধিস্থা হয়ে বসে আছেন মা, তন্ময়তার কবিতা। সর্বভূত-মহেশ্বরী মহতী বিশ্বকান্তি।

যোগেন-মাকে বললে একদিন সারদা, 'ওঁকে একটু বলতে পারো?'

'কি?'

'যাতে আমার একটু ভাব-টাব হয়! লোকজনের জন্যে যেতে পারি না ওঁর কাছে। তুমি তো যাও, বলবে?'

এ আর বেশি কথা কি। সকালবেলা, ঠাকুর একা বসে আছেন

তক্তপোশে, যোগীন্দ্রমোহিনী প্রণাম করে কাছে এসে দাঁড়ালো।

কি খবর, স্মিতমুখে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

সাহস পেয়ে বললে এবার সারদার কথা। সে ভাব চায়।

ঠাকুর গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর প্রসাদস্নিগ্ধ মুখে ফুটে উঠল কঠিন ঔদাসীন্য।

আর কথা বলবার সাহস পেল না যোগেন-মা। তাড়াতাড়ি আরেকটা প্রণাম কোনোমতে সেরে নিয়ে পালিয়ে গেল নিঃশব্দে।

নবতে এসে দেখে—দরজা বন্ধ। সারদা পুজায় বসেছে। দরজা একটু ফাঁক করল যোগেন-মা। এ কি কান্ড! সারদা হাসছে আপন মনে। পরমুহূর্তেই কাঁদছে অঝোরে। অবিচ্ছিন্ন ধারা নেমেছে চোখ বেয়ে! শেষে আর হাসি-কান্না নেই—গাঢ় ভাব-সমাধি।

দরজা আস্তে বন্ধ করে দিল যোগেন-মা। বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

পুজো শেষ হতেই যোগেন-মা ঘরে ঢুকল। বললে, 'তবে মা তোমার নাকি ভাব হয় না?'

সারদা লজ্জা পেল। হেসে ঢাকতে চাইল সে লজ্জা। সে ধরা-পড়ার লাবণ্য।

রাত্রে মাঝে-মাঝে সারদার কাছে শোয় যোগেন-মা। একদিন শোনে কে বাঁশি বাজাচ্ছে। সারদা উঠে বসেছে বিছানায়। বাঁশির স্বরে তন্ময় হয়ে গিয়েছে। যেন এ রাজ্যে নেই, চলে গিয়েছে দেশান্তরে। সেখানে কি দৃশ্য দেখছে কে জানে, থেকে-থেকে হেসে উঠছে।

সসঙ্কোচে সরে বসল যোগেন-মা। ভাবল, সংসারী মানুষ, এ সময় ছোঁব না মাকে।

বলরাম বোসের বাড়ির ছাদে ধ্যান করতে বসে মা সমাধিস্থ হলেন। দেহভূমিতে নেমে এসে বলছেন সরলা বালিকার মত : 'দেখলুম কোথায় যেন চলে গেছি। সেখানে আমার যেন সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন। কারা যেন আমায় আদর-যত্ন করে ডেকে নিলে, বসালে ঠাকুরের পাশে। সে যে কী আনন্দ বলতে পারিনে। একটু হুঁশ হতে দেখি, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি ওই বিশ্রী শরীরটার মধ্যে কি করে ঢুকবো—'

'ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই?' কাতর স্বরে বলতে লাগলেন মা। বেলুড়ে, নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। গোলাপ-মা যোগেন-মাকে নিয়ে

ধ্যানে বসেছেন সেদিন, কিন্তু ওদের দুজনের ধ্যান কখন ভেঙে গেল, অথচ মা সমাধিস্থ। যখন ধ্যান ভাঙল তখন ওই অসহায় আক্ষেপ—হাত পা খুঁজে পাচ্ছেন না মাটিতে। খোলটা না পেলে চেতনাটা রাখেন কোথায়? এই যে পা, এই যে হাত—হাত-পা টিপে-টিপে দেখাতে লাগল দুজনে। তখন আস্তে-আস্তে জাগল দেহবুদ্ধি। ফেললেন মর্ত-নিশ্বাস।

একেই বোধহয় 'নির্বিকল্প' বলে। কিন্তু কী তপস্যার বলে মা পেলেন এই উচ্চতম উপলব্ধির আস্বাদ? তিনি কি ঠাকুরের মত তন্ত্র করেছেন, না কি যোগ-প্রাণায়াম করেছেন, না কি পঞ্চভাবের বৈষ্ণব সেজেছেন? কোনো হৈ-চৈ করেননি, খড়্গ পেড়ে চাননি গলা কাটতে—নির্বাক প্রতিমার মত চির-নেপথ্যে বাস করেছেন, একটি মহান আত্ম-বিলুপ্তির মধ্যে। এই আত্মবিলুপ্তিই তাঁর তপস্যা। বিরাজ করেছেন একটি অম্লান সন্তোষে। এই সন্তোষই তাঁর যোগ। উৎসুক হয়ে রয়েছেন একটি সুতীক্ষ্ম প্রতীক্ষায়। এই প্রতীক্ষাই তাঁর একান্তভক্তি।

মা স্বতঃসিদ্ধা। তাঁর জীবনে যে-দিন-রাত্রি, সে শরণাগতির দিন আর অভিমুখিতার রাত্রি।

করবার মধ্যে করেন শুধু জপ আর ধ্যান। জপ করবার জন্যে দুটি মালা, একটি তুলসীর আরেকটি রুদ্রাক্ষের। তাও অষ্টপ্রহর এই মালা নিয়ে বসে থাকেন না। চারবার মোটে জপ করেন, ব্রাহ্মমুহূর্তে, পুজোর সময়, বিকেলে আর সন্ধেয়। বাকি সময় সংসারের খেজমত। গৃহস্থালীর টুকিটাকি। সেবা-চর্যা। ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী সাজেনি সারদা, সে সংসারের একটি সলজ্জা বধূ। গোপনবাসিনী সরলতা। শীতলবাহিনী শান্তি।

'নিজের-নিজের কাজকর্মে খাটো-পেটো, তা হলেই সব হবে। তাই কি সত্যি?' একটি মেয়ে জিগগেস করল মাকে।

'বা, কাজকর্ম করবে বৈ কি, কাজে মন ভালো থাকে। তবে জপধ্যান প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্তত সকাল-সন্ধে একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকোর হাল।' সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে বক্তব্যটি প্রাঞ্জল করলেন মা : 'সন্ধেবেলা একটু বসলে সমস্ত দিন ভালোমন্দ কি করলাম না করলাম তার বিচার আসে। গত দিনের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের দিনের মনের অবস্থার একটা তুলনা করা যায়।'

'আর ধ্যান?'

'জপ করতে-করতে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করবে। শুধু মুখটি নয়, পা থেকে সমস্ত অঙ্গ। কিন্তু,' মা এবার অন্তরঙ্গ হলেন : 'কিন্তু জপধ্যান করলেই কি সব হয়ে গেল? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কিছুই হবার নয়। শুধু পথ ছেড়ে দেবার জন্যেই প্রার্থনা, পথ ছেড়ে দেবার জনোই স্মরণ-মনন।'

'আর নিষ্কাম কর্ম?'

'ধ্যানের চেয়েও বড় সাধন। তাই তো নরেন আমার নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।'

মা'র যখন ধ্যান ভাঙে, বলে ওঠেন, খাব। যে কাছে থাকে কিছু খাবার আর জল এগিয়ে দেয়। ঠাকুর যেমন খেয়েছেন ভাবাবেশে মাও তেমনি ভাবে খান। পান দিলে তার সরু দিকটা খুঁটে ফেলে দিয়ে ঠাকুর মুখে পুরতেন। মা'রও সেই ধরন। ভাবভঙ্গি সব অবিকল একরকম। সমাধি-অবস্থায় গলার স্বরেও অদ্ভুত মিল।

'আমরা কি আলাদা?' হঠাৎ বলে ফেললেন মা। বলেই জিভ কাটলেন। বললেন অগোচরে, 'কি বলে ফেললুম!'

আমরা তা জানি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। কৃষ্ণ আর রাধা, শিব আর কালী, রাম আর সীতা, রামকৃষ্ণ আর সারদা।

রোগা শরীরে জপ করতে বসেছেন। এক ভক্ত প্রতিবাদ করে উঠল : 'তোমার তো সব হয়েই গেছে। তবে মিছিমিছি কেন শরীরকে কষ্ট দিচ্ছ?'

মা বললেন, 'বাবা, আমার ছেলেরা কে কোথায় কি করছে না করছে তাদের জন্যে দুটো করে রাখছি।'

সন্তান ভুলেছে, মা ভোলেনি।

রাতে কেউ উঠলেই মা সাড়া দেন : 'কে গো?' যত রাতেই উঠুক, মা জেগে ওঠেন। একজন অনুযোগ করল : 'রাতে আপনি ঘুমোন না কেন?'

'কি করে ঘুমোব বাবা। ছেলেগুলো সব এসে পড়েছে, নিজেরা কিছুই করতে পারে না, তাই তাদের কাজেই রাত যায়।'

ছেলেদের হয়ে সারা রাত জপ করেন মা। ছেলেদের পাপের ভার হালকা করে রাখেন।

এক ছেলে অভিযোগ করে পাঠিয়েছে, মন স্থির হয় না। শুনে মা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'রোজ পনেরো-বিশ হাজার করে জপ

করতে পারে, তা হলে হয়। আমি দেখেছি, নিশ্চয়ই হয়। আগে করুক, না হয়, তখন বলবে। তবে একটু মন দিয়ে করতে হয়। তা তো নয়, কেউ করবে না, কেবল বলবে, কেন হয় না?'

আরেক ছেলে এসে বসল মা'র কাছে। বললে, 'আর জপ-টপ করে কি হবে?'

'কেন?' মা মুখ তুললেন।

'অনেক করলুম, কিছু হল না। কাম-ক্রোধ আগেও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। মনের ময়লা একটুও কাটেনি।'

শান্তবচনে মা প্রবোধ দিলেন। 'বাবা, জপ করতে-করতে কাটবে। না করলে চলবে কেন? পাগলামি কোরো না। যখনি সময় পাবে তখনি জপ করবে।'

'আমার দ্বারা আর হবে না। হয় আমার মন তন্ময় করে দিন, যেন একটুও কুচিন্তা না আসে, নয় আপনার মন্ত্র আপনি ফিরিয়ে নিন। বৃথা আপনাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে নেই—'

'সে কি কথা?'

'শুনেছি শিষ্য মন্ত্র জপ না করলে গুরুকেই ভুগতে হয়।'

মা কিছুক্ষণ ভাবলেন চুপ করে। পরে বললেন, 'আচ্ছা তোমাকে আর জপ করতে হবে না।'

মর্ম ঠিক বুঝতে পারল না ভক্ত। ভাবল মা বুঝি সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেললেন নিজের হাতে। কেঁদে উঠল, 'আমার সব কেড়ে নিলেন মা? তবে আমি কি এবার রসাতলে গেলুম?'

মা অভয় হাসি হাসলেন। বললেন, 'বিধির সাধ্য নেই আমার ছেলেকে রসাতলে ফেলে।'

'তবে আমি এখন কি করব?'

'আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো।'

মা বকলমা নিলেন।

এক স্বামীকে দীক্ষা দিলেন মা। দীক্ষান্তে বললেন নিচে নেমে যেতে। নিচে তার স্ত্রী বসে। সে বললে, সে কি! আমার দীক্ষা হবে না?

মা'র কাছে গিয়ে আবেদন জানাল। মা বললেন, 'বেলুড় মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছে তাদের কাছে মন্ত্র নাও গে।'

মহিলাটি শুনবে না সে-কথা। 'তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় পাব এই

ভেবে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে। কোনোদিকে তাকাইনি, ধারকর্জ করে এসেছি। এখন তুমি যদি "না" বলো তবে কোন মুখে কোন প্রাণে আমি বাড়ি ফিরব?'

'আমি পারবোনি বাপু।' মা দৃঢ় হলেন। বসলেন গিয়ে পুজোর আসনে।

মহিলাটি মাটিতে পড়ে গেল। গান জানত, গান ধরল প্রাণের আবেগে। পাষাণ-গলানো গান। 'যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে? দয়াহীনা না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে?'

মা'র আসন টলল। বিভোর হয়ে গান শুনতে লাগলেন। বললেন, 'আহা, আরেকটি গান গা মা, আরেকটি গান গা। তুই আমার পাগলী মেয়ে। তোর গান বড় মিষ্টি।'

মহিলাটি আবার গান ধরল।

'উঠে বোস মা। তোর গানে যে আমি পুজো ভুলে গেছি। এবার আদেশ কর্ মা, আমি বসি পুজো করতে। এই নে, প্রসাদী পান খা, তোর মুখখানি শুকিয়ে গেছে।' পান দিলেন মা। দীক্ষার দিন ঠিক করে দিলেন।

... বারো ...

একজন সন্ন্যাসীর স্ত্রী, আছেন বৈভবহীনার বেশে, ভালোমানুষটির মত মুখ বুজে, অশ্রুকণ্ঠী হয়ে—এই কি আমাদের মা? একটি পুণ্যশীলা দানশীলা দয়াময়ী নারী—ইষ্টে আবিষ্টতা—শুধু এইটুকু? কত পূত-কীর্তি মহাত্মার কত পুণ্যব্রতা সহধর্মিণী আছেন, জপ-ধ্যান করছেন, তীর্থ করছেন, সংসারের পাঁচজনের সেবা করছেন, তরকারি কুটছেন, রান্না করছেন, ঘর নিকোচ্ছেন, বাসন মাজছেন, কাপড় কাচছেন, পান সাজছেন—মা কি শুধু তাদেরই একজন? শুধু একটি গৃহবন্দিনী পুরাঙ্গনা?

মা তার চেয়ে একটু বেশি। মা আঠারো আনা। ষোলো আনার উপরে আরো দু আনা। 'কত রঙ্গ জানিস তুই, ষোলোর উপর আরো দুই।'

মা'র মাহাত্ম্য কোথায়? মা'র মাহাত্ম্য আত্মগোপনে, অহংনাশে। যে অবগুণ্ঠনটি মুখের উপর টেনে রেখেছেন সেই অবগুণ্ঠনে। তিনি জানেন

তিনি কে, কিন্তু আছেন ভিখারিনীর বেশে। সর্বৈশ্বর্যময়ী হয়ে সর্ব-বঞ্চিতা সেজেছেন। তিনি জানেন তিনি কার পূজা পেয়েছেন, কিন্তু একা-একা পূজার ভান্ডটি নিয়ে তিনি করবেন কি, সেই ভান্ড থেকে জনে-জনে বিতরণ করছেন ভালোবাসার শান্তি-জল!

ঐশ্বর্যের কি যন্ত্রণা! না দেখাতে পারলে আরো যন্ত্রণা। যে আঙুলে আঙটি আছে সে আঙুলই আস্ফালন করে। দাঁতে সোনা বাঁধানো থাকলে বারে-বারে হাসতে হয় দাঁত দেখিয়ে। আর যার কিনা রাজ্যজোড়া সম্পদ, তিনি আছেন বনবাসে। ক্ষিতীশমুকুটলক্ষ্মী হয়ে মুকুট বিসর্জন দিয়েছেন। তার জন্যে লোভ নেই ক্ষোভ নেই। কৃষ্ণপ্রীতি মানেই তো তৃষ্ণাত্যাগ। আছেন তাই মূর্তিমতী তুষ্টি হয়ে তৃপ্তি হয়ে, সর্বশ্রী-রূপধারিণী হয়ে।

এমন কি যে ভাবসমাধি হয় তাও জানতে দেন না।

'শক্তিরূপিণী কিনা, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত!' বলছেন প্রেমানন্দ : 'ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাইরে বেরিয়ে পড়ত। মা-ঠাকরুনের ভাবসমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাউকে জানতে দেন!'

কখনো কি জাঁক করে বলেন, আমি হেন, আমি তেন! কিম্বা আমি কত বড়লোকের স্ত্রী! মুখের উপর ঘোমটাটি টেনে রাখেন। যেমন মহামায়া টেনে রেখেছেন অন্তরাল।

ত্রিজগতে অন্ন দিয়ে বেড়াচ্ছেন কিন্তু শিবের জন্যে রান্না করছেন গাঁদালের ঝোল, তাতে ডুমুর আর কাঁচকলা।

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এসে ঠাকুরের জল খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। জল না বন্ধ হলে সারবে না অসুখ।

মহা ভাবনা ধরল ঠাকুরের। সবাইকে ডেকে এনে জিগগেস করতে লাগলেন, 'হ্যাঁ গা, জল না খেয়ে কি পারব? হ্যাঁ গা, জল না খেয়ে কি থাকা যায়?' সবাই আশ্বাস দিচ্ছে তবু ঠাকুরের শান্তি নেই। ডাকো সারদাকে। 'হ্যাঁ গা, পারব জল না খেয়ে?'

'পারবে বৈ কি।' অভয় দিল সারদা।

'বেদানা পর্যন্ত জল পুঁছে দিতে হবে। দেখ যদি পারো—'

'তা মা কালী যেমন করবেন, যথাসাধ্য তাঁর ইচ্ছায় হবে।' নিজে করব না বলে কালীর হাতে ছেড়ে দিল সারদা।

মন স্থির করে ওষুধ খেলেন শেষ পর্যন্ত। জল বন্ধ হল।

এখন ভরসা শুধু দুধ। আধসেরটাক বরাদ্দ, কিন্তু এত অল্প হলে চলবে কেন? গয়লা সেধে বেশি করে দুধ দিয়ে যায়। রোজ তিন চার সের, শেষে পাঁচ-ছ সের। বলে, 'মন্দিরে দিলে কালীর ভোগ বলে ব্যাটারা বাড়ি নিয়ে খাবে। পাঁচ ভূতে লুটে-পুটে খাবে। এখানে দিলে উনি খাবেন।'

জ্বাল দিয়ে-দিয়ে কমিয়ে এক সের দেড় সের করে দেয় সারদা।

ঠাকুর বললেন, 'কত দুধ?'

'কত আর! এক সের পাঁচ-পো হবে।' সারদা নির্লিপ্ত মুখে বললে।

'উঁহু। এ অনেক বেশি, এই যে পুরু সর দেখা যাচ্ছে।'

সেদিন যাহোক পার পেয়ে গেল সারদা। পাঁচ-ছ সের দুধ দিব্যি খেয়ে ফেললেন ঠাকুর।

আরেকদিন, সে দিন গোলাপ-মা কাছে বসে, জিগগেস করলেন গোলাপ-মাকে, 'হ্যাঁ গা, কত দুধ হবে বলো তো?'

গোলাপ-মা বলে দিল ঠিক-ঠিক।

'এ্যাঁ, এত দুধ!' চঞ্চল হয়ে উঠলেন ঠাকুর : 'তাই তো আমার পেটের অসুখ হয়। ডাকো, ডাকো—'

সারদা কাছে এল।

'কত দুধ?' প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

'কত আর! সামান্য—'

'তবে যে গোলাপ বলে, এত!'

'গোলাপ জানে না।' সারদা দৃঢ়স্বরে বললে, 'এখানকার মাপ গোলাপ জানবে কি! এখানকার ঘটিতে কত দুধ ধরে সে জানবে কি করে?' শান্ত করলে ঠাকুরকে।

তবু গোলাপ-মা টিপ্পনি কাটতে ছাড়ে না। সেদিন বলে দিলে, দু বাটি দুধ একত্র করা হয়েছে। এখানের এক বাটি, কালীঘরের এক বাটি।

এত? কী সর্বনাশ! ডাকো-ডাকো, জিগগেস করো।

সারদা কাছে আসতেই জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'বাটিতে কত ধরে? ক-ছটাক ক-পো?'

সারদা উদাসীনের মত বললে, 'ক-ছটাক ক-পো অত জানিনে। দুধ খাবে, তা ক-ছটাকের ঘটি ক-পো, অত কেন? অত হিসেবে দরকার কি!'

সেদিন কেমন মনে হল ঠাকুরের এত দুধ হজম করতে পারবেন না।

যেমনি ভাবলেন অমনি অসুখ হয়ে গেল। তখন গোলাপ-মা'র অনুতাপ। বললে, 'তা আমায় বলে দিতে হয়! আমি কি অত জানি? আমি ভাবলুম সত্যি কথা বলাই হয়তো ঠিক হবে।'

'খাওয়ার জন্যে মিথ্যে বললে দোষ নেই।' বললে সারদা। 'তাই দেখ না আমি ভুলিয়ে-টুলিয়ে খাওয়াই—'

'তা হলে দেখছি, মনেই সব।'

'নিশ্চয়। না বললে এমনি বেশ খেতেন, হজম করে ফেলতেন।'

খাইয়ে-টাইয়ে বেশ চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। মোটা হয়েছেন ঠাকুর। অসুখ সেরে গিয়েছে।

ভাত বেশি দেখলেই আঁৎকে ওঠেন। তাই টিপে-টিপে সরু করে দেয় সারদা। দু গ্রাস বেশি খান ঠাকুর এটুকুই তার অন্তরের ক্ষুধা। তিনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রোগজ্বালা না হয় এর বেশি আর তার কিছু চাইবার নেই।

তার 'সমর্থা রতি'। সে কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণগতজীবনা। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য-ময়ী।

এক-এক সময় তার সামনে এসে বলেন ঠাকুর, 'দেখ, তোমার হাতের রান্না খেয়ে কেমন আমার চেহারা ফিরেছে!'

সারদার চোখে তৃপ্তির অঞ্জন লাগে।

জয়রামবাটিতে বাঁড়ুজ্জেদের ভিটের সামনে ডোবায় কুচকুচে কালো কচু শাক হয়েছে। এক ভক্ত ছেলে তাই দেখে মনে-মনে ভাবলে কি বোকা এখানকার লোকগুলো, এমন কচু শাক, খেতে জানে না। দুহাতে টেনে-টেনে অনেক সে শাক তুলল, এক বোঝা! পিঠে করে বয়ে নিয়ে গেল সে মা'র কাছে। 'কোথা পেলে?' জিগগেস করলেন মা।

'বাঁড়ুজ্জেদের ডোবায়।'

'জলের শাগ? ও তো খুব কুটকুটে। বোকা ছেলে। জোলো শাগ যে কুটকুটে হয় জানোনি? এদেশের লোক কচু শাগ খেতে জানে না—তাই না?'

লজ্জায় মাথা হেঁট করল ছেলে। মাথা হেঁট করলে কি হবে, ছেলের পিঠ ফুলে ঢাক হয়েছে, দুহাতেরও সেই দশা। তখন মা তেল নিয়ে এসে মালিশ করতে বসলেন।

'ফোলা কুটকুটুনিকে ভয় করিনে মা,' বললে ছেলে, 'কিন্তু আপনাকে যে বিব্রত হতে হয়েছে এ দুঃখ আমার যাবে না।'

মালিশ শেষ করে মা বললেন, 'তেলটা আগে শুকুগ। এখুনি যেন নাইতে যেও না। জল লাগলে আবার কুটকুট করবে।'

নিজের দুহাতে তেল মেখে মা বঁটি পেতে শাক কুটতে বসলেন। ওমা, রান্না হবে নাকি এ শাক? তোমার এত সাধ হয়েছে খেতে, দেখ না খেয়ে। খাবার সময় অনেকটা শাক দিলেন ছেলেকে। অতি চমৎকার স্বাদ। একটুও কুটকুট করছে না। মা বললেন, 'তিনবার তেঁতুল দিয়ে সেদ্ধ করে জল ফেলে নিংড়েছি, চার বারের বার রেঁধেছি।'

যতদিন চন্দ্রমণি জীবিত ছিলেন ঠাকুর নবতে এসে খেয়েছেন। চন্দ্রমণি গত হলে ঠাকুর বললেন, আমি আমার ঘরে বসে খাব। তাই সই। সারদা থালায়-বাটিতে খাবার সাজিয়ে নিয়ে যায় ঠাকুরের ঘরে। সারা দিন-মানে এই তার ঠাকুরকে একটু দেখা। ঘোমটা টেনে কাছে এসে বসে। সারা দিনমানে এই তার ঠাকুরের পাশে একটু বসা। এটা-ওটা ঘরোয়া কথা কয়, ঠাকুরের মনকে হালকা কথায় ভুলিয়ে রাখে যাতে না ভাবের আবেশে সমাধি-ভূমিতে উঠে যান হঠাৎ। সারা দিনমানে এই তার ঠাকুরের সঙ্গে একটু কথা বলা।

ঠাকুরকে খাইয়ে নবতখানায় ফিরে এসে পান সাজে সারদা। পান সাজবার সময় গান গায় গুনগুনিয়ে। নীলকণ্ঠের সেই গানটি তার বড় প্রিয়। 'ও প্রেম রত্নধন রাখতে হয় অতি যতনে।'

'আহা নীলকণ্ঠের গান কি চমৎকার।' বললেন মা অতীতের কথা বলতে গিয়ে : 'ঠাকুর বড় ভালোবাসতেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন মাঝে-মাঝে তাঁর কাছে আসত নীলকণ্ঠ। গান গেয়ে শোনাত। কি আনন্দেই তখন ছিলাম! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।'

একদিন লক্ষ্মীর সঙ্গে গান গাইছে সারদা। মৃদু কণ্ঠের আরম্ভ, কিন্তু ক্রমে জমে গিয়ে স্বর গাঢ় হয়ে উঠেছে। ঠাকুর শুনতে পেয়েছেন। পর দিন সকালে এসে বলছেন, 'কাল যে তোমাদের খুব গান হচ্ছিল। তা বেশ, বেশ, ভালো।'

কী লজ্জা, ঠাকুর শুনতে পেয়েছেন নাকি? যে আনন্দগানটি মনের মধ্যে অব্যক্ত হয়ে আছে তা-ও শুনতে পান নিশ্চয়ই।

দু রকম করে পান সাজে সারদা। কতগুলো এলাচ-মশলা দিয়ে কতগুলো বা খালি চুন-শুপুরি দিয়ে। যোগেন-মা জিগগেস করলে, তার মানে?

'যোগেন, ভালোগুলো ভক্তদের—ওদের আমাকে আদর-যত্ন করে আপনার করে নিতে হবে কিনা, তাই। আর এগুলো, মন্দগুলো, ওঁর জন্যে। উনি তো আপনার জন আছেনই।'

যে আপনার জন সে এমনিতেই সুস্বাদু।

ছেলেরা কেউ না থাকলে স্নানের সময় সারদা তেল মাখিয়ে দেয় ঠাকুরকে। কাঁচের উপর রোদ পড়লে যেমন ঝিলিক দেয় তেমনি জ্যোতি বেরোয় ঠাকুরের গা থেকে। হরতেলের মত রঙ, সোনার ইষ্টকবচের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশে যাচ্ছে। গোড়ায়-গোড়ায় সাত-তাওয়ার আগুন জ্বলেছে গায়ে। সে আগুনের তাত সারদাই শুধু সইতে পেরেছে।

'শেষে সে রঙ আর ছিল না, সে শরীরও ছিল না।' বলছেন ভক্ত-মেয়েদের, 'এই আমাকেই দেখ না! এখন কেমন রঙ হয়েছে, কেমন শরীর হয়েছে। আগে আমার কি এই রকম রঙ ছিল? আগে খুব সুন্দর ছিলুম। এতটা মোটা ছিলুম না—'

কোত্থেকে সেদিন গোলাপ-মা এসে সারদার হাত থেকে ভাতের থালা কেড়ে নিলে। কেড়ে নিয়ে ধরে দিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। হাঁ-না কিছু বলতে পারল না সারদা। ভাতের থালা ছেড়ে দিল।

বড় শোকা-তাপা মানুষ এই গোলাপ-মা। চণ্ডী বলে একটি মেয়ে, পাথুরেঘাটায় ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে দিয়েছিল। অকালে মরে গেল সেই মেয়ে, পাগলের মত হয়ে গেল গোলাপ-মা। পড়ল এসে ঠাকুরের পায়ে। সেই থেকে ঠাকুরের আশ্রিত। 'তুমি ওকে খুব পেট ভরে খেতে দেবে।' সারদাকে উপদেশ দিয়েছেন ঠাকুর : 'পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে।'

হাতের লক্ষ্য হয়ে রয়েছে সারদার পাশে-পাশে। সে যদি হাতের থেকে থালা তুলে নেয়, কি করতে পারে সারদা?

কিন্তু এমন হবে কে জানত! সেই থেকে গোলাপ-মাই ভাতের থালা নিয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের কাছে। দুবেলা খাওয়াচ্ছে পাশে বসে।

সারা দিনে ঐ একটু ঠাকুরকে দেখবার সুযোগ ছিল। ঐ একটু পাশে বসবার, ঘরোয়া দুটি কথা কইবার। সে অধিকারটুকু থেকেও সে বঞ্চিত হল।

আরো একদিন অমনি অতর্কিতে তার হাতের থেকে থালা টেনে নিয়ে গিয়েছিল আরেকজন। আরেক মেয়ে। ঠাকুরের ঘরে থালা-হাতে ঢুকতে যাচ্ছে সারদা, কোত্থেকে সে মেয়ে এসে বললে, আমায় দাও না মা,

আমি নিয়ে যাচ্ছি। তার প্রসারিত হাতে অমনি ছেড়ে দিল ভাতের থালা। ঠাকুরের সামনে ধরে দিয়ে পালিয়ে গেল মেয়ে।

সারদা কাছে বসল। মৃদু-মৃদু হাওয়া করতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'আমি খেতে পাচ্ছি না। জানো না ও কে?'

সারদা জানে, মেয়েটা ভালো নয়। বললে, 'জানি।'

'তবে আমার খাবার নিজে না এনে ওর হাতে দিলে কেন? ওর ছোঁয়া আমি খাই কি করে?'

'আজকে খাও।' সারদা মিনতি করতে লাগল।

'তবে বলো, আমার খাবার আর কোনো দিন আর কারু হাতে দেবে না।' ঠাকুর তর্জন করলেন।

হাতের পাখাটি রেখে দিল এক পাশে। হাত জোড় করল সারদা। বললে, 'সেটি আমি পারবোনি। কেউ আমার কাছে মা বলে চাইবে আর আমি তা দেব না এমনটি হবেনি কখনো। তুমি তো খালি আমার একলার ঠাকুর নও, তুমি সক্কলের। তবে, তুমি যখন বলছ, তোমার খাবার আমিই নিজে আনবার চেষ্টা করব।'

ঠাকুর তখন খুশি হয়ে খেতে লাগলেন।

কই সারদাকে তো আর ডাকছেন না ভাত আনতে। কি সহজেই এই সর্বশেষ অধিকারটুকুও হারিয়ে বসল সারদা।

তবু অভিযোগ নেই, কাতরতা নেই। বরং ভাবে, ঠাকুর কি আমার একলার? ঠাকুর সক্কলের।

একবেলা নয়, দুবেলাই ভাত নিয়ে যায় গোলাপ-মা। নিচ্ছে তো নিক কিন্তু এমন জগৎজোড়া গল্প জুড়ে দিয়েছে, নবতে ফেরবার আর নাম নেই। সন্ধ্যায় গিয়ে ফিরতে-ফিরতে সেই দশটা। গোলাপ-মা ফিরে এলে পরে খাবে সারদা। তার খাবার আগলে নবতের বারান্দায় বসে থাকতে হয়। একদিন, শুধু একদিন নালিশ করে ফেললে: 'খাবার বিড়াল-কুকুরে খায় খাক, আমি আর আগলাতে পারবোনি।'

গোলাপ-মা শুনতে পায়নি, কিন্তু ঠাকুর শুনেছেন। বললেন, 'এতক্ষণ থেকো না। ওর কষ্ট হয়।'

গোলাপ-মা নিজের আনন্দে ডগমগ, পরের কষ্ট বোঝবার তার সময় নেই। সে উলটে বললে, 'না, মা আমাকে খুব ভালোবাসে। মেয়ের মত ডাকে আমায় নাম ধরে।'

রান্নাটি ভালো হয়েছে এ কথাটুকুও আর শুনি না। সূক্ষ্মতম আস্বাদের যে একটি সেতু ছিল তাও অপসৃত হল। এবার পূর্ণতম বিচ্ছেদ, পূর্ণতম পরিপ্রাপ্তি!

দরমার বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সারদা। কোথায় ছোট একটি গর্ত হয়েছে তার উপর চোখ রেখে। তৃষিত চাতকের চোখ। আর মনকে সান্ত্বনা দেয়, মন, তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?

জ্বালা নয়, নিন্দা নয়, বিদ্রোহ নয়। শুধু চেয়ে থাকা। শুধু প্রতীক্ষা, শুধু সমর্পণ।

বেড়ার গর্ত কখন একটু বড় হয়েছে বুঝি!

তাই দেখে ঠাকুর পরিহাস করেন। রামলালকে ডেকে বলেন, 'ওরে রামলাল, তোর খুড়ির পর্দা যে ফাঁক হয়ে গেল।'

...তেরো...

দুপুর আর কাটে না সারদার। সারা সকালের রান্না-বাড়া কেমন একটা ছন্দপতনে এসে শেষ হয়। যার জন্যে রান্না তাকে কাছে বসিয়ে খাওয়ানো যায় না। এ যেন ফুলটি ঠিক তুললুম অথচ দিতে পারলুম না অঞ্জলি। যার জন্যে সাজলুম-গুজলুম সেই দেখল না!

একটা-দুটো নাগাদ চারটি মুখে তোলে। তারপর একটু গড়িয়ে নেয়। তিনটে বাজলে একটু রোদের জন্যে তাকায় ইতি-উতি। কোনোদিন মেলে, কোনোদিন মেলে না। মিললে শুকিয়ে নেয় কেশভার। যত কেশ তত রোদ নেই। বিকেলে যোগেন-মা আসে চুল বাঁধতে। আকাশের রোদ বাঁধতে পারি কিন্তু এ কেশদাম বাঁধব কি দিয়ে?

তারপর ঝাঁট দেয়, লণ্ঠন সাফ করে, ঠিক করে রাতের রান্না। সন্ধে দেয়, ধ্যানে বসে। তারপরে আবার রান্না, আবার সেই নিজেকে নেপথ্যে রেখে থালা পাঠিয়ে দেওয়া। তারপর কখন দুটি মুখে গোঁজা, আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়া।

এতেও কি শান্তি আছে? কলকাতা থেকে স্ত্রী-ভক্তরা আসে ভিড় করে। কেউ-কেউ বা বায়না ধরে রাতখানা এখানেই কাটিয়ে যাবে। তখন সারদার নবত ছাড়া আর কোথায় তাদের আশ্রয়? তবে ভাব থাকলে তেঁতুল-

পাতায় শোয়া যায়। সবাইকে তাই নিজের স্নেহবেষ্টনীতে টেনে নেয় সারদা। দুশ্চরচারিণী হয়েও অভিলষিতদায়িনী জগন্মাতা। সর্বকামদুঘা পৃথিবী।

এবার একটি স্থায়ী বাসিন্দে নিয়ে এলেন ঠাকুর।

নবতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন সারদাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য সম্বোধন!

'ব্রহ্মময়ি, ওগো ব্রহ্মময়ি—' ডাকলেন ঠাকুর। বললেন, 'একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও, একজন সঙ্গিনী এল।'

এই সেই গৌরদাসী! 'যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না।' যাকে লক্ষ্য করে পরে বলেছেন শ্রীমা।

রামেশ্বর থেকে ফেরবার সময় মাকে জিগগেস করল মেয়েরা। 'কি রকম সেখানে দেখে এলেন বলুন।'

'আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে। আমি বললুম, আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত সে দিত।'

'মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়,' বললেন ঠাকুর, 'সে কখনো মেয়ে নয়। সে পুরুষ। যেমন আমাদের গৌরদাসী।'

খাঁটি কথা। সায় দেন শ্রীমা। ওর মত কটা পুরুষ ভুভারতে? ত্যাগে আর তেজে জ্যোতিরাত্মা।

নবতের ঝাঁপড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে সেদিন একটি অপূর্ব সংলাপ শুনল সারদা।

'দ্যাখ গৌরি,' ঠাকুর বলছেন গৌরদাসীকে, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা।'

বকুলতলায় ফুল কুড়োচ্ছিল গৌরদাসী। চোখ তুলে বললে, 'এখানে কাদা কোথায় যে চটকাবো? সবই যে কাঁকর।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি!' দেখতে-দেখতে গলার স্বর ভার হয়ে এল। 'এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু, তুই তাদের মধ্যে কাজ কর।'

মাথা ঝাঁকালো গৌরদাসী। বললে, 'রক্ষে করো, সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না। বরং আমাকে কতগুলো মেয়ে দাও, তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্ছি।'

ঠাকুর গম্ভীর হলেন। বললেন, 'না গো না, এই টাউনে বসে কাজ

করতে হবে। সাধনভজন ঢের করেছিস এবার এই তপস্যা-পোরা জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগা। ওদের বড় কষ্ট।'

মাঝে-মাঝে ব্রহ্মময়ীর কষ্টের খোঁজ নেন ঠাকুর। কিন্তু সারদা তো কষ্টধারিণী নয় সে কষ্টহারিণী।

একদিন গৌরদাসী এসে খবর দিলে, মা'র মাথা ধরেছে। শুনে অবধি ছটফট করতে লাগলেন ঠাকুর। রামলালকে ডেকে-ডেকে বলতে লাগলেন বারে-বারে, 'ও রামনেলো, তোর খুড়ির আবার মাথা ধরল কেন?'

মাসে কটি টাকা হাত-খরচ লাগতে পারে সারদার তার হিসেব করতে আসেন।

'ক টাকা হলে মাস-মাস চলে তোমার হাতখরচ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

ওমা, এ কি কথা! লজ্জায় মুখ নামালো সারদা। কিন্তু ঠাকুর ছাড়বার পাত্র নন। প্রশ্ন যখন করা হয়েছে উত্তরটি চাই ঠিক-ঠিক।

'কত আবার!' পষ্টাপষ্টি বললে সারদা। 'এই পাঁচ-ছ টাকা হলেই চলে যায়।'

স্বামীর তো মোটে সাতটি টাকা রোজগার। তাও ছুঁতে পারেন না। পুজো করা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে টাকা গিয়ে জমছে সিন্ধুকে। হৃদয়ের হেপাজতে। সে টাকা জমিয়েই তো তিনশো। সেই তিনশো থেকেই মা'র অলঙ্কার!

যাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন তাকে আবার আভরণে উদ্ভাসিত করছেন। যাকে বিত্তবঞ্চিত করেছেন তারই হাতে গুঁজে দিচ্ছেন মাসোয়ারা। এ কি বনবাসে রাখা না কি মনোবাসে রাখা?

ঠাকুর যতদিন বেঁচে ছিলেন ঐ সাতটা টাকা মাকে দিতেন ত্রৈলোক্য। মথুরের ছেলে ত্রৈলোক্য। কিন্তু ঠাকুরের দেহ যাবার পর ঐ টাকাটা দীনু খাজাঞ্চি বন্ধ করে দিলে। ত্রৈলোক্যের আত্মীয়েরা সমর্থন করলে দীনুকে। মা তখন বৃন্দাবনে। চিঠি গেল। তিনি লিখলেন, 'বন্ধ করেছে তো করুক, এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা নিয়ে আমি আর কি করবো!'

নরেন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। ঐ সাতটা টাকার জন্যে অনেক সে দরবার করলে, অনেক হুলুস্থুল। 'মায়ের ও টাকাটা বন্ধ কোরো না।' তুললে সিংহনাদ।

কিন্তু ওরা কান পাতল না কিছুতেই। বন্ধ করল তো করলই। মাকে

ঐটুকু থেকে বঞ্চনা করতে পারলেই যেন ভাণ্ডার সঞ্চীয়মান হয়ে উঠবে।

'তা দেখ, ঠাকুরের ইচ্ছায় অমন কত সাত গণ্ডা এল-গেল!' বলছেন শ্রীমা। 'দীনু ফীনু সব কে কোথায় চলে গেছে! আমার তো এ পর্যন্ত কোনো কষ্টই হয়নি। কেনই বা হবে! ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, আমার চিন্তা যে করে সে কখনো খাওয়ার কষ্ট পায় না।'

যেন ঐ একমাত্র কষ্ট! যখন দু বেলা দু মুঠো শুধু অন্ন জুটছে, আর তবে কষ্ট কি সংসারে!

অপ্রকট হবার আগে ঠাকুর বললেন, তুমি কামারপুকুরে যাবে আর শাক-ভাত খাবে।

সত্যি-সত্যি শাক-ভাত খেতেন মা। নুন জোটেনি এক কণা। তাইতেই অপরিসীম তৃপ্তি। স্বাদলাবণ্যময় সমস্ত অন্নব্যঞ্জন।

কোনোরকমে শরীরধারণ করা নিয়ে কথা। শরীরধারণ হরির-কারণ। শরীর রাখা মানে হরিনাম করবার সুযোগ পাওয়া। ঈশ্বরের ঐকতান-বাদনসভায় একটি সহযোগী যন্ত্র হওয়া।

গৌরদাসীর মা'র নাম গিরিবালা। ঠাকুরের দিকেই তার টান বেশি, মা'র দিকে লক্ষ্য নেই।

মেয়ে পীড়াপীড়ি করে: 'নবতখানায় আমার মাকে একবার দেখে আসবে চলো।'

গিরিবালা বিরক্ত হন। বলেন, 'তোদের ভেতর এখনো অনেক অভাব আছে। তাই এদিক-ওদিক তাকাতে হয়। আমার হৃদয়ে স্বয়ং ত্রিপুরেশ্বরী বিরাজ করছেন, আমার আর কারু প্রয়োজন নেই।'

'ভাগ্য নেই, তাই বলো।' টিপ্পনি কাটে গৌরদাসী।

একদিন কিন্তু জোর করেই গিরিবালাকে টেনে নিয়ে গেল নবতখানায়। 'দেখ-দেখ মা আমার গৃহকর্ম করছেন—' গৌরদাসী বললে উচ্ছল হয়ে।

হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়াল সারদা।

'এ্যাঁ, মা, তুমি? তুমি! এ যে আমার সেই।' পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল গিরিবালা। ধুলো নিয়ে মাখতে লাগল বুকে-কপালে।

'কি হয়েছে গো, অমন কচ্ছ কেন?' সরলা বালিকার মত তরল চোখে তাকিয়ে রইল সারদা।

'হবে আবার কি! যা হবার তাই হয়েছে!' রোক করে বললে গৌর-দাসী।

ব্রহ্মময়ী রাতে কখানা রুটি খান তারও খোঁজ নিতে আসেন ঠাকুর।

'হ্যাঁ গা, রাতে কখানা রুটি খাও ?'

লজ্জায় মুছে যেতে চাইল সারদা। ওমা, এ কী প্রশ্ন! কিন্তু উত্তর না দিয়ে সে পার পাবে না। তাই বললে মুখ নামিয়ে, পাঁচ-ছখানা।

আর কি চাই! থাকো এবার গিয়ে খাঁচার মধ্যে। পাঁচ-ছখানা করে রুটি, পাঁচ-ছটাকা করে হাত-খরচ আর হাতে-গায়ে কিছু গয়না। যথেষ্ট হয়েছে। তৃপ্তির আকাশে ওড়ো এবার অসীমের নীল পাখি।

তাও গয়না কখানা পরবার কি জো আছে! লোকের চোখ টাটায়!

গোলাপ-মা এসে বললে, 'মনোমোহনের মা সেদিন কি বলছিল জানো ?'

সারদা তাকাল কৌতূহলী হয়ে।

'বলছিল, ঠাকুর অত বড় ত্যাগী, আর মা এই মাকড়ি-টাকড়ি এত গয়না পরেন, এ কি ভালো দেখায় ?'

পরদিন সকালে যোগেন-মা এসে দেখে, হাতে দুগাছি বালা ছাড়া আর কোনো গয়না নেই মা'র গায়ে। মা, একি ? এ কি করেছ ?

'বা, গোলাপ যে বললে—'

'বলুক গে। অন্তত মাকড়ি আর এ সামান্য কটা গয়না তোমার গায়ে রাখো।'

শুনল আবার যোগেন-মা'র অনুরোধ! কি হবে আমার গয়না দিয়ে! চিত্ত কি বিত্তে তর্পণীয় ? আমার এ অলঙ্কার তো অহঙ্কারের বিজ্ঞাপন নয়, আমার চিরসাধব্যের ঘোষণা। আমার আয়তির দীপবর্তি।

স্বামী-স্ত্রী দুজন এসেছে মা'র কাছে। স্ত্রীটির কপালে সিঁদুর নেই। মেয়ে-ভক্তেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। একজন বললে, 'হ্যাঁ গা, তোমার কপালে সিঁদুর নেই কেন ?'

মহিলাটি অপ্রস্তুত হবে তাই তাকে বাঁচিয়ে দিলেন শ্রীমা। বললেন, 'তা আর কি হয়েছে! ওর এমন স্বামী সঙ্গে, নাই বা পরেছে সিঁদুর।' বলে নিজে কৌটো খুলে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন মেয়েটিকে। যে ঐশ্বর্য-চেতনাটি প্রচ্ছন্ন ছিল তা উল্লিখিত করে দিলেন।

দুটি পুরুষ-ভক্ত এসেছে মা'র কাছে। দুখানি কাপড় নিয়ে এসেছে। মা এসে দাঁড়াতেই কাপড় দুখানি তাঁর পায়ের কাছে রেখে তারা প্রণাম করলে। আশীর্বাদ করলেন মা। বললেন, 'বাবা, তোমাদের অবস্থা খারাপ, তোমাদের আবার কাপড় দেওয়া কেন ?'

একটু ক্ষুণ্ণ হল বুঝি ছেলে দুটি। বললে, 'মা, তোমার বড়লোক ছেলেরা তোমাকে দামী কাপড় দেয়। তোমার গরিব ছেলেরা এই মোটা কাপড়ের বেশি আর কি পাবে! তুমি যদি তাই দয়া করে তুলে নাও তবেই আমরা কৃতার্থ।'

তক্ষুনি মা কাপড় দুখানি তুলে নিলেন হাতে করে। বললেন, 'বাবা, এই আমার গরদ ক্ষীরোদ নীরদ—'

সেই ব্রহ্মময়ীকে ঠাকুর কেন নির্বাসিতা করেছেন? রাম যে সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছিল তার অন্তত একটা রাজনৈতিক যুক্তি ছিল। রাম নিজে জানত সীতা অপাপা, নিষ্কলঙ্কা, তবে যেহেতু প্রজারা বলাবলি করছে সেই হেতু তাকে রাজধানী থেকে দূরে রাখা দরকার। কিন্তু সারদার সম্বন্ধে তো কোনো ফিসফাস নেই, নেই কোনো কানাঘুষা। ও তো জ্যোৎস্নার চেয়ে নির্মল, গঙ্গাজলের চেয়ে পবিত্র। তবে? ও কেন সামনে বেরুতে পারবে না, বসতে পারবে না কাছে এসে? রাঁধতে পারবে অথচ পরিবেশন করতে পারবে না কেন? ও কী করেছে? কোন দোষে ও দোষী জিগগেস করি?

ঠাকুরের দর্শনে কত মেয়ে-পুরুষ আসছে তখন দক্ষিণেশ্বরে। পুরুষেরা বসেছে মুক্ত আঙিনায়, মেয়েরা চিকের আড়ালে। ঠাকুরের তখন কত আশ্চর্য ভাবসমাধি, কত নাম-গান, কত হরি-সঙ্কীর্তন! সহধর্মিণী বলে আলাদা কোনো খাতির-সুবিধা চাইনে, কিন্তু যেখানে পর্দা ফেলে পুরস্ত্রীরা বসেছে তাদের মাঝখানে বসবারও কি সারদার অধিকার ছিল না? অসামান্যের আসন না পাক, মাত্র সামান্যের অধিকার পাবে না? স্ত্রী হয়েছে বলে কি সে এত অপাঙক্তেয়? এত অকিঞ্চিৎকর? যার রাজেন্দ্রাণী হয়ে সভা উজ্জ্বল করে বসবার কথা, সে থাকবে নহবতখানার অন্ধকারে, কাঙালিনীর মূর্তিতে? কেন?

আমরা যে মা'র কাঙাল সন্তান। ঐশ্বর্য-আরূঢ় দেখলে পাছে আমরা এগুতে না সাহস পাই তারই জন্যে ম্লান বেশ ধরেছেন। চোখে মেখেছেন মমতার মেদুরতা। পাছে আমাদের চিনতে না ভুল হয়। পাছে ঠিক চলে আসতে পারি তাঁর কোলের কাছটিতে।

বিভূতি নিজের বাড়িতে তত পেট পুরে খায় না, যত মা'র কাছে বসে খায়। তাই দেখে তার গর্ভধারিণী মা অনুযোগ করছে : 'বিভূতি এখানে তো বেশ খায়, আমার ওখানে মাত্র এত কটি খায়।'

মা অমনি ফোঁস করে উঠলেন : 'আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়ো না। আমি ভিখারীর রমণী, আমার ছেলেদিকে আমি যা খেতে দিই, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।'

কতগুলি জবা ও গোলাপ ফুলের কুঁড়ি ভেজা নেকড়ায় বেঁধে নিয়ে এসেছে এক ভক্ত।

মা কাছে ডাকিয়ে নিলেন। বনদুর্গার মন্দিরে একবার এক সন্ন্যাসিনীকে দেখেছিল, মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল এ যেন সেই সন্ন্যাসিনী। চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল ও অশ্রুভরা চোখে দেখতে লাগল মাকে।

মা বললেন, 'বাবা, আমি তো কোনো যুগীকে মন্ত্র দিইনি।'

ভক্তের বুকে যেন তপ্ত লোহার স্পর্শ লাগল। মনে-মনে বললে, তুমি অনাথের নাথ তাতে দোষ নেই, আমার পদবীতে 'নাথ' বলে আমার যত দোষ।

'তোমাদের তো কুলগুরু আছে, তার কাছ থেকে দীক্ষা নাও গে যাও।'

নিরালম্ব দুর্বলের মত ভক্তটি চলে যাচ্ছে নিচে। যেতে কি পারে! চোখের জলে সিঁড়িগুলি ঝাপসা হয়ে গেছে।

কে ডাকল ভক্তকে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, এক ব্রহ্মচারী। আপনাকে মা ডাকছেন।

আমরাই শুধু মাকে ডাকি না। মাও আমাদের ডাকেন।

নম্রমুখে জোড়হাতে মা'র দরবারে দাঁড়াল এসে ভক্ত। মা বলে উঠলেন, 'এস বাবা এস, বোসো এই আসনে। তোমরা কৃষ্ণমন্ত্রী, তাই না? এস দীক্ষাটা দিয়ে দি—'

ঠাকুরের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসে গৌরদাসী। এটি যেন ঠিক বুঝতে পান ঠাকুর। তাই একদিন জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, সত্যি বলবি? তুই কাকে বেশি ভালোবাসিস?'

গৌরদাসী গান গেয়ে জবাব দিলে :

'রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী,
লোকের বিপদ হলে
ডাকে মধুসূদন বলে
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশিতে বলো রাইকিশোরী॥'

সেই কৃষ্ণময়জীবিতা রাধিকা বন্দিনী আছেন নবতে। তন্মনা হয়ে। অর্পিতচিত্তা হয়ে। তৃপ্তিময়ীর তিতিক্ষায়।

রামের তবু তো একটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল। সীতার জন্যে বেছেছিল একটি মনোরম তপোবন। আর এ কী হতচ্ছাড়া জেলখানা। কুঠুরী না কোটর, গুহা না গর্ত! তারই বেড়ার ছিদ্রে চোখ রেখে দাঁড়ায় সেই কারা-বাসিনী। সেই নীলকান্ত আকাশের দ্যুতিটি ধরতে চায়। আর মনকে প্রবোধ দেয়, মন, তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?

এ প্রবোধটি কার? যে সর্বাগ্রগণ্যা সহধর্মিণী, তার। এ সন্তোষটি কার? যে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সমস্ত অলঙ্কার থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তার।

এ সান্ত্বনা, এ প্রার্থনা দেখেছি আর কোনো কাব্যে ধর্মে বা ইতিহাসে?

ব্যবধান যত দূর, বিরহ তত সহনীয়। কোথায় অযোধ্যা, কোথায় বাল্মীকির তপোবন! আর ঠাকুরের ঘর আর নবতখানা মোটে পঞ্চাশ গজ তফাত। ঝাঁপড়ি সরিয়ে একটু—শুধু দুপা—বেরিয়ে পড়লেই দেখা যায় সেই পরমরমণীয়কে। সেই পরমধন পরশমণিকে। নবনীরদশ্যামগোপাল-কৃষ্ণকে। সেই সাহ্লাদসতৃষ্ণনয়ন সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে।

কিন্তু ডাক নেই। আমন্ত্রণ নেই। সারদা স্পর্শাসহা লজ্জাবতী লতা। আছে সঙ্কোচে সুষমা হয়ে। উদ্যোগ নেই শুধু প্রস্তুতি। আরম্ভ নেই শুধু প্রতীক্ষা। তার ধ্রুবা স্মৃতি। স্থির স্থিতি। স্থিত প্রজ্ঞা।

'আমি তো তবু চোখে দেখেছি। ছুঁয়েছি। সেবাযত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন যেতে পেরেছি কাছে, যখন বলেননি নামিইনি নবত থেকে। দূর থেকে যদি দৈবাৎ কখনো দেখতে পেয়েছি, পেন্নাম করেছি—' আনন্দে উদ্বেল হয়ে বলছেন শ্রীমা।

বিরহ তো নয় আনন্দের অম্বুনিধি, অদর্শন তো নয় অঙ্গবিহীন আলিঙ্গন।

...চৌদ্দ...

পানিহাটিতে উৎসব হচ্ছে। সবাই যাচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ।

একজন স্ত্রী-ভক্ত জিগগেস করলে ঠাকুরকে: 'মা যাবেন আমাদের

সঙ্গে?' ঠাকুর উদাসীনের মত বললেন, 'ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক।'

ইচ্ছা হয় তো চলুক। এ তো মন খুলে অনুমতি দেওয়া নয়। এ তো নয় আনন্দে আহ্বান করা। আমার যাওয়াটি যদি তাঁর কাম্য হত তবে সোল্লাসে বলে উঠতেন : 'বা, যাবে না? যাবে বৈকি।'

তেমন যখন ডাক নেই, দরকার নেই গিয়ে। স্ত্রী-ভক্তদের বললে সারদা, 'অনেক ভিড় হবে। অত ভিড়ে আমার দেখা হবে না কিচ্ছু। আমি যাব না।'

মুহূর্তে ইচ্ছাটুকু ত্যাগ করল সারদা। অভিমানের কুয়াশাটুকুও রইল না। স্বচ্ছ আকাশ প্রসন্ন রোদে ঝলমল করছে। আকাশ তো নয় মন। রোদ তো নয় নির্বাসনা।

ঠাকুর যখন ফিরছেন, বললেন, 'ও না গিয়ে ঠিকই করেছে। ও অশেষ বুদ্ধিমতী। ও বুঝেসুঝেই যায়নি, চায়নি যেতে।'

সবাই তাকালো মুখের দিকে।

'এমনিতে ভক্তের দল যখন সঙ্গে যায় তখন লোকেরা বলে, পরমহংসের ফৌজ চলেছে। এখন ও যদি সঙ্গে থাকত, বলত, ঐ দেখ হংস হংসী।'

কাকে না বিদ্রূপ করেছে ওরা? কাকে না নিন্দে করেছে? নিন্দা করতে দিয়ে ওদের আনন্দিত করছি।

লোক না পোক!

কিন্তু হৃদয়কে একদিন শাসিয়েছিলেন ঠাকুর : 'তুই আমাকে হেনস্তা করছিস কর। কিন্তু ওকে, তোর মামীকে যেন করিসনে। আমার মধ্যে যে আছে সে যদি ফণা তোলে হয়তো বেঁচে যেতে পারিস। কিন্তু ওর মধ্যে যে আছে সে যদি একবার মাথা তোলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও সাধ্য নেই তোকে বাঁচায়।'

একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসে সারদার কাছে, নহবতের নিভৃতিতে। অনেকক্ষণ গল্প করে কাটিয়ে যায়। সেই কখন আসে ফিরে যেতে-যেতে বিকেল।

কি এত কথা ওর সঙ্গে! বৃদ্ধাকে ঠাকুরের একদম পছন্দ নয়। এককালে জীবনের কাহিনী ওর মলিন ছিল, তারই জন্যে এই বিরাগ। একদিন সরাসরি ঠাকুর বললেন সারদাকে, 'আমার ইচ্ছে নয় ও আসে।'

এইখানেই যা একটু সংঘাত। কলঙ্কের সঙ্গে মাতৃস্নেহের। তুমি

পিতা, কলঙ্কিনী কন্যাকে ত্যাগ করতে পারো, কিন্তু আমি মা, আমি পারব না ত্যাগ করতে।

ও মা, যোগেন-মা'র তো চক্ষুস্থির, ঠাকুরের না করে দেবার পরও সেই বৃদ্ধা আসছে সারদার কাছে। শুধু তাই নয়, সারদাকে মা বলে ডাকছে। আর সারদা তাকে খেতে দিচ্ছে, আদর করে কথা কইছে। জীবন-মরুর শেষ সীমানায় এসে ও কোথায় পাবে আর তৃষ্ণার পানীয়? কোথায় আর শীতল তরুচ্ছায়া? কে দেবে দুটি অমিয়মাখা আশ্বাসবাণী?

ঠাকুর সব দেখলেন, টুঁ শব্দটি আর করলেন না। মা'র কাছে হার মানলেন। সেই হারেই মেনে নিলেন মা'র মাতৃত্বের গভীরতা।

তিনকড়ি আর তারাসুন্দরী মাঝে-মাঝে আসে মা'র কাছে। নাম-করা অভিনেত্রী। আসে মাকে প্রণাম করতে। মা অভয় দেন কিন্তু ওদেরই সঙ্কোচ। কিছুতেই পা স্পর্শ করবে না মা'র। ঠাকুরঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করবে। প্রণামের পর প্রসাদ দেন মা। কলাপাতা বা শালপাতায় করে বাইরে বসে প্রসাদ নেয়। নিজেরাই পাতা ফেলে দিয়ে আসে রাস্তায়, নিজেরাই গোবর দিয়ে এঁটো স্থান পরিষ্কার করে। মা পান নিয়ে আসেন। এমন আলগোছে পান নেয় যেন মা'র আঙুল না ছুঁয়ে ফেলে।

নিজেকে এমনি ভাবে দীনতায় নিয়ে আসা এ ভক্তি ছাড়া আর কি।

'এদেরই ঠিক-ঠিক ভক্তি।' বললেন একদিন শ্রীমা : 'যেটুকু ভগবানকে ডাকে সেটুকু একমনে ডাকে।'

সেদিন একা এসেছে তিনকড়ি। দোতলায় মা'র কাছে। বসেছে ঠাকুর-ঘরের বাইরে।

লক্ষ্মী বললে, 'একটা গান গাও।'

'আপনাদের কাছে আমি কি গাইতে পারি?' তিনকড়ি মুখ নামাল।

'তাতে কি, গাও না—' স্বয়ং মা এবার অনুরোধ করলেন : 'সেই পাগলীর গানটা গাও না—'

তিনকড়ি ছায়ানটে গান ধরল।

'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে
যেখানে যাই সে যায় পাছে, বলতে হয় না জোর করে॥'

বেলা সাড়ে-নটা। যোগেন-মা কুটনো কুটছে। শরৎ মহারাজ কি লিখছেন বসে-বসে। অন্যান্য ভক্ত-কর্মীরা যে যার কাজে মশগুল। এমন সময় ভক্তিরসের বান ডেকে এল। যেন সুরলোক থেকে নেমে এল সুরধুনী।

'আমি জানতে এলাম তাই
কে বলে রে আপনরতন নাই?
সত্যি-মিথ্যে দেখ্‌না এসে, কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে॥'

শরৎ মহারাজের হাতের লেখনী স্তব্ধ হয়ে রইল। যে যেখানে ছিল ছুটে এল দোতলায়। যোগেন-মা কুটনো ফেলে উঠে এল, রাঁধুনে-বামুন রান্না ফেলে আর চাকর তার বাটনা ফেলে। ঠাকুরঘরে পা ছড়িয়ে বসে মা গান শুনছেন। সমস্ত বাড়িতে যেন আর হাঁটা-চলা নেই, সাড়া-শব্দ নেই। সমস্ত যেন নিঃশূন্য হয়ে গেছে—এমন সে স্তব্ধতা। আর সে স্তব্ধতার গুহামুখ থেকে বেরুচ্ছে সুরস্রোত।

মা সমাসীন হয়েছেন সমাধিতে। বাহ্যজ্ঞান ফিরে পাবার পর আঁচলে চোখ মুছলেন। বললেন, 'আজ কি গানই শোনালি মা!'

তোর কণ্ঠে গান, চক্ষে অশ্রু, হৃদয়ে ভক্তি, তোকে আর পায় কে! তোর কণ্ঠে সরস্বতীর করুণা, চক্ষে রাধিকার অশ্রু, হৃদয়ে দ্রৌপদীর ভক্তি—তোকে অবিদ্যা কে বলে!

সেদিন সত্যি-সত্যি এক পাগলী এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। প্রায়ই আসে। আসে ঠাকুরের সন্ধানে। বলে, আমি তোমার মধুরভাবের সাধনসঙ্গিনী। শুনে ঠাকুর বিরক্ত হন। সেদিন তো চটে-মটে তিরস্কার শুরু করে দিলেন। চাইলেন বার করে দিতে।

নবতখানার বন্দীশালা থেকে সব দেখল সারদা। সব শুনল। মনে হল পেটের মেয়েকে যেন তার মা'র সমুখে কে অপমান করলে।

'গোলাপ,' গোলাপ-মাকে ডাকল সারদা : 'যাও তো, ওকে এখানে নিয়ে এস।' পরে বললে নিজে-নিজে : 'ও যদি কিছু অন্যায়ও বলে থাকে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো হত। অমন ভাবে গালাগাল দেবার কী হয়েছিল!'

গোলাপ-মা নিয়ে এল পাগলীকে। সস্নেহে তাকে কাছে টেনে আনল সারদা। বললে, 'উনি যখন তোমাকে দেখতে পারেন না, তখন তুমি ওঁর কাছে যাও কেন? তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার কাছে আসবে, কেমন?'

ভক্তদের পাগলী-মামী, রাধুর-মা, সুরবালা, সারাক্ষণই সেদিন গালাগাল দিচ্ছে শ্রীমাকে। সেসব কটূক্তি মা কানেও তুলছেন না। এক-কান দিয়ে ঢুকছে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পাগলী বলে উঠল : 'সর্বনাশী।'

মা তখন রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমাকে আর যা বলো, সর্বনাশী বোলোনি। আমার জগৎ জুড়ে ছেলেরা রয়েছে, তাদের অকল্যাণ হবে।'

রাত্রে বাবুরামের চারখানা রুটি খাবার কথা। ঠাকুরের আদেশ। যার যেরকম ধাত তাকে সেই পরিমাণ রুটি খাবার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ঠাকুর। বাবুরামের বরাদ্দ চারখানা লঘুাশী হতে পারলেই রাত্রির ধ্যান ভালো জমবে।

'কখানা করে রুটি খাচ্ছিল রে বাবুরাম?' একদিন ঠাকুর জিগগেস করলেন হাঁক দিয়ে।

বাবুরাম মুখ লুকোল। বললে, 'পাঁচ-ছখানা।'

'কেন, বেশি হচ্ছে কেন?' ঠাকুরের কণ্ঠে শাসনের তর্জন।

'তার আমি কি জানি! মা দেন তাই খাই।'

মা দেন! জবাবদিহি নিতে তক্ষুনি এসে হাজির হলেন নবতে। বললেন, 'তুমি কি বেশি-বেশি খাইয়ে ছেলেগুলোর আখের মাটি করবে?'

সারদা হাসল মুগ্ধা জননীর মত। তার নেত্রামৃতচ্ছটায় সমস্ত দিক-দেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে বললে, 'সামান্য দুখানা রুটি বেশি খেয়েছে বলে তোমার ভাবনা! তোমার ভাবতে হবে না। ছেলেদের ভাবনা আমি ভাবব, আমাকে ভাবতে দাও। দুখানা রুটি বেশি খেয়েছে বলে আমার ছেলেকে তুমি বোকো না।'

বরাভয়করার কাছে যেন আশ্বাস পেলেন ঠাকুর। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা প্রহসন এমনি একটা ভাব করে উচ্চরোলে হেসে উঠলেন।

মা আবার টেক্কা দিলেন ঠাকুরকে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী এসে দেখলে ঠাকুরের বিছানা ময়লা। বললে, 'আমি দশ হাজার টাকা লিখে দেব, তার সুদে তোমার সেবা চলবে।'

যেন মাথায় কে লাঠির বাড়ি মারল ঠাকুর অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন মাড়োয়ারীকে, 'অমন কথা মুখে বোলো না। যদি বলো তা হলে আর এস না এখানে।'

মাড়োয়ারী তাকিয়ে রইল হাঁ করে। অকারণে দশ হাজার টাকা কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে এ তার ধারণার বাইরে।

'আমার টাকা ছোঁবার জো নেই, কাছেও রাখবার জো নেই। ও তুমি ফিরিয়ে নাও।'

মাড়োয়ারীর বড় সূক্ষ্ম বুদ্ধি। বললে, 'তা হলে এখনো আপনার ত্যাজ্য-গ্রাহ্য আছে? তবে এখনো আপনার জ্ঞান হয়নি?'

ঠাকুর দীনভাবে হেসে বললেন, 'তা বাপু এত দূর হয়নি—'

তখন মাড়োয়ারী ঠিক করলে, হৃদয়ের কাছে দিয়ে যাই।

'খবরদার!' শাসিয়ে উঠলেন ঠাকুর : 'ওকে দিলে আমাকেই টাকার তদারক করতে হবে। একে দে ওকে দে, একে দিলি কেন ওকে দিলি কেন ও সব নানা হ্যাঙগাম পোয়াতে হবে একটানা। কথা না শুনলে রাগ হবে। রাগের থেকেই বুদ্ধিভ্রংশ। ও দরকার নেই বাপু, ও তুমি ফিরিয়ে নাও। টাকা কাছে থাকলেই খারাপ। আরশির কাছে যদি জিনিসের বাধা থাকে তা হলে পড়ে না প্রতিবিম্ব।'

মাড়োয়ারী তখনও দোনামনা করছে। তখন ঠাকুর ভাবলেন একটা পরীক্ষা করা যাক। নবতখানায় পাঠানো যাক সারদার কাছে। তার যদি দরকার হয় সে নিক, সে রাখুক।

বললেন মাড়োয়ারীকে, 'যদি নেয় তো নবতখানায় দিয়ে এস।'

কার পরীক্ষা নিচ্ছেন ঠাকুর? ঠাকুর জানেন না নবতখানায় কে বসে? নির্লেপময়ী নিত্যানন্দা বৈরাগিনী! সর্বাতীতা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদ-কারিণী!

খবর পৌঁছুল সারদার কাছে, মাড়োয়ারী তার জন্যে দশ হাজার টাকার পুঁটলি বেঁধে এনেছে।

গভীর নম্রতার সঙ্গে বললে সারদা, 'যা তিনি নিতে পারেননি তা আমি নিই কিসে? আমার নেওয়া যে তাঁরই নেওয়া হবে। ঐ টাকা যখন তাঁর সেবায় লাগাব তখন তো তাঁরই নেওয়া হল।'

খবর পৌঁছুল ঠাকুরের কাছে। প্রত্যাখ্যান করেছে সারদা।

বড় খুশি হলেন ঠাকুর। ও আমি জানতুম। ও কি যে-সে? ও মহা-বুদ্ধিমতী। ও আমার শক্তি। ও আমার অন্তর্যামিনী ইচ্ছা।

তবু পয়সা-কড়ি সারদাই এক-আধটু নাড়াচাড়া করে। ঠাকুরের চারটি পয়সা দরকার হলে আগ বাড়িয়ে রেখে দেয় চৌকাঠের ওধারে। ঠাকুর

টাকা-পয়সা ছুঁতে পারেন না, যেন হঠাৎ শিং মাছের কাঁটা ফুটেছে এমনি ব্যথায় টনটন করে হাত, বেঁকে যায়, কিন্তু সারদার ওসব কিছুই হয় না। টাকা-পয়সা হাতে পড়ামাত্র সে নিজের মাথায় এনে ঠেকায়। লোককে দেবার সময়ও তাই। আগে নমস্কারটি সেরে পরে উৎসর্গ করে।

তোমাদের মধ্যে কেন এই তারতম্য?

মা সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, 'ঠাকুর আর আমি! আমি যে তাঁর ঘরণী—আমায় যে তিনি সোনার গয়নাও পরিয়েছেন।'

আমার সব সয়, আমি যে সর্বংসহা বসুন্ধরা। মহাপ্রাণরূপিণী মহতী স্থিতিশক্তি।

ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, রাধিরা সব ঘাড়ে পড়েছে, মা'র তখন টাকা-পয়সার দরকার, কিন্তু হাত একেবারে শূন্য। কলকাতা থেকে শরৎ মহারাজ লিখেছেন, যোগাড়যন্ত্র করে টাকা পাঠাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। 'তা হলে আমার শরতের হাতেও টাকা নেই, নইলে সে অমন কথা লিখবে কেন?' মা কাতরনয়নে তাকালেন ঠাকুরের দিকে। 'ঠাকুর, তোমার শেষ আদেশটি কি রাখতে পারব না? রাধি, তোর জন্যে আমি সব খোয়াতে বসেছি। ঠাকুর বলেছিলেন, কারু কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিৎ-হাত কোরো না, তোমার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। একটি পয়সার জন্যে যদি কারু কাছে হাত পাতো, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে। বরং পরভাতা ভালো পরঘোরো ভালো নয়। তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজেদের বাড়িতে আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনো নষ্ট কোরো না।'

মা গো, তুমি বড় না ঠাকুর বড়?

মা'র হাতে এক ভক্ত-স্ত্রী কতগুলো ফুল এনে দিল। তা দেখে মা'র মহা আনন্দ! অমনি সাজাতে বসলেন ঠাকুরকে। ঠাকুরকে মানে ঠাকুরের ছবিকে। ঘট-পট ছায়া-কায়া সব সমান।

'ফুল না হলে কি ঠাকুর মানায়।' মা বলছেন গদ্গদ হয়ে।

কতগুলি আবার নীল রঙের ফুল! আহা, কি সুন্দর! দেখছ কি রঙ! আশ্চর্য!

পুরোনো কথায় চলে গেলেন মা, বললেন, 'আশা বলে একটি মেয়ে আসত দক্ষিণেশ্বরে। কালো-কালো পাতা একটি গাছ থেকে সুন্দর একটি লাল ফুল তুলে এনেছে সেদিন। বলছে, এ্যাঁ, এমন লাল ফুল তার এমন

কালো পাতা! ঠাকুর, তোমার এ কি সৃষ্টি! বলছে আর হাউ-হাউ করে কাঁদছে। সবাই তো অবাক। ঠাকুর বলছেন, তোর হল কি গো, কাঁদছিস কেন? তা কেন কাঁদছে কি বলবে। অনেক কথা বলে বুঝিয়ে ঠাকুর তখন তাকে ঠাণ্ডা করলেন। বলো দেখি, ছিস্টিছাড়া ফুলের জন্যে ছিস্টিছাড়া কান্না!'

অঞ্জলি-অঞ্জলি নীল ফুল ঠাকুরকে দিতে লাগলেন মা, কিন্তু প্রথম-বারেই কয়েকটি ফুল অতর্কিতে নিজের পায়ে পড়ে গেল!

'ওমা, আগেই আমার পায়ে পড়ে গেল!' মা যেন একটু অপ্রতিভ হলেন।

স্ত্রী-ভক্তটি বললেন, 'তা বেশ হয়েছে। তোমার কাছে ঠাকুর বড় হলেও আমাদের কাছে তোমরা দুই-ই এক।'

মাগো, ঠাকুর বড় না তুমি বড়?

'ছি, অমন কথা বলতে হয়?' মা কথাটা চাপা দিলেন। পরে রঙ্গ করবার জন্যে শুধোলেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

ভক্ত বললে, 'তুমি বড়। মহাদেব তো শুয়ে আর কালী মহাদেবের উপর দাঁড়িয়ে। কালী বড়।'

মা মৃদু হাসলেন। বললেন, 'তুমি ঐ নিয়ে থাকো! বোকা ছেলে! আমি যে তাঁর দাসী।'

... পনেরো ...

'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।'

'হ্যাঁ, তাই দিলুম।'

ওমা, তুমি? লক্ষ্মী নয়? দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিলেন ঠাকুর, কিংবা হয়তো উন্মনা ছিলেন, ঠিক-ঠিক লক্ষ্য করেননি কে ঘরে ঢুকল! এমন সময় খাবার নিয়ে আসবার কথা, ভেবেছিলেন লক্ষ্মীই বুঝি এসেছে। 'কিছু মনে কোরো না।' অনুতাপে কুণ্ঠিত হলেন ঠাকুর : 'লক্ষ্মী ভেবে তুই বলে ফেলেছি।'

'তাতে কি হয়েছে!' বললে সারদা, 'ওতে মনে করবার কিছু নেই।'

সারারাত ঘুম হল না ঠাকুরের। পরদিন সকালে নবতখানার দরজায়

গিয়ে হাজির। বললেন, 'দেখ গো, সারা রাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে—কেন এমন রূঢ়বাক্য বলে ফেললুম!'

সেই দিন আর নেই। ভুল করেও খাবারের থালা ঠাকুরের ঘরে নিয়ে যাবার আর অধিকার নেই সারদার। তুই বলতে যাঁর বুকে বাজত তিনি আজ তাকে দূরে-দূরে রেখেছেন। রেখেছেন দরমার খাঁচার মধ্যে।

অথচ কি দোষ করেছি এ প্রশ্নটিও মনের কোণে উঁকি দেয় না। দোষ দেখবার আগেই চিত্ত সন্তোষে ভরে ওঠে। অভিযোগ করবার আগেই এসে যায় অভিবাদন।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে বলছেন শ্রীমা : 'আমি রাধারমণের কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও। আমি যেন কখনো কারু দোষ না দেখি।'

যোগেন-মা মাঝে-মাঝে দোষ দেখতে চায়। তাকে বলছেন, 'যোগেন, দোষ কারু দেখো না। শেষে দূষিত-চোখ হয়ে যাবে। দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখবে কেন? ওতে নিজেরই ক্ষতি। দোষ দেখতে-দেখতে শেষে শুধু দোষই দেখে।'

নবতখানায় বসে-বসে শুধু রান্না করো। রান্না আর রান্না। কত রকমের হুকুম। কালীর ভোগ সহ্য হয় না, তাই ঠাকুরের জন্যে আঝালি। রাম দত্ত গাড়ি থেকে নেমেই বললে, আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব। তিন-চার সের ময়দার রুটি। লাটু ঠেসে দেয় ময়দা, এই যা সুরাহা। রাখাল থাকলে হুকুম হয় খিচুড়ি। নরেনের জন্যে মুগের ডাল আর রুটি হল সেদিন। নরেন দিব্যি বললে, রুগীর পথ্য খেলুম। হুকুম হল, ও কি জোলো খাবার, মোটা-মোটা রুটি আর ছোলার ডাল করো। তাই সই। একবার খেয়ে উঠে আরেকবার খেল নরেন। তবে তার পেট ভরল।

সুরেন মিত্তির মাসে-মাসে দশটি করে টাকা দেয় ভক্ত-সেবায়। বুড়ো গোপাল বাজার করে। সারা দিন ধরে কত নৃত্য, কত কীর্তন, কত ভাব-সমাধি। শুধু দিনটুকু? চলে কখনো রাতভোর।

কিন্তু ডাক নেই সারদার। স্মৃতিময়ী বলছেন করুণকণ্ঠে : 'সামনে বাঁশের চেটাইয়ের বেড়া দেওয়া। তাই ফুটোটুটো করে দাঁড়িয়ে দেখতুম। তাই তো অমনি দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে বাত ধরে গেল।'

তবু কি নির্জনে একটি দীর্ঘশ্বাস আছে? আছে কি বিন্দুমাত্র দোষারোপ?

না। শুধু একটি অমৃত-উচ্ছল পূর্ণঘটের শান্তি। একটি মঙ্গল-রূপিণী শ্রদ্ধা। মাধুর্যরূপিণী তৃপ্তি।

'কি মানুষই এসেছিলেন!' মা বলছেন বিহ্বল হয়ে : 'কত লোক জ্ঞান পেয়ে গেল! কি সদানন্দ পুরুষই ছিলেন! হাসি কথা গান কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকত। আমার জ্ঞানে তো আমি কখনো তাঁর অশান্তি দেখিনি।'

কিন্তু বন্ধ খাঁচায় যে পাখি রুদ্ধ ক্ষোভে পাখা ঝাপটাতে পারত, আশ্চর্য, তারও মুখে হরিকথাকূজন।

লোহার খাঁচার মধ্যে একটি টিয়ে পাখি। মা তাকে গঙ্গারাম বলে ডাকেন। বলেন, 'নাম করো তো গঙ্গারাম।'

গঙ্গারাম 'মা' 'মা' করে। ঠাকুরের শেখানো মন্ত্রটিই জপ করে মিষ্টি করে।

অন্য নাম কিছু বলাতে চাও বিকট আওয়াজ করে উঠবে। প্রতিবাদের আওয়াজ। মা-নামের কাছে হরি-নাম কি! মা'র বাইরে আর দেবতা কোথায়!

খাঁচার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেন মা। প্রসাদী নৈবেদ্য খাওয়ান গঙ্গারামকে। খাওয়া-দাওয়ার পর পান খাচ্ছেন মা, গঙ্গারাম ঠিক নজর রাখছে। পান খাওয়া জিভটি মা খাঁচার ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছেন গঙ্গারামের দিকে, ঠোঁট বাড়িয়ে সে পানটুকু জিভের থেকে তুলে-নিচ্ছে গঙ্গারাম।

পুজো তখনো হয়নি নৈবেদ্য থেকে মোহনভোগ তুলে নিলেন মা। তুলে নিয়ে গঙ্গারামের দিকে হাত বাড়ালেন। বললেন, 'গঙ্গারাম, খাও বাবা।'

গঙ্গারাম এমন ভক্ত, ঠোঁট বাড়িয়ে খেল সেই মোহনভোগ।

সবাই আপত্তি করলে, 'পুজো হয়নি, আগেই গঙ্গারামকে হালুয়া দিলেন।'

স্নিগ্ধ হেসে মা বললেন, 'বাবা, ওর ভেতরেই ঠাকুর রয়েছেন।'

একটা পাখি পর্যন্ত ঈশ্বরমন্ত্র পড়ছে, অথচ রাধি আর তার পাগলী-মা'র মুখে গালাগাল ছাড়া আর কিছু নেই।

'কি পাপে যে আমার এমন হচ্ছে কে জানে।' মা বলছেন তপ্ত হয়ে : 'হয়তো শিবের মাথায় কাঁটাশুদ্ধ বেলপাতা দিয়েছি। সেই কণ্টকে আমার এই কণ্টক।'

রাধুর ছেলে হয়েছে কিন্তু দুর্বলতা যায়নি। দাঁড়াতে পারে না, বসে-বসে চলাফেরা করে। তারপর আবার আফিং ধরেছে। মাত্রাটা একটু কমাবার চেষ্টা করেন মা কিন্তু রাধুর ভীষণ গোঁ।

মা তরকারি কুটছেন, আফিঙের জন্যে রাধু এসে বসেছে চুপি-চুপি। এসেছে তেমনি ঘষটে-ঘষটে।

'রাধি, আর কেন, উঠে দাঁড়া।' মা ধমক দিয়ে উঠলেন : 'তোকে নিয়ে আর পারিনে। তোকে নিয়ে আমার ধর্মকর্ম সব গেল। এত খরচপত্র কোথা থেকে যোগাই বল দেখি?'

রাধু রেগে উঠল। তরকারির ঝুড়ি থেকে একটা বড় বেগুন তুলে নিয়ে মা'র পিঠে মারল দুম করে।

পিঠ বাঁকিয়ে মা আর্তনাদ করে উঠলেন। দেখতে-দেখতে মারের জায়গাটা ফুলে উঠল।

তবু কি রাধুর উপর রাগ আছে মা'র? ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে জোড়হাতে বলছেন, 'ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না, ও অবোধ।' নিজের পায়ের ধুলো নিয়ে মাখিয়ে দিলেন রাধুর মাথায়-কপালে। বললেন, 'রাধি, এই শরীরকে ঠাকুর কোনোদিন একটিও শাসনবাক্য বলেননি, আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস? তুই কি বুঝবি আমি কে, আমার স্থান কোথায়?'

নির্মানমোহা ক্ষমা। করুণাদ্রবা নির্ঝরধারা। স্বতঃশুদ্ধা সহ্যশক্তি।

রাধি ঝামটা দিয়ে উঠল : 'তুই স্বামীর কি জানিস? স্বামীর মর্ম বুঝেছিস তুই কোনোদিন?'

যিনি প্রলয়ঙ্করী, চণ্ডমুণ্ডবিখণ্ডিনী তিনিই আবার করুণাপাঙ্গা, হসন্মুখী। বললেন হাসিমুখে, 'তাই তো রে—ঠিক বলেছিস। আমার স্বামী তো ছিলেন ন্যাংটা সন্ন্যাসী।'

আমি তাঁরই মনোজবা। সেই জবাটি নিত্য সন্তোষে আরক্তিম।

এই রাধুর জন্যে আবার মায়া কত!

অসুখ করেছে রাধুর। চিন্তার মেঘে মুখখানি মলিন হয়েছে মা'র। বলছেন, 'আমি থাকতেই ওর ভালো হল না, তা এর পর কে আর ওকে দেখবে? তা হলে ও আর বাঁচবে কি?'

মা'র এত মায়া! যোগেন-মা'র কেমন-যেন সন্দেহ হল। ঠাকুর অমন ত্যাগী ছিলেন আর মাকে দেখছি ঘোর সংসারী। ভাই ভাই-পো ভাই-ঝি নিয়েই ব্যস্ত।

গঙ্গার ঘাটে ধ্যান করতে বসেছে মনে হল ঠাকুর যেন বলছেন কাছে দাঁড়িয়ে, গঙ্গায় কি ভাসছে দেখ দিকি।

যোগেন-মা চোখ চেয়ে দেখে একটা মৃত শিশু যাচ্ছে ভেসে। নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে রয়েছে ছেলেটার। ঠাকুর বললেন, 'গঙ্গা কখনো অপবিত্র হয়? না তাকে কিছু স্পর্শ করে? ওকেও তেমনি জানবে। মায়ায় জড়াবে কিন্তু কোনোদিন ম্লান হবে না।' নিজের দিকে ইশারা করলেন : 'একে আর ওকে অভেদ জানবে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ রাখবে না।'

যোগেন-মা ছুটে এসে মা'র পায়ে পড়ল। কাকুতি করে বললে, 'আমায় ক্ষমা করো মা।'

'কেন, কি হল?'

'তোমাকে সন্দেহ করেছিলুম। তোমার উপর অবিশ্বাস এসেছিল—'

'তাই নাকি?' নির্মল রৌদ্রে নীল আকাশের মত প্রসন্নোজ্জ্বল চোখে মা তাকিয়ে রইলেন।

'কিন্তু ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন—'

'তার আর কি হয়েছে? অবিশ্বাস তো আসবেই। সেই তো কষ্টি-পাথর। একবার সংশয়, আরেকবার বিশ্বাস, এই না হলে বিশ্বাস পাকা হবে কেন? এ না হলে আর বিশ্বাসের দাম কি।'

হরির মা বলে একটি প্রৌঢ়া বিধবা আসে রোজ মা'র কাছে। যত রাজ্যের সংসারের ঝগড়া-ঝাঁটির গল্প করে। যত সব নীচতা আর ক্ষুদ্রতার কাহিনী। পরে বললে, 'কি করবো মা। এ তো আর ছাড়া যায় না। আপনিই বা কই রাধুকে ছাড়তে পারলেন বলুন—'

'আমার কথা ছেড়ে দাও, হরির মা—' অদ্ভুত করে হাসলেন মা। সেই হাসিতে সব কথা স্তব্ধ হয়ে গেল।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে পা মুছে বিছানায় বসে বললেন, 'ওরা কি বুঝবে! আমায় বলে রাধির উপর টান! যাদের ঘরে জন্ম নিয়েছি তাদের দেখতে হয়। ঋণ তো কারুর রাখতে নেই। তা না হলে রাধি-টাধি আমার কে! ঠাকুর যে তাঁর মা'র সেবা কত করেছেন, রামলালকে ঢুকিয়েছেন কালীঘরে—এ সবের মানে কি?'

এ সবের মানে, নির্লিপ্ত হওয়া নয়, সংসারের রূপে-রসে লালিত হওয়া। রসে-বশে মানুষ হওয়া। সংসার ছেড়ে বাহ্যসন্ন্যাসে স্বর্গসন্ধান করা নয়। বাহ্যসন্ন্যাস ছেড়ে সংসারকে স্বর্গে রূপান্তরিত করা। সংসারের

ছোট-বড় কাজে ঈশ্বরের সেবাচর্যা করা। পরমতম আনন্দের আস্বাদ করা। ঠাকুরেরও হরে-প্যালা, হাবির মা ছিল, মা'রও তেমনি রাধু-মাকু। এই সংসারই সাধনার নব পীঠস্থান। এই জন্যেই তো শ্মশানবাসিনী হয়েও সংসার করছেন মহামায়া। সমস্ত তীর্থজলে ঘটটি পূর্ণ করে স্থাপন করেছেন সংসারের মণ্ডমূলে।

মন্ত্রটি মা, মূর্তিটি সারদা, আর পীঠস্থানটি সংসার।

আবার এই সংসারে, দক্ষিণেশ্বরের সংসারে বৃন্দে-ঝিও আছে। নবতে বসে ধ্যান করছে সারদা, একেবারে তার সামনে বৃন্দে-ঝি একটা কাঁসি ছুঁড়ে ফেলল সেদিন। ইচ্ছে করে ঠেলা মেরেই ফেলল হয়তো। ভাবখানা হয়তো এই, ভাবের নিকেশ করে দি।

শব্দটা বজ্রের মত লাগল সারদার বুকে। সারদা কেঁদে ফেললে।

গোনাগুনতি লুচি চাই বৃন্দে-ঝির। তার বরাদ্দের লুচি যদি কোনো-দিন খরচ হয়ে যায়, তবে সে অনর্থ বাধায়। তার জিভ সকসক তো করেই লকলকও করে।

হয়তো ছেলেরা এসে পড়েছে, বৃন্দে-ঝির বরাদ্দ লুচিতে টান পড়েছে। আর যায় কোথা! অমনি শুরু হল বকুনি : 'ওমা, কেমন সব ভদ্দরলোকের ছেলে গো—'

পাছে ছেলেরা শোনে তাতে আবার ঠাকুরের ভয়। অপরাধীর মত নবতে এসে দাঁড়িয়েছেন ভোরবেলা। বলছেন, 'ওগো বৃন্দের খাবারটি তো খরচ হয়ে গেছে!'

সর্বনাশ!

'তা তুমি তাকে নতুন করে রুটি-লুচি যা হয় করে দিও। নইলে এখুনি এসে বকাবকি শুরু করবে। দুর্জনকে পরিহার করাই উচিত।'

বৃন্দে কি শোনে!

তখন সারদা তাকে নানাভাবে বোঝাতে শুরু করে। তৈরি খাবার যখন নেবেনি তখন সিধে সাজিয়ে দি। তবে বৃন্দে নিবৃত্তি মানে।

ঠাকুরের সংসার। তাঁর সংসারের কাজ করা মানেই তাঁকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়া, তাঁর পুজো করা। তিনি অরণ্যেও আছেন সংসারেও আছেন। কিন্তু সংসার ছেড়ে অরণ্যে গেলেন না আর-পাঁচজনের মত। তিনি অরণ্য ছেড়ে সংসারে এলেন।

রামকৃষ্ণ সর্বাভিনব। সর্বাধুনিক।

তাঁর এই বিপ্লবের জোর কোথায়? তাঁর এই সাধনার ভিত্তি কি?

উত্তর, সারদা। সংসার-সারদাত্রী মাতৃমূর্তি। যদি সারদা না থাকত, রামকৃষ্ণ আর-পাঁচজনের মতই আংশিক হয়ে থাকতেন। সারদাকে নিয়েই তিনি সম্পূর্ণ। সারদাকে নিয়েই তিনি সমস্তসুন্দর।

... ষোলো ...

বৃন্দে-ঝি এসে খবর দিলে, ঠাকুর ডাকছেন।

আমাকে? এ কখনো হতে পারে?

হ্যাঁ, কি মালা দিয়েছ কালীর গলায়, তাই দেখে ঠাকুর মহাখুশি। বলছেন, ও এসে একবার দেখে যাক।

রঙগন আর জুঁই দিয়ে সাত-লহর গড়েমালা গেঁথেছিল আজ সারদা। মাকে পরাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল মন্দিরে। কি খেয়াল হল সাজকারের, গায়ের গয়না সব খুলে ফেলে মাকে শুধু ফুলের মালা দিয়ে সাজালো। ঠাকুর দেখতে এসে একেবারে ভাবে বিভোর। 'আহা, কালো রঙে কী সুন্দরই যে মানিয়েছে! এমন মালা কে গেঁথেছে রে?'

আর কে! যাঁর মালা তিনিই গেঁথেছেন।

'আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস গো!' ঠাকুর বললেন আকুল স্বরে, 'মালা পরে মায়ের কী রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক।'

যাই এই ফাঁকে ঠাকুরকে একটু দেখে আসি। নয়নচকোর দিয়ে গগনের সেই সুধাকরকে।

নিজেকে আরো ঢেকে নিল সারদা। বৃন্দে-ঝির আড়ালে-আড়ালে এগুতে লাগল মন্দিরের দিকে।

ওমা, এদিকে যে আসছেন আর কারা। বলরাম আর সুরেন। এখন আমি কোথায় লুকুই! কোথায় নিজেকে মুছে ফেলি! ত্রস্ত হাতে বৃন্দে-ঝির আঁচল টেনে নিল সারদা। তাতে আরেক প্রস্ত ঢাকা দিলে নিজেকে। সামনের দিক ছেড়ে দিয়ে উঠতে গেল পিছনের সিঁড়ি দিয়ে।

সেখানে আবার বাধা। ঠাকুর ঠিক চোখটি রেখেছেন। বলে উঠলেন, 'ওগো ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছুনি উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল পা পিছলে। কি হয়েছে, সামনের দিক দিয়েই এসো না—'

বলরামরা সরে দাঁড়াল। সারদা তখন এল সম্মুখ দিয়ে। তাকালো কালীর দিকে।

ঠাকুর তখন ভাবে-প্রেমে গান ধরে দিয়েছেন। সারদা দেখল কালীর মুখেই ঠাকুরের মুখ আঁকা।

আহা, সেই গান! যেন সুধার স্রোত বয়ে চলেছে। তার উপরে ভাসছেন ঠাকুর। সে গানে কান ভরে আছে সারদার। কানের ভিতর দিয়ে এসে মরমে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

'এখন যে গান শুনি সে শুনতে হয় তাই শুনি।' বলছেন শ্রীমা। 'আর নরেনের সে কী পঞ্চমেই সুর ছিল। আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুসুড়ির বাড়িতে। বলেছিল, মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই। আমি বললুম, সে কি? তখন তাড়াতাড়ি বললে, না না, আপনার আশীর্বাদে শিগগিরই আসব। আর গিরিশবাবু?—আহা, এই সেদিনও গান শুনিয়ে গেলেন। কী সুন্দর গান—'

বলরাম বোসের বাড়িতে তখন আছেন, একদিন ছাদে উঠেছেন বেড়াতে। বিকেলবেলা। গিরিশ ও তার স্ত্রীও সে সময় ছাদে উঠেছে। এক ছাদ থেকে দেখা যায় আরেক ছাদ। গিরিশের স্ত্রী বললে গিরিশকে, 'ঐ দেখ ও বাড়ির ছাদে মা বেড়াচ্ছেন।'

গিরিশ তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দাঁড়াল। চোখ বুজল। বললে, 'না, না, আমার পাপনেত্র, এমন করে মাকে দেখব না লুকিয়ে।' বলতে-বলতে দ্রুত পায়ে নেমে গেল নিচে।

এই গিরিশই একদিন ঠাকুরকে বললে, তুমি পুত্র হয়ে জন্মাবে আমার ঘরে। ঠাকুর উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, বয়ে গেছে আমার তোর ছেলে হয়ে জন্মাতে।'

কে জানে, ঠাকুরের দেহ যাবার পর গিরিশের ছেলে হল একটি। চার বছর বয়েস হল অথচ কথা হয় না। হাব ভাবে সব প্রকাশ করে। গিরিশ তো তাকে পেয়েই কৃতার্থ, বলে এই আমার ঠাকুর রামকৃষ্ণ। ঠাকুরের মত সেবা করে তাকে। তার জন্যে আলাদা কাপড়-জামা আলাদা রেকাব-বাটি। সাধ্য নেই কেউ তা দু-আঙুলে স্পর্শ করে।

একদিন সেই ছেলে মাকে দেখবার জন্যে ভীষণ অস্থির হল। সকলকে টানছে আর উ-উ করে দেখিয়ে দিচ্ছে উপরের দিকে। কেউ তত খেয়াল

করেনি। শেষে একজন বুঝিয়ে দিলে, মাকে বোধহয় দেখতে চায়। কোলে করে নিয়ে এল সেই ছেলেকে, উপরে, যেখানে মা বসে আছেন। কোলে থাকবে না, নেমে পড়ল জোর করে। নেমে পড়েই সেই ছেলে মা'র পায়ের তলায় পড়ে প্রণাম করলে। শুধু তাই নয়, আবার নিচে নেমে গিরিশের হাত ধরে টানাটানি করতে শুরু করল। ভাবখানা এই, দেখবে চলো, উপরে কে বসে আছে।

তার কাতরতা দেখে গিরিশের সে কি হাউ-হাউ কান্না! 'ওরে আমি মাকে দেখতে যাব কি! আমি যে মহাপাপী।'

মা'র কাছে আবার সন্তানের পাপ কি! ছেলে তাই ছাড়ে না বাপকে। তখন বাধ্য হয়ে গিরিশ ছেলে কোলে নিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে উপরে উঠে এল। দু-চোখে জল গড়াচ্ছে অবিরল, ছেলে আর বাপ—দুজনেই ঠিক চার বছরের শিশু।

এসেই মা'র পায়ের নিচে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল। ছেলেকে দেখিয়ে বললে, 'মা, এ হতেই শ্রীচরণ দর্শন হল আমার।'

এই গিরিশের প্রথম দর্শন। প্রথম সম্ভাষণ।

আর, নরেন, নরেন আমার খাপ-খোলা তলোয়ার।

মঠে প্রথম দুর্গাপূজার সময় তার গর্ভধারিণী মাকেও এনেছিল সঙ্গে করে। সে চারদিক ঘুরে বেড়ায় এ-বাগান ও-বাগান দেখে, আর লঙ্কা তোলে বেগুন তোলে। ভাবে এ সব আমার নরুর করা। নরেন বললে, 'তুমি এ সব করছ কি? মায়ের কাছে গিয়ে চুপটি করে বোসো না। লঙ্কা ছিঁড়ে বেগুন ছিঁড়ে কি হবে? তুমি বুঝি ভাবছ এ সব তোমার নরু করেছে। মোটেই নয়, যিনি করবার তিনি করেছেন।'

'মাতাঠাকুরাণীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন।' গাজীপুর থেকে নরেন চিঠি লিখছে বলরাম বোসকে : 'আমি কোন নরাধম তাঁহার সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কথা কহি!...মাতাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি-কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্বাদ করিতে বলিবেন, যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।'

'যারা আমার অন্তরঙ্গ তারাই আমার ব্যথার ব্যথী।' বলেন ঠাকুর ছেলেদের দেখিয়ে, 'এরা আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। এমন কি শম্ভু, বলরাম, সুরেন—'

ঠাকুরের সব রসদদার। দক্ষিণেশ্বরে, কালীঘরে ধ্যান করবার সময় কালীর পিছনে দেখলেন শম্ভুকে। বলরামকেও দেখলেন ধ্যানে, মাথায় পাগড়ি, গৌরবর্ণ।

সেই বলরামের স্ত্রীর অসুখ করেছে।

ঠাকুর তলব দিলেন সারদাকে। বললেন, 'যাও দেখে এসো গে—'

সারদা শুধু বললে নম্রভাবে, 'যাব কিসে?'

একটু কি কুণ্ঠা, অনিচ্ছা ছিল কথাটিতে? ঠাকুর প্রায় তর্জন করে উঠলেন, 'আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে, আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে। যাও, হেঁটে যাও।'

তাই যাব। যেমন বলবে তেমনি যাব। খুব পারি হাঁটতে। কত হেঁটেছি।

কিন্তু কোথা থেকে কে জানে এক পালকি এসে হাজির। যিনি পৌঁছনো তিনিই আবার পথ।

বারান্দায় বসে আছেন মা, একটি ভিখিরি মেয়ে এসে প্রণাম করলে। হাতে একটি পেয়ারা। বললে, 'মা, এটি আজ ভিক্ষায় পেয়েছি। তাই এনেছি আপনার জন্যে। দিতে সাহস হচ্ছে না, মা। দেব?'

'আহাহা, দাও।' হাত বাড়িয়ে পেয়ারাটি তুলে নিলেন মা। বললেন, 'ভিক্ষার জিনিস খুব পবিত্র। ঠাকুর খুব ভালোবাসতেন। বেশ পেয়ারাটি, আমি খাব'খন।'

ভিখারী মেয়ের আর কি চাই! তার চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, 'আমি আপনার ভিখারিনী মেয়ে, আমার উপর এত দয়া!'

ভিক্ষায় যে ফলটি পেয়েছে তাই মাকে দিয়ে গেল খুশি হয়ে। একেই বলে ফলত্যাগ।

ডাব চিনি আর দক্ষিণার পয়সা দিয়ে দিলেন ভক্তের হাতে। বললেন, 'যাও মন্দিরের মাকে গিয়ে দিয়ে এস। মনে-মনে বোলো, মা, ফলটি নাও আর ফলের যে ফল সেটিও নাও।'

এমন ভাবে দাও যেন দানের আকাঙ্ক্ষার ছায়াটুকুও না মনের গায়ে লেগে থাকে!

শিরোমণিপুর থেকে একটি স্ত্রীলোক এসেছে মা'র কাছে, জয়রাম-বাটিতে। ছেলের এখন-তখন অসুখ, মা'র পাদোদক খেলে ভালো হবে এই বিশ্বাস। ভাঁড়ে করে জল নিয়ে এসেছে, আর বলামাত্র মা তাতে তাঁর পায়ের

বুড়ো আঙুল ডোবাবার উপক্রম করেছেন। এমন সময় এক ভক্ত এসে মা'র পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে দেবে না আঙুল ডোবাতে। স্ত্রীলোকটিকে বললে, 'তুমি বাছা তোমার ছেলের চিকিৎসা করাও গে, কিংবা আর যার থেকে হোক নাও গে পাদোদক। মা'রটি পাবে না।'

স্ত্রীলোকটি তাকিয়ে রইল হতাশের মত।

মা দিতে চান অথচ ভক্তেরা নারাজ।

'না, মা, দিও না বলছি।' আরেক ভক্ত এসে জোর দিল। 'একে বাতে ভুগছ, তায় আবার কি অসুখ করে বসে ঠিক নেই। কর্তাভজারা ঐ রকম পায়ের বুড়ো আঙুল চোষে শুনেছি। এ আরেক নতুন জ্বালা।'

মুখখানি ম্লান করে স্ত্রীলোকটি সরে দাঁড়াল এক পাশে। মা তাকে কাছে ডেকে এনে বললেন, 'তুই মা চুপিচুপি কেন এলিনি? তা হলে তো পেতিস। এখন ছেলেরা জানতে পেরেছে, আর কি হয়? ওদের অমতে কি কিছু করতে পারি? গাঁয়ে তো অনেক বামুন আছে, তাদের কারু থেকে চেয়ে নে গে যা! আমি বলছি, তোর ভয় নেই, তোর ছেলে ভালো হয়ে যাবে।'

আর কি চাই! জল নিতে এসেছিল, জয় নিয়ে চলে গেল!

করুণা কি শুধু মানুষের জন্যে?

পাগলী-মামী তার এক আত্মীয়কে খাওয়াচ্ছে। বারান্দায় জায়গা করেছে, রেখেছে জলের গ্লাশ। অমনি এক বেড়াল এসে সে জলে মুখ দিলে। আবার নতুন করে জল দিলে পাগলী-মামী। ওমা, সে জলেও মুখ দিলে বেড়াল। সে জলও ফেলা গেল। তৃতীয়বার জল এল গ্লাশ-ভরা। কি সর্বনাশ, এবারও কোন সুযোগে পাশে থেকে এসে মুখে ঠেকাল। আর যায় কোথা!

পাগলী-মামী তেড়ে এল। 'পোড়ারমুখো বেড়াল, তোকে আজ মেরে ফেলব তবে অন্য কথা।'

মা বাধা দিলেন। বললেন, 'চৈত্র মাস, বাধা দিও না পিপাসার সময়।'

'তোমাকে আর বেড়ালকে এত দয়া দেখাতে হবে না।' পাগলী-মামী মুখভঙ্গি করলে : 'মানুষকেই কত দয়া করছেন!'

মা'র মুখখানি গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, 'যার উপর আমার দয়া নেই, সে নেহাত হতভাগ্য। কিন্তু কার উপর যে নেই তাও তো খুঁজে পাই না—'

সর্বপরিব্যাপিনী মা। পৃথিবরূপিণী মা। রুণাভারনম্রা মা। শরাদন্দুকরাকারা।

শ্রাবণ মাস, বৃষ্টিতে পথ-ঘাট পিছল হয়ে গিয়েছে। জয়রামবাটিতে মা'র কাছে এসেছে একজন সন্ন্যাসী-ছেলে। মা খুশি হয়ে উঠলেন। 'এসেছ? এমুখো হয়নি কেউ অনেক দিন। বাজার-টাজার হয়নি। আজ কিছু বাজার করে দিয়ে যেও।'

সন্ন্যাসী-ছেলে দেখলে, মহা ভাগ্য। হৃষ্ট মনে বাজারে গেল আর এক ধামা সওদা করলে। প্রায় এক মণের মত। দোকানদার বললে, একটা মুটে ডেকে দি। মা বাজার করে আনতে বলেছেন, মুটের মাথায় করে আনতে হবে বলে দেননি এমন কথা। তাই সন্ন্যাসী বললে, না, মুটের দরকার হবে না, আমিই পারব। ঝুড়িটা আপনি দয়া করে আমার মাথার উপর তুলে দিন।

ঝুড়ি মাথায় নিয়ে দেখল পর্বতের মতন ভারি। উপায় নেই, মা'র আদেশ, যেতে হবে বোঝা নিয়ে। সহসা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এক হাতে আবার ছাতা ধরো ঝুড়ির উপর। নইলে আটা-ময়দার লেশ থাকবে না। ছাতা ধরলে কি হবে, পায়ের নিচে পথও সরে-সরে যাচ্ছে। কিন্তু পা পিছলালে চলবে না, চলবে না ঘাড় বেঁকালে। মা গো, শক্তি দাও, তোমার বোঝা যেন নিয়ে যেতে পারি তোমার পায়ে।

মুহূর্তে বোঝা হালকা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী-ছেলে অনুভব করল, পর্বত যেন তুলো হয়ে গিয়েছে।

বোঝা-মাথায় প্রায় ছুটতে-ছুটতে চলে এল মা'র দুয়ারে। এসে দেখে মা দ্রুত পায়ে ঘরের বারান্দায় ছুটোছুটি করছেন, একবার পুব থেকে পশ্চিমে আবার পশ্চিম থেকে পুবে। হাঁপিয়ে পড়েছেন ক্লান্তিতে, সমস্ত মুখ লাল, দু চোখ যেন ঠেলে উঠেছে কপালে। ছুটোছুটি করছেন, আর বলছেন আপন মনে, কেন একটা মুটে নিতে বললুম না—কেন একটা—

ছেলের সমস্ত ক্লেশ নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। সমস্ত ভার নিজে টেনে নিয়ে হালকা করে দিয়েছেন ছেলেকে।

মা'র পায়ের কাছে বোঝা নামিয়ে দিল ছেলে। মা হাঁপ ছাড়লেন। তিরস্কার করে উঠলেন, 'কি তোমার বুদ্ধি! এত বড় বোঝা, একটা মুটে নিলে না? এ আমাকে বলে দিতে হবে? আমি বলিনি, তাতে কি হল? তোমার বুদ্ধি হল না? দেখ দেখি আমার কেমন ক্লান্ত হতে হয়েছে!'

...সতেরো...

'মন তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?' পায়ে বাত ধরে গেছে, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে, তবু সারদা দরমার বেড়ার সেই ছিদ্র থেকে চোখটি সরিয়ে নেয় না। বড়-বড় থামের আড়াল পড়ে যায়, দেখা যায় না সেই নয়নমনোহরকে, তবু এই নিয়ত আকৃতি, মন, তুই কি এত ভাগ্য করেছিস—?

যেন কত অযোগ্য, কত অভাজন, কত দীনহীন—এমনি এক আত্যন্তীন কাতরতা। এ কি তাই? যে অশেষ ঐশ্বর্যে সমারূঢ়া, জগদব্যাপিকা আনন্দ-রূপা, বিশ্বেশীসিংহাসনা—এ তার দুঃখনিবেদন? যেন কত নির্যাতিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত—তাই কি শোনাচ্ছে? তবে যিনি উপেক্ষা করছেন তাঁরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা কেন? এ কখনো শুনেছে কেউ? যে অন্যায়াচারী সেই আকর্ষণ করবে, আকাঙ্ক্ষনীয় হয়ে থাকবে? তারই জন্যে নয়নে ভরে থাকবে দর্শনের পিপাসা? যে বনবাসে রেখেছে তারই জন্যে অনুরাগ?

আসলে, এ কি কান্না? এ কি নালিশ? যে মেরুকিরীটভারা সমুদ্রকাঞ্চী পৃথিবী, তার আবার খেদ কিসের? সে তো মূর্তিমতী মৌন।

আসলে, এ একটি যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণ। তপস্যার হোমশিখা।

পার্বতী যখন মহাদেবের ধ্যান ভাঙতে চাইলেন, পঞ্চশরের শরণাপন্ন হলেন। পঞ্চশর ভস্ম হয়ে গেল। পার্বতী তখন অপর্ণা সাজলেন। প্রাপ্তির মধ্যে বৃহত্ত্ব আনতে হলে পদ্ধতির মধ্যেও মহত্ত্ব আনতে হবে। দুঃসাধ্য মূল্যে দিয়ে তাকে পেতে হবে বলেই তো সে দুর্লভ। যদি অল্পমূল্যে পাওয়া যায় সে অল্পজীবী হয়ে থাকে। যে আমার না-পাওয়ার ধন তাকে চিরন্তন চাওয়ার মধ্যেই যে আমার পরম পাওয়া সেটিই অনির্বাণ দীপশিখা করে রাখলুম জ্বালিয়ে। এইটিই আমার যোগসাধন।

সারদা অপর্ণা সাজল।

জ্বালিয়ে রাখল একটি প্রেমের দীপভান্ড। শিখাটি প্রতীক্ষার। নিষ্কম্প, নির্ধূম। যে জ্যোতিটি বিকিরিত হচ্ছে সেটি পরমানন্দের আভাতি।

তাই কান্না নয়, বিলাপ নয়, নবযুগের বেদসূক্ত।

'হ্যাঁ গা, আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?' মাঝে-মাঝে এসে জিগগেস করেন ঠাকুর।

যেন একটি গভীর পরিপূর্ণতা কথা কইছে, তেমনি সুরে সারদা বলে, 'না, তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ।'

কি খেয়াল হল, খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর সেদিন নবতে এসে হাজির। ব্যাপার কি? বটুয়ায় মশলা নেই। সারদার আনন্দ তখন দেখে কে, প্রত্যক্ষ সেবার বুঝি একটু সুযোগ পেল। দুটি যোয়ান-মৌরি খেতে দিল ঠাকুরকে। এ খাওয়া তো এক্ষুনি ফুরিয়ে যাবে—লোভ হল, রাত্রেও যেন দুটি খান, খাবার সময় সারদার কথা যেন একটু মনে করেন। কাগজে মুড়ে আরো দুটি মশলা ঠাকুরের হাতে দিল সারদা। বললে, নিয়ে যাও। পরে খেও।

বৃষ্টি ফুরিয়ে গেছে, তবু গাছের পাতার কাঁপনে ফোঁটা-ফোঁটা কত-গুলো জল প'ড়ে বৃষ্টিকে আবার একটু মনে করিয়ে দেওয়া।

মশলার পুঁটলি নিয়ে ঠাকুর চললেন তাঁর নিজের ঘরে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর রাস্তা ভুল হয়ে গেল। ঘরে না গিয়ে সোজা গঙ্গার ধারের পোস্তার দিকে চলে গেলেন। যেন বেহুঁস, ঠাহর হচ্ছে না দিশপাশ। 'মা ডুবি', 'মা ডুবি' বলতে-বলতে প্রায় গঙ্গায় নেমে পড়েন আর কি। বন্দিনী সারদা ছটফট করতে লাগল, কাকে ডাকি, কাকে দেখাই! কি ভাগ্যি, মা-কালীর একটি বামুন যাচ্ছে এদিক দিয়ে, তাকে সারদা বললে ব্যস্ত হয়ে, 'শিগগির হৃদয়কে ডাকো।'

হৃদয় খাচ্ছিল, এঁটো হাতেই ছুটে এল খাওয়া ফেলে। সবলে ধরে ঠাকুরকে তুলে নিয়ে এল জল থেকে।

পাড়ে এসে ঠাকুর ভাবলেন, এমনটি হল কেন? কেন পথ ভুললুম?

মুহূর্তে উত্তর প্রতিভাত হল। ও, সঞ্চয় করেছি যে। পরের বেলার কথা ভেবে মশলা নিয়েছি পুঁটলি বেঁধে।

আর দ্বিধা করলেন না। মশলার পুঁটলি ফেলে দিলেন ছুঁড়ে। সারদার চোখের সামনে পড়ে রইল মাটিতে।

তবু মনের মধ্যে অহরহ সেই সন্তোষবাণী : 'মন তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?'

এই যে বসে আছি, আমি কি পথ হারিয়েছি?

একটি মেয়ে মাকে একবার লিখলে, মা আমি কি পথ হারিয়েছি? উত্তরে মা লিখলেন, পথ কি কেউ হারায়? পথ পাবার জন্যেই তো পথ।

এক ভক্ত ঝুড়িতে করে কতগুলো পদ্মফুল নিয়ে আসছে। দূর হতে

পরিচিত একজনকে দেখে ফুলশুদ্ধ হাত তুলে নমস্কার করলে। মা দেখতে পেয়েছেন। বললেন, 'ও ফুল দিয়ে আর ঠাকুরের পুজো হবে না। ওগুলো ফেলে দাও।'

একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে লোভালু চোখে নৈবেদ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনো ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়নি, শুধু থালা সাজানো হচ্ছে, এখুনি লোভদৃষ্টি। মা সে নৈবেদ্য দিলেন না পুজোয়। কিন্তু এ ভাবটি রইল না বেশি দিন। পরে আবার যখন নৈবেদ্যের থালায় অমনি লুব্ধ চোখের ছায়া ফেলেছে ঐ ছেলে মা সানন্দে তার থেকে খাবার তুলে তাকে খেতে দিচ্ছেন। ওকি, এখনো যে নিবেদন করা হয়নি ঠাকুরকে। তা হোক। মা বললেন, 'ওর মধ্যেই ঠাকুর আছেন।' বলে সেই নৈবেদ্যের থালাই ধরে দিলেন পুজোয়।

একটি মেয়ে এসেছে কিন্তু তার শোবার বালিশ নেই। মা তাঁর মাথার বালিশটি স্বচ্ছন্দে তার ঘাড়ের নিচে গুঁজে দিলেন। না মা, বালিশ লাগবে না। 'লাগবে, শান্তিতে ঘুমোও,' মা বললেন, 'তোমার মধ্যেই ঠাকুর আছেন।'

'ও মা নন্দরাণী, অন্ধজনে দয়া করো মা—' দুয়ারে এক ভিখিরি এসে দাঁড়িয়েছে।

গোলাপ-মা বললে, 'ওরে সঙ্গে-সঙ্গে একবার রাধাকৃষ্ণের নামটিও কর। গৃহস্থেরও কানে যাক, তোরও নাম করা হোক। তা নয়, অন্ধ-অন্ধ করেই গেলি—'

পর দিন আবার এসেছে ভিখিরি। বলছে, 'রাধাগোবিন্দ, ও মা নন্দ-রাণী, অন্ধজনে দয়া করো মা—'

সঙ্গে-সঙ্গে কাপড় আর পয়সা।

সেদিন এক ভিখিরি এসে ভিক্ষে চাইতেই নিচের ভক্তরা তাড়া দিয়ে উঠল : 'যা, এখন দিক করিস নে।'

মা'র কানে গেছে। বলছেন, 'দেখেছ? দিলে ভিখিরিকে তাড়িয়ে। ঐ যে একটু উঠে এসে ভিক্ষে দিতে হবে এটুকু আর পারলে না। এক মুঠো তো ভিক্ষে, ওর প্রাপ্য, তা ওকে দিলে না। যার যা প্রাপ্য তার থেকে তাকে কি বঞ্চিত করা উচিত? এই যে তরকারির খোসা, এ গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়।'

'কারু কাছে কিছু চেয়ো না।' মেয়ে-ভক্তদের বলছেন মা, 'বাপের কাছে

তো নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়। যে চায় সে পায় না। যে চায় না সে পায়।'

কোনোদিন চাননি কিছু মা। তাই সব তাঁর অঢেল। সব তাঁর ভরা-ভাণ্ডার।

দুঃস্থদের জন্যে সেবাশ্রম হয়েছে, কিন্তু, আশ্চর্য, তাতে বড়লোকের ভিড়। বিনাব্যয়ে ওষুধ নেবার কারসাজি। দেখেশুনে রাখাল খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এসেছে মা'র কাছে। বলছে, 'যারা অনায়াসে নিজের খরচে চিকিৎসা করাতে পারে তারা এখানে আসবে কেন? এ তো শুধু গরিবদের জন্যে। মা, আপনি বলুন, বড়লোকদের কি ওষুধ দেব, করব চিকিৎসা?'

মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, সব করবে। আমাদের সব সমান, গরিবই বা কি বড়লোকই বা কি। তা ছাড়া বাবা যে চায় সেই তো গরিব।'

একটি লোক এসেছে মশুরকলাই বিক্রি করতে। 'মা, আমি আট আনার নেব।' একটি ভক্ত-মেয়ে এসেছিল মা'র কাছে সে বললে।

'বেশ তো আমি বলে দিচ্ছি।' বললেন মা।

ভক্ত-মেয়েটির স্বামী সঙ্গে ছিল। সে টিটকিরি দিয়ে উঠল : 'মা'র কাছে কি চাইতে এসে কি চাইছে! মশুরকলাই চাইছে।'

মা বলে উঠলেন, 'বাবা, মেয়েমানুষ ওরা, ওদের সংসার করতে হবে। সব রকম ওদের চাই। নীলবড়ি থেকে শশাবিচি—মায় সমুদ্রের ফেনা। সব যোগাড় করে রাখতে হবে আগে থেকে। ওদের সংসার করতে হবে।'

এই সংসারটি কি করে পরিপাটিরূপে করা যায় সেটুকু দেখাবার জন্যেই তো মা সংসারী হয়েছেন। জগন্মাতা সারদা হয়েছেন। সন্ন্যাস তো আর কিছুই নয়, ভগবানে সম্যকরূপে ন্যাস করা, মানে, অর্পণ করা, নিক্ষেপ করা। সংসারের সমস্ত কাজ নিখুঁত ভাবে করো কিন্তু মনটি ভগবানে দিয়ে রাখো, লাগিয়ে রাখো—একেই বলে সংসারে সন্ন্যাসীর মতো থাকা। ঠাকুরের ভাষায়, নর্তকীর মতো থাকা। মাথায় ঘড়া নিয়ে নেচে যাচ্ছে নর্তকী, ঘাঘরা ঘুরিয়ে, কিন্তু মাথার ঘড়া স্খলিত হচ্ছে না। তেমনি সংসারের যাবতীয় কর্তব্য হাসিমুখে সম্পন্ন করো, কিন্তু খবরদার, যিনি শিরোধার্য, সেই পূর্ণঘট যেন নির্বিচল থাকে। নৃত্যের আনন্দে যেন সেই ঘটকে না মাটিতে ফেল। ঘটই যদি পড়ে যায় তা হলে আর নৃত্য কি।

এই নিস্পৃহ অথচ নির্দ্বন্দ্ব নৃত্যটি দেখাবার জন্যেই সারদা। জগজ্জননী মহামায়া হয়ে সংসারে আবার শুধু মায়া!

রাধুকে নিয়ে মা মহাব্যস্ত। আবার পরনের কাপড়খানি কোথায় একটু ছিঁড়ে গিয়েছে বলে গোলাপ-মাকে বলছেন সেলাই করে দিতে।

কাশী থেকে কজন স্ত্রীলোক এসেছে দেখা করতে। একজন একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ।'

অস্ফুটরেখায় মা হাসলেন। বললেন, 'কি করব মা, আমি যে নিজেই মায়া।'

...আঠারো...

ঠাকুর অসুখে পড়লেন।

গলায় ঘা, তবু ক্রমাগত পিপাসু ভক্তদের সঙ্গে হরিকথার বিরাম নেই, অতিপরিশ্রমে ঘা থেকে রক্ত বেরুতে লাগল।

সবাই চোখে অন্ধকার দেখল। ঠিক করল কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। যিনি ব্যাধি তিনিই চিকিৎসা। ঠাকুর রাজী হলেন।

উঠলেন গিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের এক ভাড়া-বাড়িতে। সারদা পড়ে রইল দক্ষিণেশ্বরে। দুঃসহতর নিঃসঙ্গতায়।

রাতে বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়েছে গঙ্গায়, অন্ধকারে এক কুমীরের গায়ে পা রেখেছে। কি সর্বনাশ! কুমীরটা জল ছেড়ে সিঁড়ির উপর এসে শুয়েছে। সারদার হাতে আলো নেই, ঘোর অন্ধকার, দেখতে পায়নি। দিব্যি পা রেখে দাঁড়িয়েছে তার উপর।

ভাগ্যিস সাড়া পেয়ে কুমীর লাফিয়ে পড়ল জলের মধ্যে, নইলে কি হত কে জানে।

বৃন্দাবনে মা এসেছেন তীর্থ করতে। শুনেছেন এখানে কোন নির্জনে গৌরী-মা আছে নিরুদ্দেশ হয়ে। খুঁজতে-খুঁজতে পাওয়া গেল তাকে এক গুম্ফার মধ্যে। রাতে ধুনি জ্বাললো গৌরী। ধুনি জেবলে কথা কইছে মায়ে-ঝিয়ে এমন সময় বিশাল দুটো সাপ এসে ঢুকল।

'ও গৌরদাসী, কি হবে গো, দুটো সাপ যে।' ভয়ে মা কুঁকড়ে গেলেন।

গৌরী-মা বললে, 'ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করতে এসেছে। কিছু ভয় নেই, পেসাদ পেয়ে এখুনি চলে যাবে।' দামোদরের প্রসাদ ঢাকা ছিল, তাই কিছু মাটিতে ঢেলে দিল গৌরী-মা। দিব্যি তা শেষ করে চলে গেল সাপ দুটো।

গোলাপ-মা কথায়-কথায় বললে একদিন যোগেন-মাকে, 'দেখ যোগেন, ঠাকুর বোধহয় মা'র উপর রাগ করে কলকাতা চলে গেলেন।'

'সে কি কথা? অসুখের জন্যে গেলেন যে! ভালো-ভালো ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়ে চিকিৎসা করাবেন!' যোগেন-মা প্রতিবাদ করল।

'বাইরে থেকে দেখতে তাই বটে,' গোলাপ-মা কণ্ঠস্বর একটু আচ্ছন্ন করলে, 'কিন্তু আমার মনে হয় আসল কারণ অন্য রকম। ঠাকুর চটেছেন মা'র উপর।'

যোগেন-মা সোজা বললে এসে মাকে। তাই? সত্যি?

মা তো কেঁদে আকুল। কলকাতায় গিয়ে উঠলেন ঠাকুরের পাশটিতে। ছলছল চোখে জিগগেস করলেন, 'তুমি নাকি আমার উপর রাগ করে চলে এসেছ?'

'সে কি কথা? এ কথা তোমাকে কে বললে?'

'গোলাপ বলেছে।'

'গোলাপ বলেছে? কি আশ্চর্য! এই কথা বলে কাঁদিয়েছে তোমাকে?' ঠাকুর চটে উঠলেন : 'কোথায় সে? ডাকো তাকে।'

মা তখন শান্ত হলেন। শান্ত হয়ে ফিরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর বন্দী-ঘরে। ভব মুখুজ্জের মেয়েকে ডেকে শিখতে লাগলেন প্রথম-পাঠ।

গোলাপ-মাকে বকে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমি কি বলে ওকে কাঁদিয়েছ শুনি? তুমি জানো না ও কে? যাও এখুনি গিয়ে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে এস।'

বিমনার মত গোলাপ-মা পায়ে হেঁটে চলে গেল দক্ষিণেশ্বর। কেঁদে পড়ল মা'র কাছে। বললে, 'আমি না বুঝে ও কথা বলেছিলাম। তুমি যদি এখন—'

মা কথা কইলেন না। শুধু একটু হাসলেন। 'ও গোলাপ,' 'ও গোলাপ,' 'ও গোলাপ' বলে তিনটি চাপড় মারলেন তার পিঠে। সব কষ্টভার নিমেষে নেমে গেল। সব মনস্তাপ যেন উড়ে গেল হাওয়ায়।

কবরেজরা এসে জবাব দিলে। শাস্ত্রে চিকিৎসার বিধান থাকলেও এ রোগের সুরাহা নেই। অগত্যা ডাক্তারি। এলোপ্যাথির কড়া ওষুধ সইবে না ঠাকুরের ধাতে। সুতরাং মহেন্দ্র সরকারকে ডাকো। হোমিওপ্যাথিতে তার বিরাট নাম-ডাক। হয়তো এক ফোঁটায় করে ফেলবে অসাধ্যসাধন।

কিন্তু শুধু ওষুধটি হলেই তো চলবে না, সেবা চাই। ভক্তেরা প্রাণ

দিতে পারে ঠাকুরের জন্যে কিন্তু যে কোমলতা যে চারুতাটুকু মিশলে সেবাটুকু সুস্বাদু হয় তা তারা পাবে কোথায়? তা ছাড়া পথ্য রাঁধবে কে? ঠিক-ঠিক পরিমাণে বস্তু আর মশলা মিশিয়ে রান্না করলেই তো পথ্য হয় না, তার মধ্যে হৃদয়ের স্নেহসারটুকু মেশাবে কে?

ভক্তেরা ঠিক করলে, মাকে নিয়ে আসি।

ঠাকুরের কাছে তুললে সে প্রস্তাব। মন তো চায় ষোলো আনা কিন্তু এখানে সে থাকবে কি করে? তেমন ব্যবস্থা কই? তার অবগুণ্ঠনটি কুণ্ঠিত হবে না তো?

'এখানে এসে থাকতে পারবে?' চিন্তান্বিত দেখাল ঠাকুরকে : 'থাকবার তেমন ঘর-দোর কই? যাই হোক সব কথা খুলে-মেলে বলো গে তাকে, আসতে হলে আসুক।'

চলে তো চলুক—এ পানিহাটির উৎসবে যাওয়া নয়। খবর পেয়ে মা হাওয়ার সঙ্গে ছুটে এলেন। ঘর-দোরের ভালো ব্যবস্থা নেই, কি এসে যায়! যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন—ঠাকুরের এই মন্ত্র সার করে ঠিক মানিয়ে থাকতে পারবে। যারা মা নিয়ে থাকবে তাদের সঙ্গে মানিয়ে থাকার হ্যাঙ্গাম কি।

দোতলায় ঠাকুরের ঘর, পশ্চিমে কোণের দিকে মা'র। কিন্তু সমস্ত দিন কাটান তিনি তেতলায় ছাদের দরজার পাশে ছোট্ট একটু ঘেরা চাতালে। লম্বায়-চওড়ায় হাত চারেকের বেশি নয়। সমস্তদিন কাটান মানে রাত তিনটেয় উঠে আসেন আর রাত এগারোটায় শুতে যান। রাত এগারোটায়, যেহেতু তখন সমস্ত বাড়ি ঘুমে নিঝুম হয়ে গিয়েছে। তিনটের সময় ওঠেন, এই প্রায় চিরকালের অভ্যেস। তা ছাড়া এ বাড়িতে একটি মাত্র কল-চৌবাচ্চা, তাই রাত থাকতে উঠে স্নানাদি সেরে না নিলে অনুপায়। এক মহল বাড়ি, বাড়িতে অগুনতি পুরুষ, অনেকেই অচেনা। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকলের চোখের আড়ালে স্নান-টান সেরে উঠে এস চাতালে। সেখানে বসে সারা দিনমান যখন যেটুকু দরকার ঠাকুরের পথ্য রাঁধো। বুড়ো-গোপাল আর লাটু—এদের সঙ্গেই মা যা কথা কন। এরাও টের পায় না কখন মা চাতালে ঢোকেন আর কখনই বা রাত করে নেমে যান তাঁর দোতলার ঘরটিতে।

তেতলার উপরে ঐ ছোট্ট চাতালটিই মা'র নিশ্চিন্ত নিভৃতি, কিন্তু সর্বক্ষণ মনটি পড়ে আছে ঠাকুরের পাশটিতে। নিজের হাতে পথ্যটি শুধু

রাঁধলেই তৃপ্তি নেই, নিজের হাতে খাওয়াতে বড় সাধ। এক-একদিন কৃপার হাওয়াটি ঠিক আসে, সুযোগ পেয়ে যান। বুড়ো-গোপাল আর লাটু ঘর থেকে লোক সরিয়ে দেয়, ঠাকুরের কাছটিতে বসে খাইয়ে দেন যত্ন করে। কোনো-কোনো দিন বিধি বাম হন, এত ভিড় থাকে যে সরানো যায় না। তখন ভক্তরাই কেউ পথ্য-জল নিয়ে আসে উপর থেকে। হায়, আজ তোমাকে খাওয়াতে পারলুম না কাছে বসে। কিন্তু কি করবো, তুমি তো আমার একলার নও, তুমি সকলের।

দিনের পর দিন সর্বংসহা অশেষ ক্লেশ সইছেন। শারীরিক ক্লেশ। তবু হাল ছাড়ছেন না, ভেঙে পড়ছেন না। রোগরাত্রির পরে আরোগ্যের সুপ্রভাতটির জন্যে প্রতীক্ষা করছেন এক মনে।

কিন্তু কই, অসুখ সারছে কই? রোগ ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে।

ঠাকুরকে কলকাতার বাইরে একটু কোথাও ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলে বোধহয় ভালো হয়। তাই ভেবে কাশীপুরের গোপাল ঘোষের বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। আশি টাকা ভাড়া। কে দেবে এত টাকা? সুরেন মিত্তির বললে, আমি দেব।

অঘ্রান মাসের শেষাশেষি শ্যামপুকুর ছেড়ে চলে এলেন কাশীপুর।

বেশ বাগানওয়ালা বাড়ি, চারদিকের সবুজের গায়ে নানা রঙের বুনন, নানা ফুলের কারুকাজ। দোতলা বাড়ি, উপরের হলঘরে ঠাকুরের জায়গা। দক্ষিণে ছোট একটি ঘেরা ছাদ, সকাল-বিকেল সেখানে একটু হাঁটেন, কখনো বা বসেন একটু নিরালায়। মা'র ঘর নিচে, পুবের দিকে। সঙ্গ দেবার জন্যে এবার লক্ষ্মী এসেছে, ডেরা নিয়েছে মা'র ঘরে। মা'র কাজ ডাক্তারের ব্যবস্থামত পথ্য রাঁধা আর দু-বেলা খাইয়ে আসা নিজের হাতে। শুধু এইটুকু? আর ঊর্ধ্বমুখ শিখার মত অহরহ একটি অনির্বাণ প্রার্থনা: ঠাকুরকে ভালো করো। ঠাকুরকে বাঁচিয়ে রাখো।

একদিন ঠাকুর বললেন মাকে, 'যারা লাভের আশায় এসেছিল তারা সব চলে যাচ্ছে। বলছে, উনি অবতার, ওঁর আবার ব্যারাম কি। ও সব মায়া! কিন্তু যারা আমার আপনার জন, তাদের আমার এ কষ্ট দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে—'

নরেন রাখাল নিরঞ্জন লাটু যারা ঠাকুরের সেবা করছে অহোরাত্র তারা একদিন ঠিক করলে বাগানের ও-পাশে যে একটা খেজুরগাছ আছে সন্ধের সময় তার জিরেনের রস চুরি করে খাবে। ঠাকুর তখন বিছানায়

শুয়ে, এত দুর্বল হাঁটতে-উঠতে পারেন না। এ অবস্থায় এ কথা ঠাকুরকে জানানোর কোনো মানে হয় না। সন্ধে হতে না হতেই চলল সবাই গাছের দিকে। দল বেঁধে। এমন সময় মা সহসা দেখতে পেলেন তাঁর ঘর থেকে, ঠাকুর তীরবেগে নিচে নেমে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। এ কি অঘটন! বিছানায় যাকে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয় সে এমনি ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে! নিশ্চয়ই ভুল দেখেছি চোখে। ত্বরিত পায়ে মা উঠে এলেন উপরে, ঠাকুরের ঘরে। ওমা, কি সর্বনাশ, ঠাকুর তাঁর বিছানায় নেই, ঘর ফাঁকা। এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করলেন, অনর্থক, নিচেই নেমে গিয়েছেন নির্ঘাত। ভয়ে-ভয়ে মা তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, ঢুকেই আবার দেখতে পেলেন যেমন বেগে গিয়েছিলেন তেমনি বেগে ঠাকুর আবার উঠে যাচ্ছেন উপরে, সিঁড়ি বেয়ে। উপরে উঠে, দেখতে পেলেন, দিব্যি ভালোমানুষটির মত শুয়েছেন তাঁর রোগশয্যায়।

পর দিন পথ্য খাওয়াবার সময় মা পাড়লেন কথাটা।

ঠাকুর প্রথমে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। বললেন, 'ও রেঁধে তোমার মাথা গরম।'

কিন্তু সহজে ছাড়বেন না এবার মা। তিনি দেখেছেন স্বচক্ষে।

'তুমি দেখেছ নাকি?' ঠাকুর বললেন ঘনিষ্ঠ সুরে, 'ছেলেরা সব এখানে এসেছে, সবাই ছেলেমানুষ। তারা আনন্দ করে রস খেতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি দেখলুম ঐ খেজুর গাছতলায় একটা কালসাপ রয়েছে। ভীষণ রাগী সেই সাপ, ছেলেদের পেলেই কামড়ে দিত। তাই অন্যপথ দিয়ে তাড়াতাড়ি সেই গাছতলায় চলে গেলাম, ছেলেদের পেঁছুবার আগেই। গিয়ে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম সাপটাকে। বলে এলাম, আর কখনো ঢুকিসনে। শোনো, তুমি যেন একথা এখন বোলো না কাউকে।'

খাওয়ার মধ্যে একটু সুজি, তাও ছেঁকে দিতে হয়। নয়তো একটু মাংসের জুস। ছিবড়ে খেয়ে-খেয়ে দুটো মরা কুকুর মোটা হয়ে গেল। মাংস রাঁধবার কায়দা আছে। কাঁচা জলে মাংস দিয়ে তেজপাতা আর অল্প খানিকটা মশলা দিয়ে তুলোর মতন সেদ্ধ করে নামিয়ে নেওয়া। সেবার ব্যবস্থা হল শামুকের ঝোল। এবার মা প্রতিবাদ করলেন। বললেন, 'এগুলো জীয়ন্ত প্রাণী, ঘাটে দেখি চলে বেড়ায়! এদের মাথা আমি ইট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।'

'সে কি?' ঠাকুর বললেন, 'আমি খাব। আমার জন্যে করবে!'

আর কথা নেই। রোখ করে করতে লাগলেন।

অকালে আমলকী খেতে চাইলেন ঠাকুর। দুর্গাচরণ বেরিয়ে গেল। তিন দিন আর তার দেখা নেই। তিন দিন পর গোটা দুই-তিন আমলকী নিয়ে হাজির। বেশ বড় আমলকী। ঠাকুরের আমলকী হাতে করে সে কি কান্না! বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম ঢাকা-টাকা চলে গেছ বুঝি। ওগো,' মা'র উদ্দেশে হাঁক দিলেন, 'বেশ ঝাল দিয়ে একটা চচ্চড়ি রেঁধে দাও। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক, ঝাল বেশি খায়।'

রোজ তিন-রকম রান্না করেন মা। ঠাকুরের এক রকম, নরেনদের আরেক রকম। তৃতীয় রকম আর সবাইয়ের। এবার দুর্গাচরণের জন্যে নতুন রকম। তাই সই। যে সন্তানের যেমন রোচে তেমনিই রেঁধে দেন মা। ছেলের স্বাদেই মা'র আস্বাদন।

বাটিতে আড়াই-সের দুধ নিয়ে উপরে উঠছেন মা, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন হঠাৎ। বাটি ছিটকে পড়ল মেঝের উপর, শুধু তাই নয়, মা'র পায়ের গোড়ালির হাড় গেল সরে। কাছাকাছি কোথায় ছিল নরেন আর বাবুরাম, মাকে এসে ধরে ফেললে।

কানে গেল ঠাকুরের। বাবুরামকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'হ্যাঁ রে বাবুরাম, আমার এখন খাওয়ার কি উপায় হবে?'

ঠাকুর মণ্ড খান। সে মণ্ড মা তৈরি করেন। মা খাইয়ে দিয়ে আসেন।

'এখন আমার মণ্ড তবে কে রাঁধবে? কে খাইয়ে দেবে?'

পা ভীষণ ফুলে উঠেছে মা'র, ভীষণতরো যন্ত্রণা। অসম্ভব নড়া-চড়া, ওঠা-চলা তো দূরস্থান। গোলাপ-মা রেঁধে দিচ্ছে মণ্ড। নরেন খাইয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে।

গোলাপ-মা যেন মা'র ছায়া।

রাঁচি থেকে এক ভক্ত এসেছে, সঙ্গে অনেক ফুল-ফল, কাপড়, আবার একছড়া কাপড়ের গোলাপের মালা। কাপড়ের বটে কিন্তু মনে হয় সদ্য-সদ্য যেন ফুটে রয়েছে ফুলগুলো। ভক্তটির ইচ্ছে মা গলায় পরেন একবার মালাটি। ভক্তের মনের কামনা পূর্ণ করলেন মা। পরলেন। মালায় লোহার তার দিয়ে বাঁধা। তাই দেখে রুখে এলো গোলাপ-মা। বললে, 'কেমনতরো ভক্ত গা তুমি? লোহার কাঁটা-ওয়ালা মালা এনেছ? এই মালা পরলে গলায় লাগবে না মা'র?' ভক্তটিকে অপ্রতিভ হতে দেখে মাও অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, 'না না, লাগছে না, কাপড়ের উপর দিয়ে পরেছি।'

এই না হলে করুণাময়ী!

নরেন বললে, 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সবই দেখছি উড়ে যায়।'

কুণ্ঠিত মুখে হাসি এঁকে মা বললেন, 'দেখো আমাকে যেন উড়িয়ে দিও না।'

'তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?'

বোধগয়ার মঠে এসেছেন শ্রীমা, কত তাদের ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য, দেখে-দেখে মা কাঁদেন। আর ঠাকুরকে বলেন, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দোরে-দোরে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হত!'

তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হল। ক্রমে-ক্রমে ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যও হল মন্দ নয়। মঠের নতুন জমি কেনবার পর নরেন মাকে নিয়ে এল দেখাতে। জমির চার-সীমা দেখালে ঘুরে-ঘুরে। বললে, 'মা, এ তোমার নিজের জায়গা। তুমি আপন জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে ঘুরে বেড়াও।'

বাবুরামকে নিজের কাছটিতে ডেকে আনলেন ঠাকুর। নিজের নাকের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঠারে-ঠোরে বললেন, 'একবারটি ওকে এখানে নিয়ে আসতে পারিস?'

বাবুরাম নির্বাক। যে লোক মাটিতে পা ফেলতে পারে না সে সিঁড়ি ভেঙে আসবে কি করে উপরে? এ কেমনতরো রসিকতা!

রসিকতা নয়, স্নেহ! অন্তরমাধুরী।

বেশ তো, রসিকতাই করলেন ঠাকুর। বললেন, 'একটা ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে দিব্যি মাথায় করে তুলে নিয়ে আসবি। কি রে, পারবি নে?'

... উনিশ ...

দিন ঘনিয়ে আসছে। রোগে ভুগে-ভুগে কী চেহারা হয়ে গিয়েছে ঠাকুরের!

নিজের দিকে সংকেত করে বলছেন ঠাকুর : 'এর ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত

নিয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম ঐ অবস্থা হল তখন জ্যোতিতে দেহ জ্বল-জ্বল করত। বুক লাল হয়ে যেত। তখন বললুম, মা, বাইরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও। তাই এখন এই হীন দেহ।'

পলতে দিয়ে গলার ঘা পরিষ্কার করছেন শ্রীমা।

'উঁহু, কি করছ? পলতে দিচ্ছ? আচ্ছা দাও।' সেবাটি নিচ্ছেন সহিষ্ণুর মত।

আবার বলছেন আগের কথার জের টেনে : 'সে রকম জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোকে জ্বালাতন করত। ভিড় আর কমত না। এখন বাইরে কোনো প্রকাশ নেই। এতে আগাছা পালায়, যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন? এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।'

পাপ গ্রহণ করে ঠাকুরের ব্যাধি। বললেন শ্রীমা, 'গিরিশের পাপ। ঠাকুরের ইচ্ছামৃত্যু ছিল। সমাধিতে দেহ ছাড়তে পারতেন অনায়াসে। বলতেন, আহা ছেলেদের একটা ঐক্য করে বেঁধে দিতে পারতুম! তাই অত কষ্টেও দেহ ছাড়েননি।'

'গিরিশবাবু নাকি মঠে অনেক টাকা দিয়েছেন?' কে একজন জিগগেস করল শ্রীমাকে।

'সে আর কি দিয়েছে!' বললেন শ্রীমা, 'বরাবর দিয়েছিল বটে সুরেশ মিত্তির।' হঠাৎ কেমন আর্দ্র হলেন গিরিশের জন্যে। বললেন, 'তবে হ্যাঁ, কতক-কতক দিয়েছে বই কি। সে তেমন হাজার-দু-হাজার নয়। দেবেই বা কোত্থেকে? তেমন টাকাই বা কোথায়? আগে তো পাষণ্ড ছিল, অসৎ সঙ্গে মিশে থিয়েটার করে বেড়াত। বড় বিশ্বাসী ছিল তাইতো কৃপা পেয়েছিল ঠাকুরের। এক-এক অবতারে এক-এক পাষণ্ড উদ্ধার করেছেন। যেমন গৌর অবতারে জগাই-মাধাই, রামকৃষ্ণ অবতারে গিরিশ ঘোষ।'

একটি মেয়ে এসেছে মা'র কাছে, মনে অনেক দুঃখ নিয়ে। আশা, মা বুঝবেন এই অকথিত ব্যথা, বুলিয়ে দেবেন তাঁর মমতার হাত।

ঠিক তাই। 'দেখ মা, সকলেই বলে এ দুঃখ ও দুঃখ, ভগবানকে এত ডাকলুম তবু দুঃখ গেল না। নাই বা গেল! দুঃখই তো ভগবানের দয়া।'

কিছুক্ষণ থেমে বললেন আবার মা, 'সংসারে দুঃখ কে না পেয়েছে বলো? বৃন্দে বলেছিল কৃষ্ণকে, কে তোমাকে দয়াময় বলে? যে কেবল কাঁদায় তার আবার দয়া! রাম অবতারে সীতাকে কাঁদিয়েছ, কৃষ্ণ অবতারে

রাধাকে। আর কংসকারাগারে দিন-রাত দুঃখে-কষ্টে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ করেছে তোমার বাপ-মা। তবু তোমাকে ডাকি কেন? তোমার নামে যম-ভয় থাকে না।'

ঠাকুরও কি কাঁদাচ্ছেন শ্রীমাকে?

হত্যে দিলেন কিছু হল না, ভবতারিণীর দুয়ারে গেলেন, দেখলেন তাঁর নিজের গলাতেই ঘা। দিন কি তবে সত্যিই এল ঘনিয়ে?

পয়লা ভাদ্র সোমবার, বারো শো তিরানব্বুই সাল, ঠাকুর দেহ রাখলেন। সেদিন কি হল, খিচুড়ি রাঁধছিলেন মা, খিচুড়ি ধরে গেল, পুড়ে গেল নিচের দিকটা। উপর-উপর সেই খিচুড়িই খেল ছেলের দল। শুধু তাই নয় ছাতে মা'র একখানা কুঞ্জদার শাড়ি শুকোচ্ছিল তাই চুরি হয়ে গেল!

মা মাতৃহারা শিশুর মত কেঁদে উঠলেন : 'আমার কালী-মা কোথায় গেলে গো—'

কালী-মাই তো। রাখাল যখন এল দক্ষিণেশ্বরে, কোথায় ঠাকুর, এ যে কেশ এলিয়ে কালী-মা বসে আছেন। রাখাল তাঁর কোলে গিয়ে বসল। তারক যখন এল দক্ষিণেশ্বরে, সেও তাই দেখলে, ঠাকুর নয়, মা বসে। তাঁর কোলে মাথা রেখে সে প্রণাম করল।

ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের মত শুয়ে আছেন, কিন্তু মা দেখছেন বরা-ভয়ময়ী প্রচণ্ডিকা।

কামারপুকুরে আছেন তখন মা, একদিন ঠাকুর এসে দেখা দিলেন। বললেন, 'খিচুড়ি খাওয়াও।'

সেদিন, সেই শেষ দিনের খিচুড়ির কথা কি জানতে পেরেছিলেন?

খিচুড়ি রেঁধে রঘুবীরকে ভোগ দিলেন শ্রীমা। হিন্দুস্থানী ঠাকুর কিনা তাই খিচুড়ি।

এইবার বুঝি বিহিত পোশাক পরতে হয় মাকে। রক্তিম থেকে যেতে হয় শুভ্রতায়। হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, কোত্থেকে ঠাকুর এসে খপ করে তাঁর হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'ও কি করছ? আমি কি কোথাও গেছি? এ-ঘর থেকে ও-ঘর।'

এ-ঘর থেকে ও-ঘর। ছোট্ট কটি কথায় ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন জীবন-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল! মাঝখানে শুধু একটি চৌকাঠের ব্যবধান। পাশের ঘরে লোক আছে, দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার অস্তিত্বের আভাসে সমস্ত অনুভব ভরে আছে—তেমনিই তো পরকালের প্রতি ইহকালের সংবর্ধনা।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি নয় যে অন্তত একটা রাস্তা বা একটুখানি জমির অবকাশ থাকবে—একেবারে এ-ঘর ও-ঘর। অত্যন্ত কাছাকাছি, নিবিড়তম প্রতি-বেশী। মাঝখানে শুধু একটি দুয়ার। নিরর্গল। কান পাতলেই শোনা যায় কথাবার্তা, চলা-ফেরা—শুধু চোখেই বুঝি দেখা যায় না! কে বলে, তেমন-তেমন লোক হলে তাও দেখে।

বৃন্দাবনে তীর্থ করতে এসে হাতের বালা আবার খুলতে গেলেন শ্রীমা। ঠাকুর দেখা দিলেন। বললেন, 'তুমি হাতের বালা ফেলো না। আজ বিকেলে গৌরমণি আসবে, তার কাছ থেকে জেনে নেবে বৈষ্ণবতন্ত্র।'

কোথায় গৌরদাসী! বৃন্দাবনে কোথায় তপস্যায় বসেছে তা কে জানে! ঠাকুর তাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'যাও তোমার মা'র কাছে, তাঁকে বৈষ্ণবতত্ত্ব শিখিয়ে এস।'

বিকেলে ঠিক গৌরী-মা এসে হাজির। সে বুঝিয়ে দিল সহজ করে। কৃষ্ণ পতি যার, সে চিরসধবা। তার চিন্ময় স্বামী। বিশ্বময় প্রাণদ্যুতি।

বৃন্দাবন থেকে যখন ফিরে এলেন কামারপুকুরে তখন আবার লোকের ভয়ে খুলে ফেললেন হাতের বালা। এ ও বলছে, ও তা বলছে। কান পাতা দায়! গভীরের কথা কে বোঝে, চোখে দেখেই লোকের ঝাঁজ। তা ছাড়া, গঙ্গা নেই, কি করে থাকব এখানে?

ঠাকুর আবার দেখা দিলেন। শ্রীমা দেখলেন ঠাকুরের পা থেকেই জলের ফোয়ারা ছুটেছে, ঢেউ খেলে যাচ্ছে মাঠ ছাপিয়ে। তবে আর ভয় কি। তাঁর পাদপদ্ম থেকে গঙ্গা, তিনিই তো আছেন সামনে। জবাফুল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মুঠো-মুঠো ফেলতে লাগলেন শ্রীমা। কে আর ভয় করে লোকনিন্দা। চিত্তানন্দ যেখানে নিত্যানন্দ হয়ে আছেন লোকনিন্দা তার কি করবে?

এ সব তো পরের কথা। কিন্তু সদ্য-সদ্য বিচ্ছেদের দুঃখে মা যখন ছিন্নভিন্ন, তখন বলরাম বোস একখানা থান ধুতি কিনে এনেছে। গোলাপ-মাকে ডেকে এনেছে মাকে দেবার জন্যে। গোলাপ-মা তো স্তম্ভিত! কোন প্রাণে এ থান তাঁর হাতে দেব? সেই আনন্দের রক্তিমাকে কি করে বিষাদের তুষারে শুভ্র করে দেব?

গোলাপ-মা দেখল, মা নিজ হাতেই তাঁর শাড়ির লাল পাড় ছিঁড়ে ফেলছেন! সম্পূর্ণ নয়, অধিকাংশ।

রক্তিমার সেই ক্ষীণ প্রতীকটি বরাবর বজায় রেখেছেন মা। মাথার পিছনের দিকে ঘাড়ের কিছু উপরে একটি সিন্দুরকণাও লালন করেছেন।

তিনি যে প্রসন্নোজ্জ্বলা শ্রীমতী। আর ঠাকুর সর্বরসকদম্বমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ।

'ওগো তোমরা কিছু ভেবো না।' বললেন ঠাকুর, 'এর পর ঘরে-ঘরে আমার পুজো হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি। আমার যে কত লোক তার কূলকিনারা নেই।'

নিবেদিতা বললে, 'মা, আমরাও বাঙালি। কর্মবিপাকে জন্মেছি ও-দেশে। তা দেখবে আমরাও ঠিক-ঠিক বাঙালি হয়ে যাব।'

'মা, ধ্যান-ট্যান তো কিছুই হয় না।' সরল মনে মা'র কাছে কেঁদে পড়ল ভক্ত।

'নাই বা হল।' সরলা মা দুঃখভার উড়িয়ে দিলেন এক ফুঁয়ে : 'শুধু ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে।'

'যথানিয়মে তিন বেলা জপ করাও হয়ে ওঠে না।'

'নাই বা হল। স্মরণমনন থাকলেই যথেষ্ট। যখন পারবে তখনই জপ করবে। অন্তত প্রণাম তো আছে।'

ঠাকুর কি বাঁধা-ধরার মধ্যে? নিয়মকানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা? তিনি মুক্তমাঠের খোলা হাওয়া। তিনি ঘুমের মধ্যেও কাজ করেন নিশ্বাসের মত। কাজের মধ্যে যখন তাঁকে ভুলে থাকি তিনি সেই বিস্মৃতিটি হয়েই জেগে থাকেন কাজের মধ্যে। এক মুহূর্তের জন্যেও ছেড়ে যান না, ফেলে যান না। নিজেকে ভালো করে নামিয়ে নিয়ে আসার নামই তো প্রণাম। নামিয়ে আনার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখি তিনিও নেমে এসেছেন। তখন প্রেমে তরল-সমতল।

ঠাকুরের এই যে ভাষ্যের সরলতা সেইটিই তো সারদামণি।

গৃহীভক্তরা বললে, আর কি, ঠাকুর নেই, এবার ভেঙে দাও কাশীপুরের সংসার। তা হলে মা কোথায় যাবেন? নরেন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা বাধা দিল। কোন প্রাণে মাকে নিরাশ্রয় করব? ঠাকুরের শেষ কটি দিন যেখানে কেটেছে, কটা দিন সেখানে তিনি কাটিয়ে যান। খাওয়াবে কি? ভয় নেই, দরকার হয় তো ভিক্ষে করে খাওয়াব।

'নরেন আমার খাপখোলা তরোয়াল।'

বরানগর মঠে যখন ওরা ছিল, আহা, কতদিন আধপেটা খেয়ে কাটিয়েছে ধ্যান-জপে। একদিন সকলে ঠিক করলে দোর ধরে পড়ে থাকবে, ভিক্ষে করতেও বেরুবে না রাস্তায়। যাঁর নামে সব ছেড়েছুড়ে এলুম, দেখি তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকলে তিনি খেতে দেন কিনা। চাদর মুড়ি দিয়ে

সবাই লম্বা ধ্যান লাগিয়ে দিলে। আমাদের টান, তাঁর দান, দেখি আমাদের টানে তিনি দান করেন কিনা। আমাদের নাম, তাঁর দাম, দেখি তাঁর নামের কোনো দাম আছে কিনা।

দুপুর গেল, সন্ধ্যা গেল, রাতও এল এখন নিবিড় হয়ে। কোথাও কিছুর দেখা নেই। না থাক, রাত পুইয়ে দেব। দেহ দড়ি পাকিয়ে শুকিয়ে মরবে। যদি খাদ্য না জোটান তবে এ দেহ রেখে লাভ কি!

দরজায় কে ঘা মারল।

নরেন উঠল লাফিয়ে। বললে, 'দ্যাখ তো দরজা খুলে, কে এল?'

গঙ্গার ধারের শ্রীশ্রীগোপালের বাড়ি, লালাবাবুর মন্দির থেকে খাবার এসেছে ভুরি-ভুরি। কে পাঠালো রে এ খাবার?

আর কে! যাঁর দায় তাঁরই দয়া। ডাকাবেন অথচ খাওয়াবেন না? সব জায়গা কেড়ে নেবেন, শেষে বঞ্চিত করবেন কোল থেকে?

ওরে, আগে ঠাকুরের ভোগরাগ দে। তবে প্রসাদ।

দিন পাঁচেক পরে লক্ষ্মীকে নিয়ে মা চলে এলেন বলরামের বাড়ি।

এদিকে ঠাকুরের চিতাভস্ম নিয়ে ঝগড়া বেধেছে দুই দলে। এক দিকে রাম দত্ত আর অন্যান্য গৃহীভক্ত, অন্য দিকে নবীন সন্ন্যাসীরা। রাম দত্তের ইচ্ছে ভস্ম রাখা হোক তার বাগানে, কোনো মন্দির বা সৌধের আশ্রয়ে। তা কেন, সন্ন্যাসীরা বললে, এ ভস্মে আমাদের উত্তরাধিকার। বাইরে থেকে দেখতে গেলে, রাম দত্তই জিতল সেই যুদ্ধে, ভস্মের কলসী সেই হাত করলে। কিন্তু তার আগেই অধিকাংশ ভস্ম সরিয়েছে সন্ন্যাসীরা। কলসী হালকা করে দিয়েছে।

এই নিয়ে মা দুঃখ করছেন। বলছেন গোলাপ-মাকে, 'এমন সোনার মানুষ চলে গেল, অথচ দেখ তাঁর ভস্ম নিয়ে কেমন ঝগড়া করছে এরা।'

... কুড়ি ...

দিন দশেক পরে মা বেরিয়ে পড়লেন তীর্থে। সঙ্গে যোগেন, কালী, লাটু, লক্ষ্মী, গোলাপ-মা, মাস্টার-মশাই আর তাঁর স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবী।

'আমি যে-যে তীর্থে যাইনি, তুমি সব দেখে এসো, ঘুরে এসো।' মাকে বলেছিলেন ঠাকুর।

বৃন্দাবনের পথে প্রথমে দেওঘর, পরে কাশী, শেষ দিকে অযোধ্যা। কাশীতে বিশ্বনাথের আরতি দেখে মা'র ভাব হল। পায়ে-পায়ে দুম-দুম শব্দ করতে-করতে রাস্তা কাঁপিয়ে ফিরে এলেন বাড়ি। বললেন, ঠাকুরই টেনে নিয়ে এলেন হাত ধরে।

স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে দেখা হল কাশীতে। আহা, কি নির্বিকার মহাপুরুষ! শীতে-গ্রীষ্মে সমান দিগ্বসন হয়ে বসে আছেন।

'শঙ্কা মৎ কর মায়ী, তোমরা সব জগদম্বা, সরম কেয়া?'

ভোলানাথের মত বসে আছেন আত্মভোলা হয়ে। মুক্তসমস্তসঙ্গ হয়ে। দেহবুদ্ধির লেশ রাখছেন না কোথাও। নিজেও শিশু আর সকলের চোখেও অদেহদর্শিতা।

ঠাকুরের সোনার ইষ্টকবচ দিয়ে গিয়েছেন মাকে। দিয়েছেন অসুখের সময়। দক্ষিণ বাহুমূলে তাই পরে রেখেছেন মা। শুধু তাই নয়, পরা নয়, রোজ পুজো করেন সেই কবচ। ট্রেনে শুয়েছেন কিন্তু তন্দ্রার ঘোরে হাত উঠে এসেছে খোলা জানলার উপর। হঠাৎ ঠাকুর মুখ বাড়িয়ে দিলেন জানলার মধ্য দিয়ে। বললেন, 'ওগো শুনছ? হাতের ইষ্টকবচ এমন করে রেখেছ কেন অসাবধান হয়ে? ও যে চোর খুলে নিতে পারে অনায়াসে।'

হাত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলেন মা। কবচ খুলে ফেললেন। একটি টিনের বাক্সে রেখে দিলেন তুলে। এই টিনের বাক্সেই তাঁর নিত্যপুজোর ঠাকুরের ছবিখানি। মনের নিভৃত মঞ্জুষায় সেই একটি অদ্বিতীয় স্মৃতি।

বৃন্দাবনে এসে মা বড় কাঁদেন। লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদেন একা-একা। যোগেন-মা কাছে এসে বসলে দুজনে কাঁদেন।

যোগেন-মাকে একদিন দেখা দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'হ্যাঁ গা, এত কাঁদছ কেন তোমরা? আমি কি কোথাও গেছি? এই তো রয়েছি তোমাদের সামনে। এই যেমন এ-ঘর আর ও-ঘর।'

যোগেন-মাও ঠিক-ঠিক সে-কথা বলল বলে মা বড় আশ্বাস পেলেন। যিনি নিশ্বাসের নিশ্বাস তিনি কি যেতে পারেন আমাকে ছেড়ে? কোথায় যাবেন? যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ তিনিও আছেন।

কীর্তন করতে-করতে একটা মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে। যুক্তকরে মা প্রণাম করলেন। বললেন, 'দেখ-দেখ কেমন ভাগ্যবান! বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হয়েছেন! আমরা এখানে মরতে এলুম, তা একদিন একটু জ্বরও হল না! কত বয়স হয়ে গেল বলো দেখি—'

মা নাকি বুড়ো হয়েছেন! মা নাকি কখনো বুড়ো হয়! তা ছাড়া মা'র বয়স তো এখন মোটে তেত্রিশ।

ভণ্ড ভেকধারীর মুখে ভগবান নামও পচে যায়, কিন্তু কারু মুখেই মা নাম পচে না। ভগবান দুর্লভ কে বলে? যখনই মা বলে উঠব তখনই তিনি অনায়াসের ধন হয়ে ওঠেন। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের মিলন তবু খানিক কষ্টকর। কিন্তু জলের সঙ্গে জলের মিলন জলের মতই সহজ। মা সন্তানের জন্যে কাঁদেন, সন্তান মা'র জন্যে। তাই এ মিলন, নয়নজলের সঙ্গে নয়নজলের, কোথাও এতটুকু অবশিষ্ট নেই।

ছোট্ট একটি বালিকার মতন হয়ে গিয়েছেন মা। মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর রাধারমণের মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন, প্রভু, কারুর দোষ যেন না দেখি। যখনই দোষ দেখব তখনই তোমাকে আর দেখা হবে না। যদি তোমাকে দেখতে চাই যেন সকলের ভালো দেখি। সকলের ভালোতেই তুমি আলো-করা।

পায়ে বাতের ব্যথা, একটু হয়তো বা খুঁড়িয়ে চলেন, তবু সমস্ত বৃন্দাবন পরিক্রমণ করলেন। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। পথের পাশে যা কিছু দেখবার দেখছেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। দেখছেন-দেখছেন, হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ছেন তন্ময় হয়ে। যেন কবেকার কোন চেনা-চেনা জায়গা! কবে যেন এখানে খেলা-ধুলো করে গেছি! তাই তো, এই তো সে-সব পথ-ঘাট, লতা-বিটপী। যোগেন-মা'রাও থমকে দাঁড়াচ্ছে। কি হল মা, কি দেখছ—মা বললেন, ও কিছু নয়।

কালা-বাবুর বাড়িতে সমাধি হল মা'র। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, সমাধি আর ভাঙে না। যোগেন-মা কত নাম উচ্চারণ করল কানে-কানে, কিছু হল না। ডাক পড়ল যোগীনের, তার ধ্বনিতে কাজ হল। অর্ধবাহ্যদশায় নেমে এসে মা বলে উঠলেন, যেমন ঠাকুর বলতেন, 'খাবো।' কিছু মিষ্টি, জল আর পান রাখল সামনে রেকাবিতে। ঠাকুরের মত একটু-একটু খুঁটে-খুঁটে নিলেন সব। পানের ডগাটুকু পর্যন্ত ছিড়লেন নখ দিয়ে। প্রশ্ন করল যোগীন। মা উত্তর দিলেন, ঠিক যেন ঠাকুরের গলা, ঠাকুরের ভঙ্গি।

'হ্যাঁ, কি বলছিলুম?' মা বলছেন একবার আত্মময়ের মত : 'ও, হ্যাঁ, ঠাকুরের কথা। একবার দেখি কী, জানো? দেখি, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যে দিকে তাকাই সেই দিকে ঠাকুর। কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর, চাষাও ঠাকুর, মুটেও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। বুঝলুম, তাঁরই ছিষ্টি,

তিনিই সব হয়ে আছেন। জীব কণ্ট পাচ্ছে না, তিনি কণ্ট পাচ্ছেন। তাই তো যদি কেউ এসে কেঁদে পড়ে, মনে হয় তাঁরই কান্না। তাই তো উদ্ধার করতে হয়। আমার কি! আমিও তিনি। তাঁর জিনিসে তাঁকেই তুষি।'

বৃন্দাবনে আবার দেখা দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'যোগেনকে মন্ত্র দাও।'

মা ভাবলেন মাথার গোলমালে ভুল দেখছি হয়তো। পরের দিনও দেখলেন আগের মতো। এড়িয়ে গেলেন। তৃতীয় দিন দেখলেন আরো স্পষ্ট আরো ঘনিষ্ঠ। মা বললেন, 'আমি যে তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কই না।'

তাতে কি? মেয়ে-যোগেনকে বোলো, সে থাকবে। যোগীনকে যে আমি মন্ত্র দিতে পারিনি। আমার বাকি কাজ তো তোমাকে করতে হবে।

সেই টিনের বাক্সটি সামনে রেখে মা পুজো করছেন। বেদী নয় সিংহাসন নয় টিনের বাক্সে ঠাকুরের একখানি ছবি আর কিছু দেহাবশেষ। এই মা'র ভুবনব্যাপী জগদীশ্বর। যোগেনকে ডেকে পাঠালেন। নীরবে পুজা করতে-করতে হঠাৎ মন্ত্র বলে ফেললেন। সেইটিই যোগেনের মন্ত্র। ভাবাবেশে এত জোরে বলে ফেলেছেন পাশের ঘর থেকে শুনতে পেল যোগেন-মা।

'এরা সব আমাকে ঘুমুতে বলে।' সন্তানের কল্যাণে নিদ্রাহীন মা বলছেন কাতর হয়ে : 'ঘুম কি আর আছে, না, ঘুম কি আর আসে! মনে হয় যতক্ষণ ঘুমুব ততক্ষণ জপ করলে ছেলেদের কল্যাণ হবে। এক-একবার মনে হয় এই শরীরটুকু না হয়ে যদি মস্ত শরীর হত তা হলে কত জীবেরই না কল্যাণ হত!'

বছরটাক ছিলেন বৃন্দাবনে। তারপরে হরিদ্বার। ব্রহ্মকুণ্ডের জলে ঠাকুরের নখ আর কেশ নিক্ষেপ করলেন। তারপরে জয়পুর, জয়পুর হয়ে পুষ্কর। ফিরতি-পথে প্রয়াগ। গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে ফেললেন ঠাকুরের বাকি কেশ। ফেলবার আগেই ঢেউ এসে মা'র হাত থেকে কেড়ে নিল। যেন মা'র ব্যাকুলতা নয়, ঢেউয়ের ব্যাকুলতা।

'এ কি, এ কী করেছিস তুই?' লক্ষ্মীকে দেখে চমকে উঠলেন মা।

'মাথা মুড়েছি।' লক্ষ্মী বললে গম্ভীর হয়ে। 'প্রয়াগে এলে মাথা মুড়তে হয়। তুমিও এবার মুণ্ডন করো।'

'ও বাবা, ও আমি পারব না।'

যদু মল্লিকের মেয়ে নন্দিনী একবার গেরুয়া পরে এসেছিল দক্ষিণেশ্বরের বাগানে। তাকে দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ছিল বেতের ধামা, ঠাকুর-

দের লুচি-সন্দেশ বেশ রাখা চলত। এখন চাম দিয়ে বাঁধানো হল। আর ঠাকুরদের লুচি-সন্দেশ এতে আনা চলবে না।'

তার মানে, ভক্তিমতী মেয়ে ছিল, দেবসেবা করতে পারত। এখন জ্ঞানীর বেশ ধরেছে, ভাব-ভক্তি থেকে কাটা পড়ল।

একখানা চওড়া লাল-পাড়ের কাপড় গেরুয়ায় ছুপিয়ে মাকে দিয়েছিলেন একজন। একজন আর কে, যদু মল্লিকের স্ত্রী। সে কাপড় পরে ঠাকুরকে প্রণাম করতে এলেন মা।

ঠাকুর লক্ষ্মীকে জিগগেস করলেন, 'লক্ষ্মী এ কাপড় কে দিলে? এটি নহবতে গিয়ে ছেড়ে রাখতে বল। বাগানে কোনো ভৈরবী এলে দিয়ে দিতে বলবি। গেরুয়ার জল পায়ে পড়তে নেই।'

তা ছাড়া, বড় অভিমান আসে সন্ন্যাসে।

'বড় অভিমান—' বলছেন শ্রীমা : 'আমায় প্রণাম করলে না, মান্য করলে না, হেন করলে না! তার চেয়ে বরং,' নিজের শাদা কাপড়টি লক্ষ্য করলেন, 'এই আছি বেশ। ত্যাগ বাইরে দেখিয়ে কি হবে, ত্যাগ অন্তরে। বৃন্দাবনে গৌর শিরোমণি কালাবাবুর কুঞ্জে দেখা করতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে। শুনলুম বুড়ো বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছেন, যখন ইন্দ্রিয়ের প্রভাব কমে গিয়েছে। রূপের অভিমান, গুণের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, সাধুর অভিমান কি যায় বাছা!'

মুক্তির চেয়েও ভক্তি বড়। ভক্তি সব কিছুর চেয়ে বড়।

'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখছেন মা। রয়েল বক্সে জায়গা করে দিয়েছে গিরিশ। মা দেখবেন বলে বহুদিন পরে বিশেষ রজনীর আয়োজন হয়েছে। জগাই অর্ধেন্দুশেখর, আর মাধাই সেজেছে গিরিশ নিজে। ভূষণ আর থিয়েটারে নেই, অবসর নিয়েছে, তবু মা দেখবেন বলে একরাতের জন্যে নিমাই সেজেছে। এক পয়সা মজুরি নেবে না। নিতাইয়ের পার্টে সুশীলা। ষোলোকলা ভরপুর।

ভূষণকে দেখিয়ে মা বলছেন, 'মেয়েটিকে দেখলুম ভক্তিমতী। ভক্তি না থাকলে কি হয় গা? নিমাই—তা ঠিক নিমাই, কে বলবে মেয়েমানুষ?'

আবার দেখছেন জগাই-মাধাইকে। বলছেন, 'ওদের মত ভক্ত কে? রাবণের মত ভক্ত কে? হিরণ্যকশিপুর মত ভক্ত কে? এই দেখ না, গিরিশবাবু ঠাকুরকে কত গাল দিতেন—তা, ওঁর মত ভক্ত কে? এঁরা সব ঐ ভাবে এসেছেন। ভক্ত হওয়া কি কম কথা? ভক্তি কি অমনিই হয়?'

লক্ষ্মী সঙ্গে ছিল, লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'হ্যাঁ রে লক্ষ্মী, সেটা কি? মুক্তি দিতে কাতর নই—'

লক্ষ্মী সুর করে গাইলে, 'মুক্তি দিতে কাতর নই গো, ভক্তি দিতে কাতর হই—'

... একুশ ...

বৃন্দাবনেই শুনতে পেলেন ত্রৈলোক্য বিশ্বাস যে টাকা সাতটি দিত, দীনু খাজাঞ্চি তা বন্ধ করে দিয়েছে।

'বন্ধ করেছে করুক।' মা বললেন উদাসীনের মত : 'এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা নিয়ে আর আমি কী করব!'

কলকাতায় ফিরে বলরামের বাড়িতে থাকলেন কয়েকদিন। এবার ঘরে চলো। চলো সেই মাটির স্বর্গধামে। কামারপুকুরে।

সঙ্গে গোলাপ-মা আর যোগেন।

বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেন ভাড়া জুটেছে, তারপরে আর পয়সা নেই। উচালন সেখান থেকে পাক্কা ষোলো মাইল। হাঁটা ছাড়া আর গতি নেই। ট্রেন ভাড়ার অভাবে সেই ষোলো মাইল রাস্তাই হাঁটলেন মা। রাজরানী হয়ে চলেছেন অনাথিনীর মত।

পা দুটো আর টানতে পারছেন না কিছুতেই। খিদের কষ্টে বসে পড়েছেন পথের পাশে। সাবর্ণ-চৌধুরীদের ছেলে সন্ন্যাসী যোগানন্দ তাই দেখছে অসহায়ের মত।

রিক্তহস্ত সর্বত্যাগী সন্তান দেখছে মা'র এই কায়ক্লেশ।

বসে-বসে গোলাপ-মা খিচুড়ি রাঁধল। খেতে-খেতে ছোট মেয়েটির মত মা আনন্দে উছলে উঠলেন, 'গোলাপ, এ একেবারে অমৃতের মতন লাগছে।'

তিন দিন পরে চলে গেল যোগেন।

সারা গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেল। বিধবার পরনে কিনা পাড়ওলা শাড়ি, হাতে বালা! এ কি কেলেঙ্কার! গোলাপ-মা যতদিন ছিল সেই লোকনিন্দার আঁচ লাগতে দেয়নি মা'র গায়ে। সমস্ত আঘাত ঠেকিয়ে এসেছে একা-একা। কিন্তু যেই মাসখানেক পর চলে গেল নিন্দুকের দল আবার বিষমুখ

হয়ে উঠল। তখন এগিয়ে এল প্রসন্নময়ী—লাহাদের বোন, ঠাকুরের বাল্য-কালের সখী।

'জানো এ কে?' গর্জে উঠল প্রসন্ন। 'এ গদাইয়ের বউ।'

কে না জানে! গদাইয়ের বউ বলেই তো বলছি এত কথা।

'এ কী তোমাদের মত সাধারণ? এ দেবী, ঈশ্বরী।'

তখনকার মত চুপ করে গেল সকলে।

তবু মা খুলতে গিয়েছিলেন হাতের বালা। ঠাকুর বাধা দিলেন। গৌরদাসী এসে বুঝিয়ে দিল শ্রীমতী শাশ্বতকালেই শ্রীমতী।

লোকনিন্দার চেয়েও দুঃখদাতা দারিদ্র্য। ঠাকুর বলেছিলেন শেষ দিকে, 'আমি চলে যাবার পর তুমি কামারপুকুরে গিয়ে থাকবে। শাক-ভাত যা জোটে তাইতে পেট চালাবে আর দিন-রাত হরিনাম করবে।'

সে কথাই কিনা অক্ষরে-অক্ষরে ফলল! শুধু শাক-ভাত! হায়, নুন কেনবার পয়সা নেই একটাও।

দরিদ্রতমের চেয়েও দরিদ্র। তেল-মশলা দূরস্থান, এক কণা নুন জোটে না জগজ্জননীর।

বাড়ির সামনের মাটিটুকু নিজহাতে কোপান কোদাল দিয়ে। শাক ফলান। নিজেই কটি ধান কুটে চাল করেন। ভাত রেঁধে ঠাকুরকে আগে নিবেদন করেন। শ্মশানের ভূতনাথ তাই গ্রহণ করেন প্রসন্নমনে। সেই প্রসন্নতাই সমস্ত ব্যঞ্জনের নুন।

তবু এই ঘোরতম দারিদ্র্যের কথা কাউকে জানতে দিচ্ছেন না ঘৃণাক্ষরে। কতদূরেই বা জয়রামবাটি, তাঁর মাকে পর্যন্ত না।

শ্যামাসুন্দরী খবর পাঠালেন, একবার আমাকে দেখিবি আয়।

কে কাকে দেখে। মেয়েকে দেখে শ্যামাসুন্দরী আঁতকে উঠলেন। এ যে একেবারে ভিখিরিনীর মূর্তি। পরনে ছেঁড়া ময়লা শাড়ি, মাথায় রুক্ষ জট-পাকানো চুল, রোগা মলিন চেহারা। ছুটে গিয়ে মেয়ের হাত ধরলেন। বললেন, 'এ কী হয়েছিস তুই।'

সারদামণি হাসলেন। দরিদ্রতা দেখছ বটে, সে সঙ্গে প্রসন্নতাও দেখ। আর্তনাদ শুনে কি করবে, শোনো এই স্তব্ধতার গীতিকা।

অনেক পীড়াপীড়ি করলেন, এখানে আমার কাছটিতে থাক। তোর চুলে তেল মেখে দি, চেহারায় ফিরিয়ে আনি স্নিগ্ধতা। সারদামণি রাজী হলেন না কিছুতেই। শাকান্নে যে নুন জুটছে না, তবুও। মা'র কাছ থেকে

চাইলেন না একটু নুন-তেল, কটা বা খুচরো পয়সা। ঠাকুর যে অভাবে রেখেছেন এই আমার প্রাচুর্য-প্রতুল।

'কী করবি তবে তুই?'

'কামারপুকুরে ফিরে যাব। ঠাকুরের যা ইচ্ছে তাই হবে।'

ঠাকুর বলতেন, আমাকে যে স্মরণ করে তার কখনো খাওয়ার কষ্ট থাকে না।

তিনি নিজে বলেছেন?

'হ্যাঁ, তাঁর নিজের মুখের কথা।' বললেন মা, 'তাঁকে স্মরণ করলে কোনো দুঃখ থাকে না। দেখছ না, তাঁর ভক্তেরা সবাই ভালো আছে। এই তো কাশী-বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষে করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে বেড়ায়। তাঁর ভক্তের মত এমনটি কোথাও দেখা যায় না।'

কিন্তু তুমি? তুমি যে কষ্ট পাচ্ছ?

মা হাসলেন। যে মুহূর্তে একে কষ্ট ভাবব সেই মুহূর্তে ঠাকুর তার ব্যবস্থা করবেন।

সেই স্তব্ধতার দেয়ালে ছিদ্র হল। ছিদ্র হল সেই আত্মবিলুপ্তির অন্ধকারে। একা-একা আছেন, প্রসন্নময়ী একটি ঝি পাঠিয়ে দিল মা'র কাছে। তাঁকে দেখতে-শুনতে, রাতে পাহারা দিতে। সেই প্রথম বাইরে খবর নিয়ে গেল।

মা'র ভাই প্রসন্নকুমার কলকাতায় পুরোতগিরি করে, তার কানে উঠল। সে খবর দিলে রামলালকে। রামলাল খেপে উঠল, তোমরা ভাই হয়ে বোনের দুর্দশার লাঘব করছ না? এত কাছাকাছি তোমাদের বাড়ি, উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা করতে পার না এতটুকু?

ক্রমে খবর পেঁছুল গোলাপ-মাকে। ভাত খেতে মা'র নুন নেই। অস্থির হয়ে উঠল গোলাপ-মা। কী করতে আছ সব ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ, গৃহী আর সন্ন্যাসী? তোমাদের মা রয়েছেন অর্ধাশনে। যিনি সর্বসাম্রাজ্য-দায়িনী তিনি রয়েছেন দীনদুঃখিনীর মত।

চাঁদা উঠতে লাগল। চিঠি গেল মা'র কাছে, সনির্বন্ধ চিঠি, ভক্তদের নাম করে, তুমি চলে এস কলকাতায়। আমাদের মা হয়ে কেন তুমি দূরে থাকবে?

আধা-বয়সী বিধবা, মোটে চৌত্রিশ বছর বয়স, কি করে থাকবে সব অনাত্মীয় ভক্তদের সংশ্রবে? গাঁয়ের সমাজ আবার আলোড়িত হয়ে উঠল।

'ওমা, সেই সব অল্পবয়সের ছেলে, তাদের মধ্যে কি করে থাকবে!' বলাবলি করতে লাগল সকলে।

মা-ই নিজে ঢিল ছ্ঁড়েছেন মৌচাকে। তার মানে আছে। সমাজ কি বলে একবার শ্ুনতে হয়। ব্ঝতে হয় হাওয়া-বওয়ার দিক কি।

কেউ-কেউ আবার কটাক্ষটি ল্ুকিয়ে রেখে সরল চোখে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'তা যাবে বৈ কি। তারা হল সব শিষ্য!'

মা কেবল শোনেন। কথা কন না।

এমন সময়, এবারো, প্রসন্নময়ী এল উদ্ধার করতে। বললে, স্বরে আন্তরিকতার সমস্ত স্ুধা ঢেলে দিয়ে বললে, 'তারা হচ্ছে তোমার ছেলে। যাবে বৈ কি, নিশ্চয় যাবে।' আনাচে-কানাচে আড়ি পেতে দাঁড়ানো সমাজের লোকদের লক্ষ্য করে বললে, 'এরা এখনো গদাইয়ের মর্মই বোঝেনি। গদাইয়ের স্ত্রীর মর্ম তো আরো কঠিন।'

প্রসন্নময়ীর ম্ুখের উপর কেউ কিছ্ু বলতে পারল না। মা জোর পেলেন। শ্যামাস্ুন্দরীও দ্বিধা করেছিলেন গোড়ার দিকে, সে দ্বিধা কেটে গেল। মত দিলেন ম্ুক্ত মনে।

সারদামণি চলে এলেন কলকাতা।

গঙ্গাতীরে নয় বেল্ুড়ে নয় বাগবাজারে ভাড়াটে বাড়িতে থাকতে লাগলেন। কখনো বা বলরাম বোসের বাড়িতে, কখনো বা মাস্টার মশাইয়ের। যদ্দিন পর্যন্ত না উদ্বোধন-আফিস তৈরি হল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখেছি, শ্ুনেছি তাঁর কথা, তিনি না হয় মহাপ্ুর্ুষ, কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কেন? এমন কথাও বলতে লাগল কেউ-কেউ। মহাপ্ুর্ুষের স্ত্রী হলে ব্ুঝি তিনিও একজন লক্ষ্মী-সরস্বতী হয়ে গেলেন!

না, না, আমি কে, আমি কি, আমি কেউ নই কিছ্ু নই। মা আত্ম-ল্ুপ্তির ঘোমটা টানলেন আরো ঘন করে। নিজেকে ঠাকুর বলতেন রেণ্ুর রেণ্ু। আমি অণ্ুর অণ্ু। যদি ঠাকুরকে দেখ, ঠাকুরকে মানো, তা হলেই হল। ঠাকুর যেট্ুকু ভার দিয়েছেন আমার উপর, সেট্ুকু করতে পারলেই আমার হয়ে গেল।

সে যে অনন্ত কাজ!

'দেখল্ুম একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে যাচ্ছে—রাধি তাকে মারবে।' বলছেন মা : 'কিন্তু দেখল্ুম কি তা জানো? দেখল্ুম সেটা পিঁপড়ে নয়, ঠাকুর।

ঠাকুরের সেই হাত-পা মুখ-চোখ সব সেই! রাধিকে আটকালুম, খবরদার মারতে পারবিনে। ভাবলুম, সব জীব যে ঠাকুরের, সব জীবই ঠাকুর। আমি আর কী করতে পাচ্ছি, কজনকে দেখতে পাচ্ছি? তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন। সকলকে দেখতে পারতুম তবে তো হত!'

বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্জের বাড়িতে আছেন তখন মা, পঞ্চতপার আয়োজন হল। পঞ্চতপা কি? তা কি মা-ই জানেন!

কামারপুকুরে থাকতে মা প্রায়ই একটি মেয়েকে দেখতেন, এগারো-বারো বছর বয়স, মা'র সঙ্গে-সঙ্গে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে। কাজ-কর্ম করে দিচ্ছে, এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছে কাজের জিনিস। কখনো-কখনো বা আমোদ-আহ্লাদ করছে। এখন ঠাকুর গত হবার পর দেখা দিচ্ছে এক দাড়িওলা সন্ন্যাসী। বলছে, পঞ্চতপা করো। সে আবার কী কথা! প্রথম-প্রথম খেয়াল করেননি মা। কিন্তু কানের কাছে মুখ এনে বারে-বারে বলছে সন্ন্যাসী, পঞ্চতপা, পঞ্চতপা!

পঞ্চতপা কাকে বলে? জিগগেস করলেন যোগেন-মাকে।

যোগেন-মা খবর নিয়ে এলেন। পঞ্চ বহ্নির তপস্যা। চার দিকে চার অগ্নিকুণ্ড জেবলে বসতে হবে। আর মাথার উপর জবলন্ত সূর্য, পঞ্চম হুতাশন। এমনি ভাবে আগুনের মধ্যে বসে ধ্যান আর প্রার্থনা। তার নাম পঞ্চতপা। যোগেন-মা বললেন, 'আমিও করব।'

পঞ্চতপার যোগাড় হল। চার দিকে ঘুঁটের আগুন, মাথার উপরে খাড়া রোদ। ভোরবেলা স্নান করে ঢুকতে হবে সেই আগুনের মধ্যে, বেরুতে হবে সূর্য অস্ত গেলে। স্নান সেরে এসে মা দেখলেন আগুন গনগন করে জবলছে। বড় ভয় হল, কি করে ঢুকবেন ওর মধ্যে, আর বেরুতে সেই তো সন্ধ্যে। পারব? পারব স্থির থাকতে?

জয় ঠাকুরের জয়। ঠাকুরের নাম করে ঢুকব, ভয় কি। পুড়তে হলে পুড়ব মরতে হলে মরব, থাকব স্থির হয়ে। অগ্নিতে ঠাকুরের কেমন স্পর্শ, তাই বুঝব এবার সর্বাঙ্গে।

ঠাকুরের নাম করে ঢুকে পড়লেন অগ্নিব্যূহে। ঢুকে দেখলেন আগুনে তেজ নেই। সূর্যও স্নেহস্তিমিত!

সাত-সাত দিন করলেন এমনি পঞ্চতপা। গায়ের বর্ণ কালো ছাই হয়ে গেল। সেই সন্নেসীও বিদায় নিলে।

পঞ্চতপা করে কি হয়?

কে জানে কি হয়! পার্বতীও করেছিলেন শিবের জন্যে। রাবণবধের পর রাম বিভীষণকে বলেছিলেন লঙ্কায় রাজা হয়ে বসতে। তা শুধু লোক-শিক্ষার জন্যে। বিভীষণ যে এত রামভক্তি দেখাল তার ফল কী হল? লঙ্কার সিংহাসন পেলে। 'তেমনি এসব করা লোকের জন্যে।' বললেন মা হেসে-হেসে, 'নইলে লোকে বলবে, কই সাধারণের মত খায়-দায় আছে। একটা ব্রত-নিয়মও করে না!'

আবার গোপন করলেন নিজেকে।

... বাইশ ...

আর যাই করো, কামারপুকুরের বাড়িটি যেন খাড়া রেখো। বলেছিলেন ঠাকুর। ভক্তরা তোমাকে যতই অট্টালিকা দিন, কামারপুকুরের কুঁড়েঘরটিকে যেন ভুলো না।

যখন যেটুকু দরকার ঠিকমত মেরামত করাচ্ছেন ঘর-দুয়ার। সব সময়ে এঁকে রেখেছেন চোখের উপর। অটুট করে, নিখুঁত করে।

কিন্তু এমন বিধান যেতে পাচ্ছেন না কামারপুকুর। কলকাতা থেকে যখনই ছাড়া পাচ্ছেন আসছেন বাপের বাড়ি, জয়রামবাটি।

এক ভক্ত একবার জিগগেস করেছিলেন মাকে, 'যখন আসেন একবারও ঠাকুরের বাড়ি নয়, কেবল বাপের বাড়ি। এ কি আপনার চিরকালের ধারা?'

'তা নয় বাবা, ঠাকুরের বাড়ি আমার ঠাকুর-বাড়ি। তা কি পারি কখনো ভুলতে? তা ছাড়া শিবু আমার ভিক্ষে-পুত্র।' বললেন মা গাঢ় স্বরে, 'তবে বাবা, গেলে বড় কষ্ট হয়। সব দেখব, ঠাকুরকেই শুধু দেখতে পাব না।'

একবার শিবু কি এক কাণ্ড করল দেখ না!

এই সেদিন কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটি আসছি। সঙ্গে শিবু, হাতে পুঁটলি। জয়রামবাটির প্রায় কাছাকাছি এসেছি, মাঠের মধ্যে শিবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পিছনে কারু পায়ের শব্দ না পেয়ে মা তাকিয়ে দেখলেন, শিবু দাঁড়িয়ে আছে। ও কি রে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এগিয়ে আয়। শিবু বললে, একটা কথা যদি বলো তাহলে আসতে পারি। সে কি রে, কী কথা? শিবু জিগগেস করলে, 'তুমি কে বলতে পারো?'

'আমি আবার কে! আমি তোর খুড়ি।'

'তবে যাও, এই তো বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।' শিবু কাঠ হয়ে রইল।

'দেখ দেখি, আমি আবার কে!' মা বড় ফাঁপরে পড়লেন। 'আমি মানুষ তোর খুড়ি।'

'বেশ তো, তুমি যাও না!' উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এক পাও নড়বে না শিবু।

'লোকে বলে কালী।'

'কালী তো? ঠিক?' শিবু নড়ে-চড়ে উঠল।

তাকে প্রবোধ দেবার জন্যেই হয়তো কে জানে মা বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

'তবে চলো।' বাকি মাঠটুকু শিবু পার করিয়ে নিয়ে এল খুড়িকে।

তা ছাড়া, বাপের বাড়িতে না গিয়ে উপায় নেই। মা'র ভায়েদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। চার ভাই, প্রসন্নকুমার, বরদাপ্রসাদ, কালীকুমার আর অভয়-চরণ। কারুর তেমন কোনো অবস্থা নেই, শুধু পৈত্রিক সম্পত্তিটুকু আঁকড়ে আছে। কাজে-কাজেই তাই নিয়ে চার ভাইয়ে ঝগড়া-মারামারি। এখন দিদি এসে যদি একটা মিটমাট করিয়ে দিতে পারেন!

দিদি এসে ঠাঁই নিলেন ওদের সংসারে। যদি ওদের সংসারে একটু শান্তি-শ্রী আসে। শ্যামাসুন্দরী বুড়ো হয়েছেন, ভায়ের বউয়েরা ছোট-ছোট, তাদের কাউকে কাজ করতে হয় না, সব একা সারদামণি করেন। ধান সেদ্ধ করেন, রাঁধেন, ভায়েদের ছেলেমেয়ের পরিচর্যা করেন পর্যন্ত। গিরিশ ঘোষ বলে, ভায়েরা বিগতজন্মে অনেক পুণ্য করেছিল নইলে কি এত সেবা এত স্নেহের অধিকারী হয়!

ভায়েদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ। তারই জন্যে অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয় অকারণে, এক পক্ষে হেললে আরেক পক্ষ গাল পাড়ে। নীরবে সব সহ্য করেন সারদামণি। তাঁর সেবাস্পর্শে যদি তাদের শুভ হয় কোনোদিন অপেক্ষা করেন তার জন্যে।

শ্যামাসুন্দরী মারা গেলেন। সংসারে এবার বড় করে চিড় ধরল। ভায়েদের মধ্যে বেড়ে গেল মনান্তর, ভায়ের বউদের মধ্যে বেড়ে গেল গালিগালাজ। শরৎ মহারাজকে ডাকিয়ে আনালেন কলকাতা থেকে। বললেন, এদের মধ্যে একটা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দাও।

আপোষে বিভাগ-বণ্টন করে দিলেন সারদানন্দ। মাকে জিগগেস করলেন, আপনি কোথায় থাকবেন?

মা বললেন, 'কখনো এ ঘর কখনো ও ঘর। কখনো প্রসন্ন কখনো কালী।'

কিন্তু মা'র বেশির ভাগ মন প্রসন্নর দিকে। তার কারণ প্রসন্নর প্রথম পক্ষের দুটি ছোট-ছোট মেয়ে, নলিনী আর মাকু। প্রসন্নর দ্বিতীয় পক্ষের বউয়ের অল্প বয়স, কি করে সব তদারক করে! তাই মা'র মন তাদের উপর গিয়ে পড়েছে।

ভাগ-বাঁটোয়ারার পরেও ঝগড়া শেষ হল না ভায়েদের। এখন দিদিকে নিয়ে টানাটানি। দিদির এখন অনেক পসার, তাঁর খরচের জন্যে ভক্তেরা আজকাল পাঠাচ্ছে টাকা-পয়সা, তাই এখন তার উপর লোভ। ভায়েদের এলাকার বাইরে নিজের জন্যে এক খোড়ো চালের মাটির ঘর তৈরি করে নিয়েছেন, তারই চারধারে কেবল ঘুরঘুর করে মরছে, যদি টাকাটা-সিকেটা ছুঁড়ে দেন কখনো। দয়া করে না হোক, অন্তত বিরক্ত হয়ে।

অথচ দিদির সুখ-সুবিধের দিকে নজর নেই এতটুকু। সেবার কয়েক-জন ভক্ত নিয়ে আসছেন জয়রামবাটি, আগে খবর দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভায়েরা কোনো লোক পাঠায়নি নদীর ঘাটে. একটাও লোক পাঠাতে পারলে না? লোক না পাও, নিজেরা যেতে পারলে না কেউ? আমার ছেলেরা নতুন আসছে, একটা লোকের অভাবে কত অসুবিধে বলো দেখি? কে কার কথা শোনে! এ বলে আমি যাইনি, পাছে অন্য ভাই মনে করে আমি তোমাকে হাত করবার চেষ্টা করছি। ও-ও বলে সেই কথা। সব ভায়েরই এক রা। কিন্তু চাটুক্তিতে সবাই সমান পটু। বলছে সমস্বরে, 'জানি না তুমি কী অমূল্য রত্ন? তোমাকে ভগ্নীরূপে পেয়েছি এ আমাদের জন্মান্তরের সৌভাগ্য। যেন পরজন্মেও তুমি বোন হয়ে আস আমাদের সংসারে।'

মা ঝামটা দিয়ে উঠলেন : 'আবার তোমাদের সংসারে আসব? রক্ষে করো। ঢের হয়েছে। যেন পথ ভুলেও না আসি। বাবা ছিলেন রামভক্ত আর মা ছিলেন মূর্তিমতী করুণা, তাই জন্মেছিলাম তোমাদের সংসারে। আর নয়—আর নয়।'

কেবল টাকা চায়। আলু-মুলো চায়। ভুল করেও একবার জ্ঞান-ভক্তি চাইল? বিবেক-বৈরাগ্য চাইল? ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইল?

একদিন তো কালীতে বরদাতে হাতাহাতির উপক্রম। গালাগালিতে

ক্ষান্ত হবার নয়, এবার মারামারি। নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ দেখবেন এই হুলুস্থুল? ঝাঁপিয়ে পড়লেন দু ভায়ের মধ্যে, একবার একে বকেন আরেকবার ওকে বকেন, শেষকালে দুজনকে ঠেলে দিলেন দু দিকে। একে-অন্যের মুণ্ডুপাত করতে-করতে যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকল। মা আবার তাঁর দাওয়াতে গিয়ে বসলেন।

কেন কে জানে হেসে উঠলেন উচ্চরোলে। বলে উঠলেন আপন মনে : 'কী খেলাই খেলছেন মহামায়া! মৃত্যুতে সব পড়ে থাকবে, তবু তা জেনেও মানুষ পুঁটলি বাঁধছে। অনন্ত বিশ্ব জেগে আছে চোখের সামনে, তাকিয়েও দেখছে না।' বলার পর আবার হাসি। হাসির পর হাসি।

বাইরে শান্ত মূর্তি, কিন্তু ভিতরে সংহার বেশ।

শিবরাম বাড়ি নেই, রামলালের অমত, শিবরামের বউ মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে। ঠিক করেছে নিচু ঘরে। লাহাবাবুদের নাকি সায় আছে এ ব্যাপারে। মায়ের ভক্তেরা কেউ-কেউ জানতে পেরেছে ষড়যন্ত্র। ভাবছে কি করে উদ্ধার করা যায় মেয়েটাকে। কোথায় মেয়ে, লুকিয়ে রেখেছে শিবরামের বউ। কিন্তু রামলাল-দাদার বিপদ, যে করে হোক মান বাঁচানো চাই। কায়দা করে ঘরের তালা খুলে ফেলল ভক্তেরা, মেয়েটাকে উদ্ধার করে একেবারে জয়রামবাটির দিকে পাড়ি দিল। একেবারে মা'র দরবারে গিয়ে পেশ করলে।

বাষ্প পর্যন্ত জানেন না মা, কি ভাবে নেবেন ব্যাপারটা, ভয় ছিল ভক্তদের। জিগগেস করলেন, 'রামলাল জানে?'

তাঁরই অমতে বিয়ে হচ্ছিল। তাঁরই কথায় উদ্ধার করেছি পাঁচিকে।

তা হলে আর ভাবনা কি। ঠিক করেছ। মা আশ্বাস দিলেন।

'কিন্তু লাহাবাবুরা বোধহয় অসন্তুষ্ট হবেন।' বললে একজন ভক্ত। 'জমি কিনে ঠাকুরের মঠ-মন্দির করতে হবে, হয়তো তাতে বাধা দেবেন।'

আরেকজন বললেন, 'দিন বাধা! ওখানে নাই বা হল! কত জায়গায় কত মঠ-মন্দির হবে!'

'সে কি কথা গো?' মা রুক্ষ হয়ে উঠলেন : 'কামারপুকুর মহাতীর্থ। ঠাকুরের জন্মস্থান, পুণ্যস্থান, মহাপীঠস্থান—সেইখানেই তো আসল মন্দির। যাত্রাসিদ্ধির মন্দির।'

মা যখন বলেছেন তখন মন্দিরের আর ভাবনা নেই। কিন্তু শিবরামের বউ এখন কি করবে কে জানে।

'ছোট বউ খেপে গিয়ে ঘরে না এখন আগুন ধরিয়ে দেয়!'

'তা হলে বেশ হবে। বেশ হবে।' অদ্ভুত একটি ভাব ধরলেন মা। কথার স্তরে-স্তরে রুদ্র রূপের তীব্রতা স্পষ্টতর হতে লাগল : 'ঠাকুর যেমনটি ভালোবাসেন তেমনটি হবে। ঠাকুর শ্মশান ভালোবাসেন, সব শ্মশান হয়ে যাবে।' বলেই হাসতে শুরু করলেন—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

একটু যেন বেশিক্ষণ হাসলেন। চারদিক ত্রাস-স্তব্ধ হয়ে রইল। যে যেখানে ছিল হাসি শুনে নিশ্বাস বন্ধ করলে।

সহসা থেমে পড়লেন। চাপা দিলেন, ঢাকা দিলেন। পাড়লেন অন্য কথা ধরলেন স্নেহময়ী মৃন্ময়ী রূপ।

বরদার স্ত্রীকে বলছেন, 'তোরা একটা-আধটা ছেলে নিয়ে ন্যাতা-জোবড়া হয়ে থাকিস, মানুষ করতে পারিসনে। আর আমি না বিইয়ে কানাইয়ের মা। হাজার-হাজার ছেলেমেয়েকে মানুষ করে দিতে হচ্ছে। কেউ সাধু কেউ অসাধু—হয়তো মাথা খারাপ করে বলছে, মা, আমার কিনারা কর। এ সব তোরা বুঝবি কি? তোরা জানিস শুধু টাকা-পয়সা, ধান-মরাই, বাড়ি-ঘর। তোরা যেমনটি আছিস তেমনটিই যাবি। ভাগ্যে মনুষ্যজন্ম হয়। সেই মনুষ্যজন্ম তোরাও পেয়েছিলি, কিন্তু করলি কি?'

আরো একবার হেসে উঠেছিলেন মা।

প্রথম মহাযুদ্ধের খবর শুনছেন। শুনতে পেলেন বহু লোকক্ষয় হয়ে গিয়েছে। অমনি, কেন কে বলবে, হাসতে শুরু করলেন। প্রথমে মৃদু, পরে ভয়ঙ্কর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—সেই প্রলয়প্রবল অট্টহাস। ঘর-দোর কাঁপতে লাগল সেই হাসির শব্দে। মেয়েরা যারা উপস্থিত ছিল, গোলাপ-মা আর কারা-কারা, গলবস্ত্র হয়ে জোড় হাতে কাতর প্রার্থনা করতে লাগল : 'সম্বর, সম্বর!'

মা আবার স্বাভাবিক পরিমিতিতে নেমে এলেন। আবার সেই মাতৃ-মূর্তি।

তেঁতুলতলায় খাটের উপর বসে আছেন, একটা ডোমের মেয়ে কেঁদে পড়ল মায়ের কাছে। যার জন্যে ছেড়েছুড়ে চলে এসেছিলাম ঘর-দোর, সেই এখন আমাকে ফেলে যাচ্ছে পথের ধুলায়। এর কি, মা, বিচার নেই?

সেই লোকটিকে ডেকে পাঠালেন মা। সস্নেহে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'ও তোমার জন্যে যথাসর্বস্ব ফেলে এসেছে আর তুমিই কিনা আজ ওকে ত্যাগ করে যাচ্ছ? এতকাল সেবা নিয়েছ ওর, আজ আর ওর দাম নেই

এক কড়া? ওকে যদি এখন ত্যাগ করো, তোমার মহা অধর্ম হবে, নরকেও স্থান হবে না।'

ডোমের মেয়ের হাত ধরল তার ঘরের লোক। ঘরে ফিরে গেল দুটিতে।

...তেইশ...

ভায়েদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অভয়। এই যা লেখাপড়া শিখেছিল, মানুষ হয়েছিল। পাশ করেছিল ডাক্তারি। কিন্তু এমন ভাগ্যের ফের, কলেরা হয়ে মারা গেল। স্ত্রী সুরবালা, পেটে তার তখন সন্তান। মরবার সময় মাকে বলে গেল অভয়, ওদের তুমি দেখো দিদি। ওদের আর কেউ নেই।

মা মুষড়ে গেলেন। কিন্তু শোকের চেয়েও ঘোরতর যে শঙ্কা, তাই আচ্ছন্ন করল মাকে। সুরবালা পাগল হয়ে গিয়েছে।

পাগল অবস্থায় একটি মেয়ে প্রসব করলে। এই মেয়েই রাধারানী বা রাধু।

ঠাকুরের দেহ যাবার পর মন তখন হু-হু করছে, হঠাৎ দেখতে পেলেন লাল কাপড় পরা একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখিয়ে বললেন, একে আশ্রয় করে থাকো। আর দেখা গেল না মেয়েটিকে। তারপর আবার একদিন বসে আছেন, দেখতে পেলেন, রাধুর মা, পাগলী সুরবালা কতগুলো কাঁথা বগলে করে টানতে-টানতে যাচ্ছে, আর হামা দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে তার পিছনে যাচ্ছে রাধু। মা'র বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে রাধুকে তুলে নিলেন। মনে হল, একে আমি না দেখলে আর কে দেখবে? বাপ নেই, মা পাগল। এই মনে করে যেই ওকে তুলে নিয়েছেন কোলে, ঠাকুর দেখা দিলেন চোখের সামনে। বললেন, 'এই সেই মেয়ে। একে আশ্রয় করে থাকো। এই যোগমায়া।'

আপশোষ করে বলছেন মা, 'কি জানি বাবা, আগে-আগে ও বেশ ছিল। আজকাল নানা রোগ, বিয়েও হল। এখন ভয় হয় পাগলের মেয়ে না পাগল হয় শেষকালে। শেষটায় কি একটা পাগলকে মানুষ করলাম?'

গৌরী-মা দুর্গা বলে মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে মা'র কাছে। মেয়েটি যেন অনাঘ্রাত ফুল। তাকে দেখে মা'র আনন্দ আর ধরে না। বললেন, 'দেখ মা, চড় খেয়ে রাম নাম অনেকেই বলে কিন্তু শৈশব হতে ফুলের মত মনটি যে ঠাকুরের পায়ে দিতে পারে, সেই ধন্য। গৌরদাসী কেমন তৈরি করেছে মেয়েটিকে। ভায়েরা বিয়ে দেবার বহু চেষ্টা করেছিল। গৌরদাসী ওকে লুকিয়ে নিয়ে হেথা-সেথা পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াত। শেষে পুরী নিয়ে গিয়ে জগন্নাথের সঙ্গে মালা বদল করে সন্ন্যাসিনী করে দিলে। সতী লক্ষ্মী মেয়ে, কেমন লেখাপড়াও শিখেছে দেখ না! কি একটা সংস্কৃত পরীক্ষাও দেবে শুনছি।'

পরে তাকালেন রাধুর দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন হয়তো। বললেন, 'এই রাধুকে নিয়েই আমার কত মায়া দেখ না। গৌরদাসী কেমন তার মেয়েকে তৈরি করেছে, আর আমি একটা বাঁদরী তৈরি করেছি।'

তখন কে জানত বাঁদরী হবে না দুর্গা হবে! ছুটে জয়রামবাটিতে গিয়ে দু বাহুর মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন। রাধুকে পাশে না বসিয়ে খাওয়া নেই, পাশে না শুইয়ে শোয়া নেই। চক্ষের প্রতি পলকে রাধু, বুকের প্রতি নিশ্বাসে রাধু। পিসিকেই রাধু মা ডাকে, আর সুরবালাকে নেড়ী-মা।

মহামায়া কি ভাবে বাঁধা পড়লেন নিজের ফাঁদে। যার তিন কুলে কেউ নেই তাকে দিয়েও বেড়াল পুষিয়ে সংসার করান।

সংসার কি বস্তু, বুঝুন এবার হাতে-কলমে। বুঝবেন বলেই তো সংসারীর প্রতি এত ক্ষমা, এত দয়া, এত বাৎসল্য। যদি সন্ন্যাসিনী হয়ে বাইরে চলে যেতেন, মা হতেন কি করে? মা হয়ে যদি সংসারের কষ্ট নিজে না বোঝেন কি করে বুঝবেন তবে সন্তানের যন্ত্রণা? তাই তো ভুগলেন দারিদ্র্য, পেলেন শোকদহন, সইলেন রোগজ্বালা। নিজেকে জড়ালেন মায়াজালে। রাধু মাকু আর নলিনী। সমস্ত রকমে বুঝলেন সংসারের বিষস্বাদ। বুঝলেন বলেই তো সবাইকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে। সবাইকে রক্ষা করলেন।

আমবাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন। বলছেন, 'আমবাতের জ্বালায় গেলুম মা, মুখেও আবার বেরিয়েছে। এই দেখ মুখে হাত বুলিয়ে। এ কি যাবে না? এই দেখ পিঠেও উঠেছে, দাও তো ঐ তেলটি দিয়ে। ঐটি আমার প্রাণ গো, দিলেই একটু কমে।'

তার পরে বাত—তার পরে জ্বর।

'কিন্তু রোগ তো রোগ নয়,' বলছেন মা, 'রোগ হচ্ছে যোগ।'

রোগ হওয়া মানেই তো আরোগ্যের কামনা। সেই আরোগ্যকামনাই তো ঈশ্বরমনন। আরোগ্য কেমন আস্বাদ্য সেটুকু বোঝবার জন্যেই তো রোগ। প্রভাতে জেগে ওঠাটি কী আনন্দময় সেটি বোঝবার জন্যেই তো রাত্রির ঘুম-মরণ।

জয়রামবাটিতে মাকুর ছেলের খুব অসুখ, ডিপথিরিয়া হয়েছে।

সত্ত্বগুণের ছেলে। মাকু বলেছিল, ছেলে ঘুমোয় না, বলে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছিল মুখের উপর। মা বলেছিলেন, কি করে ঘুমুবে! ও যে সত্ত্বগুণের ছেলে।

যখন মাকুর সঙ্গে জয়রামবাটি যায়, কোত্থেকে কতগুলো গুলঞ্চ ফুল কুড়িয়ে এনে মা'র পায়ে ঢেলে দিলে। বললে, 'দেখ পিসিমা, কেমন হয়েছে।'

তার পরে, আশ্চর্য, শুধু মা'র পায়ের ধুলোই নিল না, ফুলগুলি জামার পকেটে পুরলে।

শরৎ মহারাজকে 'লাল মামা' ডাকে। তার কোলের উপর চড়ে বসে। বলে, 'তোমার মা কোথায়?'

শরৎ মহারাজ মাকুকে ইঙ্গিত করে। বলে, 'এই যে আমার মা।'

'উহুঁ।' ছেলে ঘাড় নাড়ে বিজ্ঞের মত। বলে, 'তোমার মা স্কুল-বাড়িতে গেছে।'

মাকে জিগগেস করে, 'ফুল লাল করেছে কে?'

'ঠাকুর করেছেন।'

'কেন?'

'তিনি পরবেন বলে।'

ছেলে গম্ভীর হয়ে যায়। তিনিই যদি পরবেন তবে যে গাছে ফুল ফুটেছে সেই গাছই কি ঠাকুর?

নারায়ণ আয়াঙ্গার খুব করছেন। কলকাতায় লোক পাঠিয়েছেন ইনজেকশান আনবার জন্যে। বৈকুণ্ঠ মহারাজ দেখছে ছেলেকে।

মা কোয়ালপাড়ায়, জগদম্বা-আশ্রমে। মন বড় ব্যস্ত, ছেলের যেন ভালো হবার খবর আসে! সন্ধ্যা হয়-হয়, খবর এল অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। 'পালকি ঠিক করে রাখো।' মা বললেন ভক্তদের, 'কাল সকালেই আমি যাব যদি ছেলে ততক্ষণ বেঁচে থাকে।'

সকালেই ফিরল বৈকুণ্ঠ।

'তবে কি ছেলে নেই ?' মা [illegible] নাদ করে উঠলেন।

সবাই নির্বাক। মা একমু [illegible] দৃঢ় করলেন নিজেকে। বললেন, 'কতক্ষণ মারা গেল ?'

'সকাল সাড়ে পাঁচটা।'

'এখন গেলে দেখতে পাব ?'

'না মা, নিয়ে গেছে।'

নিয়ে গেছে! এবার মা ভেঙে পড়লেন। লুটিয়ে পড়লেন কান্নায়। একটু থামছেন তো আবার উথলে উঠছেন। সান্ত্বনার ভাষা জানা নেই মানুষের, তবু কেদার মহারাজ বলতে গেল মামুলি কথা। এক কথায় মা হটিয়ে দিলেন। 'কেদার গো, আমি ভুলতে পারছি না।'

অসুখের ঘোর অবস্থায় 'লাল মামাকে' নাকি খুঁজেছিল, ডেকেছিল 'লাল মামা' বলে। 'হয়তো কোনো ভক্ত এসে জন্মেছিল।' মা চোখ মুছলেন : 'হয়তো বা শেষ জন্ম। নইলে তিন বছরের ছেলের অত বুদ্ধি! অমন করে পুজো করে গা? লালন-পালন করে আমার কষ্ট।'

এমনি মায়ার বন্ধন এই সংসার। বন্ধনে রেখেছেন ক্রন্দন শুনবেন বলে। নিজে ছিলেন অমন বন্ধনে তাই তো ঠিক-ঠিক বুঝেছেন আমাদের কান্না।

'আহা, যাকে পাশ ফিরে শুইয়ে মনে প্রত্যয় হয় না, এমন ছেলে মাকুর, আজ কোল খালি করে চলে গেল! দেখ না কী যন্ত্রণায় ছটফট করছি।'

পালার বড় জ্বালা। রাধুকে লালন-পালন করেই এত কষ্ট। অভয় বলে গেল, দিদি, সব রইল দেখো। দেখতে গিয়েই মায়ায় ধরল। আর মায়ায় যদি একবার ধরে, চোখের জলের পুকুরে চুবিয়ে ধরে মারে।

সেবার কোয়ালপাড়ায় মা'র অসুখ, রাধু শ্বশুরবাড়ি যাবে বলে গাওনা ধরেছে। মা'র ইচ্ছে নেই যে যায়। তখন রাধু মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'তোমাকে দেখবার জন্যে অনেক না হয় ভক্ত আছে, আমাকে দেখতে আমার সেই এক স্বামী ছাড়া কেউ নেই।' বলে দিব্যি পালকিতে গিয়ে উঠল।

মা'র ভয় হল। রাধু যে অমন করে মায়া কাটিয়ে চলে গেল তবে ঠাকুর কি মাকে আর রাখবেন না? এই যে রাধি-রাধি করি, এ শুধু একটা মায়া নিয়ে আছি। দেহটাকে রাখবার জন্যে কোনো রকমে একটা শিকড় আঁকড়ে পড়ে থাকা। মায়া যদি চলে যায় মহামায়াও চলে যাবেন।

রাধুর মা, পাগলী সুরবালা দেখতে পারে না মাকে। বিশেষ করে কেন তিনি রাধুর সঙ্গে লেগে থাকেন। বলে, 'তোমার তো আরো অনেক

ভাজ আছে, তাদের ছেলে একটি লাও গে যাও। তুমি কি আমার ছেলেকেই লিবে বলে জন্মেছিলে?' বলেই বাপান্ত মা-অন্ত গালাগাল।

নীরবে সহ্য করছেন মা। শেষে বলছেন শান্তস্বরে: 'তুই আমাকে সামান্য লোক মনে করিসনি। তুই যে আমাকে এত বাপ-অন্ত মা-অন্ত গাল দিচ্ছিস আমি তোর অপরাধ নিই না—ভাবি দুটো শব্দ বই তো নয়—'

'ওমা, কখন আবার আমি বাপান্ত গালাগাল দিলাম!' পাগল হলে কি হয়, দুষ্ট বুদ্ধি ষোলো আনা।

'আমি যদি তোর অপরাধ নিই, তা হলে কি তোর রক্ষে আছে? আমি যে কদিন বেঁচে আছি তোরই ভালো। তোর মেয়ে তোরই থাকবে। যে কদিন না মানুষ হয় সে কদিনই আমি। নইলে আমার কি মায়া? এখুনি কেটে দিতে পারি। কর্পূরের মত কবে একদিন উড়ে যাব, টেরও পাবিনি।'

পাগলীকে একখানি গরদের কাপড় দিলেন মা। পাগল মানুষ, সাজ-পোশাকে একটু চোখ দিক। কি নিয়ে কথা উঠল, চলে এল রাধির প্রসঙ্গ, আর সেই নিয়ে কথা-কাটাকাটি। গরদের কাপড় মা'র গায়ে ছুঁড়ে মারল পাগলী। বললে, 'এই লাও তোমার কাপড়, তোমার ভালো ভাজদের দাও গে—'

'তোর চেয়ে আমার আর কে ভালো ভাজ আছে?' মা বললেন স্থির থেকে, 'আমি তোর কে যে আমার উপর এত উপদ্রব করছিস? যাকে মন চায় তাকে দেব।'

মাজুটে গ্রামে পাগলীর বাপের বাড়ি। সেখানে সে গেছে। সঙ্গে নিজের গয়না, রাধুর গয়না। চোরে-ডাকাতে নয়, ইঁদুরে-উকুনে নয়, সে গয়না তার বাপ আত্মসাৎ করলে।

মা'র কাছে খবর পাঠাল পাগলী। কি ঝঞ্ঝাট দেখ তো—কার না কার বিষয়, তার মধ্যে জড়িয়ে পড়লুম। কিন্তু বাপ হয়ে নিজের মেয়ের, অক্ষম অনাথ মেয়ের গয়না গাপ করবে এও বা কি করে সহ্য করা যায়?

পাগলীর বাপকে জয়রামবাটিতে ডাকিয়ে আনালেন। কত সাধ্যসাধনা কত কাকুতিমিনতি, কিছুতেই বামুন টলল না। শেষাশেষি তার পায়ে পর্যন্ত হাত রাখলেন, করুণ স্বরে বললেন, 'আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন দয়া করে।' বামুন বললে, আমি তার কি জানি!

এদিকে পাগলী আবার মাকেই শাসাতে লাগল : 'তুমিই কারসাজি করে আমার গয়না আটক করে রেখেছ। তুমিই দিচ্ছ না।'

'আমি?' ঝলসে উঠলেন মা। 'আমি হলে কাকবিষ্ঠাবৎ এই দণ্ডে ফেলে দিতুম।'

মা গয়না দাও, মা গয়না দাও—সিংহবাহিনীর মন্দিরে গিয়ে কাঁদছে পাগলী। শুনতে পেলেন মা। কত দূরে সেই মন্দির, তবু শুনতে পেলেন। গেলেন নিজে মন্দিরে, ক্ষেপীকে তুলে নিয়ে এলেন।

চিঠি দিলেন কলকাতায়।

মাস্টারমশাই চলে এলেন, সঙ্গে ললিত চাটুজ্জে। ললিত অদ্ভুত পোশাক পরে এসেছে, পেন্টালুন আর চাপকান, মাথায় শামলা আঁটা। পুলিশের উপরওয়ালার কাছ থেকে চিঠি এনেছে যাতে সহজেই একটা কিনারা হয়। গাঁয়ের দুজন চৌকিদার ডাকিয়ে নিল। মাঠের রাস্তা চিনে নিয়ে পথ দেখাতে হবে। রাত হয়ে গেছে, চৌকিদার সঙ্গে নিয়েও সুরাহা নেই, পথ ভুল হয়ে গেল। তখন সকলে 'অম্বিকে' বলে একসঙ্গে হাঁক পাড়লে। অম্বিকে জয়রামবাটির চৌকিদার। জয়রামবাটির লোকেরা ভাবলে মাঠে কারু উপর বুঝি ডাকাত পড়েছে। লাঠি-ঠ্যাঙা লোকজন নিয়ে এসে পড়ল অম্বিকে। ও, ডাকাত নয়—পোশাক দেখে অম্বিকা সসম্ভ্রমে গড় করল।

পর দিন দুপুরে পালকি চড়ে ললিত রওনা হল মাজটে গাঁয়ের দিকে। সেই সাজ-পোশাক, সঙ্গে সেই উপরওয়ালার চিঠি। মা কেমন ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, মাস্টারমশাইকে ডেকে বললেন, তুমিও সঙ্গে যাও।

এক মুহূর্ত বুঝি দ্বিধা করছিলেন মাস্টারমশাই, মা বলে উঠলেন কাতরস্বরে, 'ললিতের ছোকরা বয়স, মেজাজ গরম, ব্রাহ্মণকে যদি অপমান করে বসে!' একটা চোরের জন্যে মায়া।

'গয়না যদি ভালোয়-ভালোয় দেয় তো ভালো। না দেয় তো,' মা যেন শিউরে উঠলেন, 'ললিত নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণকে অপমান করে বসবে! তুমি যাও, আর যাই হোক, ব্রাহ্মণকে যেন কোনো অপমান না করে। যেন হাতকড়া না পরায়!' মাস্টারমশাই সঙ্গে গেলেন।

প্রথমেই বদনগঞ্জের থানায় গিয়ে উপরওয়ালার চিঠি দেখাল ললিত। জমাদার থেকে বড়বাবু পর্যন্ত ভড়কে গেল। দলের সঙ্গে গেল বড়বাবু। ব্রাহ্মণকে একটু ধমক দিতেই গয়না বার করে দিল।

সমস্ত রাত মা'র ঘুম নেই। বায়ু প্রবল হয়ে মাথা ঘুরছে। রাত দুটোর সময় হাঁকডাক। সবাই ওষুধ খুঁজতে ব্যস্ত। কোথায় ওষুধ, কি ওষুধ, কি হলে মা শান্ত হন।

'মা, এমন কেন হল?' একজন জিগগেস করলে মাকে।

'ওরা চলে গেল গয়না আনতে, আর আমি সারা দিন ভেবে-ভেবে অস্থির, ব্রাহ্মণের কোনো অপমান না হয়। সেই ভাবনায় বায়ু প্রবল হয়ে এমন হয়েছে।'

যে বামুনের জন্যে এত হয়রানি, তার জন্যে আবার ভাবনা!

চাকর চুরি করেছে বলে নরেন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। চাকর এসে কেঁদে পড়ল মা'র কাছে। বললে, 'মা, যা মাইনে পাই তা দিয়ে সংসার কুলোয় না—'

বাবুরামকে ডাকলেন মা। বললেন, 'লোকটি বড় গরিব, অভাবের জ্বালায় ওরকম করেছে। তাই বলে কি গালমন্দ দিয়ে তাড়িয়ে দেবে?'

বাবুরাম স্তব্ধ হয়ে রইল। এও আবার হয় নাকি?

'তোমাদের কি। তোমরা সন্ন্যাসী, সংসারের জ্বালা তোমরা কী বুঝবে! লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কাজে বাহাল করো।'

আবার দ্বিধা করল বাবুরাম। বললে, 'ওকে আবার রাখলে স্বামীজী বিরক্ত হবেন।'

'আমি বলছি নিয়ে যাও।'

চাকরকে নিয়ে ঢুকছে দেখে স্বামীজী জ্বলে উঠলেন: 'এ কি কাণ্ড! ওটাকে আবার নিয়ে এসেছ?'

বাবুরাম বললে, 'মা'র আদেশ।'

মা'র আদেশ! স্বামীজী মাথা নোয়ালেন।

...চব্বিশ...

যার পাপ নিয়ে ঠাকুরের ব্যাধি সেই গিরিশ ঘোষ এসেছে জয়রাম-বাটিতে।

অনেকদিন আগে গিরিশের কলেরা হয়েছিল, বাঁচবার আশা ছিল না। শেষ নিশ্বাসটুকু নিয়ে ধুঁকছে, দেখলো মাতৃবেশে স্নেহময়ী একটি

নারী এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রে। কোন ছেলেবেলায় মা মারা গেছে, মনে করতে পারছে না, ভাবলে এই বুঝি সেই মা। ছেলেকে কোলে করে নিয়ে যেতে এসেছেন। কিন্তু ও কি, কী যেন খেতে দিচ্ছেন মা, মুখে পুরে দিচ্ছেন। বলছেন, 'এ মহাপ্রসাদ। খাও। এ খেলে তুমি ভালো হয়ে যাবে।'

ভালো হয়ে যাব!

সত্যিই, ভালো হয়ে উঠল। কিন্তু মা কোথায়?

সবাই বলে কালীঘাট মহাপীঠস্থান, সেখানে মা আছে। শনি-মঙ্গলবার গভীর রাত্রে সেখানে যায় গিরিশ। যেখানে বলিদান হয় সেই হাড়কাঠের পাশে বসে মা-মা বলে ডাকে, কাঁদে আর্তস্বরে। এত জায়গা থাকতে হাড়কাঠের কাছে কেন? শত-শত ছাগ বলি হচ্ছে সেখানে। মৃত্যুকালে তাদের সেই করুণ আর্তনাদ শুনে বেটি নিশ্চয়ই একবার এদিকে তাকায়। যদি আমার আর্তনাদে ভুল করে একবার তাকায় আমার দিকে। যদি আমার চোখের উপর ঠিকরে পড়ে তার চোখের আলো।

গিরিশের সেই চার বছরের ছেলে যখন গিরিশকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল শ্রীমা'র কাছে, তখন গিরিশ দেখেছিল মা'র পা দুখানি। তারপর সেই ছাদে উঠে মাকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল, ফিরিয়ে নিয়েছিল পাপনেত্র।

ঠাকুর নেই, সমস্ত জীবন যেন বীতস্বাদ হয়ে গিয়েছে। জীবনকে ঘিরেছে যেন দুর্দিনের ধূমজাল। কোথায় ঠাকুর! কোথায় সেই একশরণ করুণানিলয়!

স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে ধরল একদিন। বললে আকুলকণ্ঠে, 'ঠাকুরের কাছে যদি যেতে পারতাম তবেই বোধহয় শান্তি হত।'

'কেন, মা'র কাছে যাও না?'

'মা'র কাছে?'

পরমব্রহ্মমহিষী বলে তখনো যেন বুঝতে পারেনি গিরিশ। সাধারণ আর সকলে যেমন ভাবত গুরুপত্নী, বোধহয় তেমনি ভাবের ভক্তিতেই অধিষ্ঠিত রেখেছিল। নিরঞ্জনের কথায় চমকে উঠল।

'তা ছাড়া আবার কি? মা আর ঠাকুর কি আলাদা? হরগৌরী রামসীতা রাধাকৃষ্ণ কি খণ্ড-খণ্ড?'

ঠিকই তো। গিরিশ তো নিজেই লিখেছে বিল্বমঙ্গলে—এক সাজে পুরুষপ্রকৃতি। সত্যিই তো, ভগবান অবতীর্ণ হয়ে কি সাধারণ নারীকে

পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন? ঠাকুরেরই তো কথা, অর্ধেক কাজ আমি করে গেলাম আর বাকি অর্ধেক তুমি করবে!

নিরঞ্জন বললে, 'তোমার ভয় কি। তোমাকে তো ঠাকুর গেরুয়া দিয়ে গেছেন। তুমি তো সন্ন্যাসী। ঠাকুর নিজেই ভেঙে দিয়েছেন তোমার সংসার। এখন চলো সংসার ছেড়ে।'

'না তো! ঠাকুর তো আমাকে সন্ন্যাসী হতে বলেননি।' গিরিশ বললে জোরের সঙ্গে।

'কিন্তু গেরুয়া তো দিয়েছেন। তুমি দিয়েছ বকলমা তিনি দিয়েছেন গেরুয়া। তুমি শরণাগতি তিনি বৈরাগ্য। তুমি সন্ন্যাসী না তো কে সন্ন্যাসী। চলো একবার মা'র কাছে—তিনি যা বলবেন তাই হবে।'

তাই হবে।

পুণ্যধাম জয়রামবাটিতে এই প্রথম গেল গিরিশ। এই প্রথম মা'র মুখ দেখলে। এই প্রথম মা'র নেত্রামৃতচ্ছটা পড়ল গিরিশের পুণ্যনেত্রে।

কিন্তু এ কি! এ যে সেই বহুদিন আগেকার মৃত্যুশয্যার পাশে প্রসাদদায়িনী মাতৃমূর্তি।

মাগো, তুমিই কি সেই?

সর্বক্লান্তিহরা হাসি হাসলেন মা।

'বলো মা, তুমি কেমনতরো মা? তুমি কি পাতানো মা?' গিরিশ পড়ল মা'র পায়ের কাছে।

'আমি সত্যিকারের মা।' মা বললেন গভীরস্নিগ্ধ সহজ সুরে, 'পাতানো মা নয়, গুরুস্ত্রীরূপে মা নয়। আমি আসল মা।'

মা যদি নিজে না চিনিয়ে দেয় কে চিনবে তাকে? বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় কাচতে যাচ্ছ পুকুরঘাটে, তোমাকে কে বুঝবে জগন্মাতা? জগন্মাতা কি হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলে, তরকারি কোটে, ঘর ঝাঁট দেয়, পরের ছেলে টানে?

গিরিশ শুতে এসে দেখে, তার বিছানা-বালিশ শাদা ধবধব করছে। বুঝল এ মা'র কাজ। সোডা-সাবান দিয়ে কেচেছেন নিজের হাতে। গিরিশ ভেবে পেল না কাঁদবে না আনন্দ করবে! অধম সন্তানের জন্যে শারীরিক কষ্ট করেছেন তার জন্যে কান্না—আবার কৃপা করেছেন স্নেহ করেছেন তার জন্যে আনন্দ। অশ্রু ঝরতে লাগল চোখ বেয়ে। এ অশ্রুর আস্বাদ কি দুঃখ না সুখ তা কে বলবে!

মা'র কাছে বসে এক ভিখিরি গান গাইছে বেহালা বাজিয়ে :

'মা, উমে, বড় আনন্দের কথা শুনে এলাম। তুই বল এ কি সত্যি? শুনে এলাম কাশীধামে তোর নাম নাকি অন্নপূর্ণা! অপর্ণে, যখন তোকে অর্পণ করি, ভোলানাথ তখন মুষ্টির ভিখারি ছিল। নেশা-ভাঙ করে বেড়াত, নাচত ভূত-প্রেত নিয়ে। এখন শুনি সে নাকি বিশ্বেশ্বর, আর তুই নাকি তার বামে বিশ্বেশ্বরী? বল, কি করে বিশ্বাস করি এ কথা? দিগম্বর বলে সবাই খ্যাপা-খ্যাপা বলত, কার হাতে মেয়ে দিলাম কত গঞ্জনা সয়েছি ঘরে-পরে! এখন শুনি দিগম্বরের ঘরে নাকি দ্বারী আছে। ইন্দ্র চন্দ্র যমও নাকি তার দর্শন পায় না। বল গৌরী, তোর এই গৌরবের কথা কি সত্যি?'

এ যেন মেনকার কথা নয়, শ্যামাসুন্দরীর কথা। মা'র যেন বাল্যলীলা মনে পড়ে গেল, চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলেন।

ঠাকুরের উপর বিবেকানন্দের অভিমান হয়েছে। মাকে এসে বলছেন, 'মা. এই তো ঠাকুর! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত বলে ফকির আমায় শাপ দিলে। বললে, অসুখ হয়ে তিন দিনের মধ্যে এই জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে। আর তাই কিনা হল! সামান্য একটা ফকিরের শক্তিকে ঠেকাতে পারলেন না ঠাকুর!'

মা বললেন, 'বাবা, শুনতে পাই শঙ্করাচার্যও নাকি এমনি করে নিজের শরীরে রোগ আসতে দিয়েছিলেন। রোগ তোমার শরীরে আসতে দেওয়া বা তাঁর শরীরে আসতে দেওয়া একই কথা। তিনি তো ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছিলেন। তাই সব কিছু মেনে গিয়েছেন।'

'আমি মানি না।' বললেন বিবেকানন্দ।

'না মেনে কি উপায় আছে?' মা বোধহয় হাসলেন একটু মনে-মনে : 'তোমার টিকি যে বাঁধা।'

ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে দি। লেখা-পড়া থিয়েটর-অভিনয়। ঠাকুরকে একদিন বলেছিল গিরিশ ঘোষ। ঠাকুর বলেছিলেন, 'না-না ছেড়ো না, ওতে লোকের উপকার হচ্ছে—'

আশ্চর্য, মাও সেই এক কথাই বললেন। সন্ন্যাস নেবার বাসনা নিয়ে এসেছিল পাদপদ্মে। মা বললেন, 'যা করছ তাই করো। যেমন বই লিখছ তেমনি লেখ—এও তো তাঁরই কাজ। ঠাকুর তো তোমাকে বলেননি সংসার ছাড়তে।'

তাই সই। সংসারেই থাকব মা'র ছেলে হয়ে। মা'র কাছেই তো ছেলে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ। মা বলেই তো ছেলের বিছানা পরিষ্কার করে দিলেন, পাষণ্ডের বিছানা বলে ছুঁড়ে ফেললেন না। এ তো শুধু আলো-করা ভালো ছেলের মা নয়, এ কালো ছেলেরও মা। পাতানো মা নয়, সৎ-মা নয়, সত্যিকারের মা।

মা'র জয় দে সকলে। আর ভয় নেই। আনন্দময়ী ভুবনেশ্বরী সম্পদ্‌রমা শ্রী হয়ে বিরাজ করছেন সংসারে। কে আছিস দৈন্যার্তিভীত, ভবতাপপীড়িত, শান্ত হবি আয়, তৃপ্ত হবি আয়, অমল হবি আয় আরোগ্যস্নানে। ক্ষীরোদসাগরের লক্ষ্মী উঠেছে সংসারসাগরের মন্থনে। দুর্গদুর্গতিহরা বিমুক্তিফলদায়িনী। শুধু বাণী নয় ব্যাখ্যাস্বরূপা। প্রাণমন্ত্ররূপিণী। মধুমধুরা মাতা সারদা।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে গিরিশ চিঠি লিখেছে, এবার মা শারদীয়া পুজায় আসতে হবে সশরীরে। আমার দীনালয়ে।

মা'র শরীর অত্যন্ত খারাপ, তবু রাজী হলেন। গিরিশের ডাক! ঠাকুরের বীরভক্ত গিরিশ। কিন্তু মা'র কাছে পাঁচ বছরের ছেলে। গিরিশ যখন প্রণাম করে, মা বলেন, যেন পাঁচ বছরের বালক।

বিষ্ণুপুরে পেঁাছে দেখা গেল মাস্টারমশাই আর ললিত। 'ললিতের আমার লাখ টাকার প্রাণ।' বলছেন মা : 'আমাকে কত টাকা দিয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবায়, কামারপুকুরে রঘুবীরের সেবায়। তার গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে গেছে। কত বড়লোক আছে, কিন্তু কৃপণ। ললিত আমার অঢেল।' বলেই বললেন সেই সরস সূক্ত : 'যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো।'

আপনারা এখানে?

আমরা তোমাদের নিতে এসেছি এগিয়ে। কলকাতায় মারপিট চলেছে, রাত্রে শহর অন্ধকার। ভয় নেই, ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিকঠাক। এখন এখানকার এই চটিতে এসো, তোমাদের খাবার বন্দোবস্ত করে রেখেছি।

হাওড়ায় পেঁাছুতে সন্ধ্যে। গণেন এসেছে স্টেশনে, সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ললিত। গণেন বললে, নৌকো করে একেবারে বাগবাজারের ঘাটে গিয়ে ওঠাই নিরাপদ। শরৎ মহারাজ আর গিরিশেরও মত তাই। কিন্তু মা'র নৌকোতে বড় ভয়। তাই কি করা যায়, ললিতের গাড়িতেই

রওনা হল সকলে। ভিতরে মা, রাধু আর রাধুর মা। দু পাদানিতে দুজন— আশু আর ললিত। কোচবাক্সে গণেন। আর জিনিসপত্র নিয়ে ছাদে মাস্টারমশাই।

গঙ্গার ধার দিয়ে চলল কুমোরটুলির ঘাটের দিকে। শেষে কুমোরটুলি হয়ে রাজবল্লভপাড়া হয়ে বলরাম বোসের বাড়ি।

সকালবেলা গিরিশ আর তার দিদি দক্ষিণা এসে হাজির। প্রণাম তো বটেই, নিমন্ত্রণও করতে এলাম, মা। কিন্তু, মা, তুমি তো প্রণাম বা নিমন্ত্রণ কিছুরই অপেক্ষা করো না। তোমার নামটি নিলেই প্রণাম, তোমার মন্ত্রটি নিলেই নিমন্ত্রণ।

দক্ষিণা বললে, 'গিরিশ তো বেঁকে বসেছিল মা। বলে, মা না এলে পুজো করব কাকে? করবই না।'

মাটির প্রতিমা অনেক দেখেছি। এবার জীবন্ত প্রতিমা চাই। স্বামীজীর ভাষায়, জ্যান্ত দুর্গা।

মা'র সামনে কল্পারম্ভ হল। সপ্তমীর দিন বলরাম বোসের বাড়িতে সে কি ভিড়! দলে-দলে লোক আসছে। সব মাকে দেখবে, মা'র পা দুখানি। শুধু তাই নয়, প্রণাম করবে, পুজো করবে। সমস্ত দেহ ঘন বস্ত্রে আবৃত করে শুধু পা দুখানি মুক্ত করে দাঁড়িয়ে আছেন মা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে, তবু মা ঠায় দাঁড়িয়ে। এক ভাবে। যদি এতটুকু অহং থাকত তবে হয়তো বসতেন পরিপাটি করে। গদি পেতে। এ যেন কত কুণ্ঠা, কত লজ্জা, কত মিনতি। তাই দাঁড়িয়ে আছেন সর্বক্ষণ।

পুজোর লগ্ন এসে পোঁছুলে চলে গেলেন গিরিশের বাড়ি। সেখানে যেন আরো ভিড়। একই পুজোর দালানে মা আর প্রতিমা। চিন্ময়ী আর মৃন্ময়ী। ভক্তরা দিশেহারার মত হয়ে গিয়েছে। কার পায়ে প্রথম অঞ্জলি দেবে ঠিক করতে পারছে না।

বেলপাতা আর তুলসী, জবা আর পদ্ম, পাহাড় হয়ে রয়েছে। তবু ভক্তসমাগমের বিরাম নেই। প্রতিমা যেমন দাঁড়িয়ে তেমনি মাও দাঁড়িয়ে।

প্রতিমার কি, সে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু মা'র জ্বর এসে গেল। দেহ ধরেছেন তার ট্যাকসো না দিয়ে উপায় কি। তবু মহাষ্টমীতে ভক্তসাধ পূর্ণ করতে দাঁড়ালেন আবার চাদর মুড়ি দিয়ে। কিন্তু আর নয়, সত্যি-সত্যি এবার বিছানা নিলেন মা। একে কৃশকরুণ দেহ তায় এই ক্লান্তি। গভীর রাত্রে সন্ধিপুজো, গিরিশের কাছে খবর গেল, মা'র জ্বর

বেড়েছে, আসতে পারবেন না। গিরিশ চোখে অন্ধকার দেখল। উদ্‌ভ্রান্তের মত ডাকতে লাগল মা-মা বলে।

মধ্যরাতে মা উঠে বসেছেন বিছানায়। ডেকে তুললেন গোলাপ-মাকে। বললেন, 'এখন একটু ভালো বোধ করছি, আমি যাব।'

আশুকে জাগালো গোলাপ-মা। বললে, 'ওঠো। মা যাবেন। তাঁকে নিয়ে যেতে হবে।'

বলরাম বোসের বাড়ির পশ্চিম দিক দিয়ে সরু গলি। সেই গলি দিয়ে এগুতে লাগলেন মা। পা ফেলতে পারছেন না, শরীর টলে-টলে পড়ছে। কিন্তু মনে আশ্চর্য দৃঢ়তা। ঠাকুরের বীরভক্ত গিরিশের মর্যাদা রাখতেই হবে।

গিরিশের বাড়ির খিড়কির দরজা বন্ধ। সদর দিয়ে ঢুকে দরজা খোলাতে হবে কাউকে দিয়ে। ব্যস্ত হয়ে আশু চলে গেল সদরের দিকে। কাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ দরজার বাইরে তার খবর রাখো?

মা অস্ফুটস্বরে বললেন, আমি এসেছি।

একটা ঝি শুনতে পেয়েছে সেই নিশ্বাসের মতন কথাটুকু। পলকে খুলে দিল দরজা।

মা এসেছেন, মা এসেছেন। সমস্বরে সঙ্গীতময় ধ্বনি উঠল। ঝাঁকে-ঝাঁকে উলু দিয়ে উঠল মেয়েরা। মা এসেছেন। দীন-হীন পাপী-তাপী নিঃস্ব-নিরালম্বের মা। সমস্ত বঞ্চনার মধ্যেও যার অঞ্চলের আশ্রয়টুকু অটুট থাকে সেই মা। গৌরববহনে আসেননি, গোপনচরণে এসেছেন। ঐশ্বর্যের সদর দিয়ে আসেননি, এসেছেন মাধুর্যের খিড়কি দিয়ে।

গিরিশের আনন্দ তখন দেখে কে।

... পঁচিশ ...

এবার পালাই কলকাতা থেকে। এত ভিড়-ভাড় হৈ-চৈ সহ্য হবে না।

দেশে কালীকুমারকে চিঠি লেখা হল যেন দেশড়া গাঁয়ে পালকি পাঠানো হয়। একখানি চিঠি নয়, পর-পর দুখানি চিঠি। একখানি অন্তত পাবেই।

বিষ্ণুপুর আর কোতলপুর হয়ে দেশড়া। দেশড়া পেরিয়ে মাঠে

পড়েছেন, সন্ধ্যা লেগেছে। কিন্তু চারদিক ধু-ধু করছে, পাল্কি কই?

এবার সঙ্গে করে গোলাপ-মা আর কুসুমকে নিয়ে এসেছেন। তারাই এসেছে জোর করে। ভায়ের সংসারে খেটে-খেটে তুমি শরীর পাত করবে এ হতে দেব না। আমরা তোমার কাজ করে দেব। তোমার পরিচর্যা করব।

এখন এদের নিয়ে যাই কি করে? বিষ্ণুপুর থেকে গরুর গাড়িতে এসেছি, কিন্তু দেশড়া থেকে জয়রামবাটি পায়ে-হাঁটা পথেই কাছে, গরুর গাড়ি করে যেতে হলে যেতে হবে লম্বা ঘুর-পথে, শিওড় হয়ে। আর শিওড়ের রাস্তাও তেমনি, হাড়-মাস আলাদা হয়ে যায়। তারই জন্যে লেখা হয়েছিল পাল্কির কথা। কিন্তু ভায়েদের কাণ্ডজ্ঞান দেখ! পাল্কি না পাঠাতে পারিস, নিজেরা কেউ আয়। তা না হয়, মুনিষ-বাগালে কাউকে পাঠিয়ে দে। এমন অপদার্থ তো কোথাও দেখিনি।

দেশড়ার মাঠটুকু পেরিয়ে নদী। নদী পেরিয়ে আরেকটু মাঠ। তার পরেই জয়রামবাটি। কি করবেন? গরুর গাড়িতে করে শিওড় হয়ে যাবেন, না, পায়ে হেঁটে?

পায়ে হেঁটে। শিওড়ের রাস্তায় গরুর গাড়ির ঝাঁকুনি আমি সইতে পারব না।

ঠিক হল গোলাপ-মা আর কুসুম গাড়ি চড়ে যাক শিওড় হয়ে। আর বাকিরা পদব্রজে। এ দল বাড়িতে আগেই পৌঁছুবে, পৌঁছেই চাকর পাঠাবে শিওড়ে। কুসুম আর গোলাপ-মাকে নিয়ে আসবে পথ দেখিয়ে। আমরা হাঁটি!

মা'র কালো রঙের টিনের বাক্সটি হাতছাড়া করা চলবে না। তার মধ্যে সিংহবাহিনীর মাটি, জপের মালা, ঠাকুরের খাট। আশুই একমাত্র চলনদার। তার এক হাতে রাধু আরেক হাতে বাক্স। মা চলেছেন আগে, সুরবালা পিছনে।

আলো নেই, রাতের অন্ধকার আসছে ঘনীভূত হয়ে। তবু, ভয় নেই, পথ সকলের মুখস্ত।

কিছুদূর যেতেই সুরবালা হঠাৎ বলে উঠল, 'ওবাগে কুথাকে যাচ্ছ? এ বাগে এস।'

কালীকুমারের ব্যবহারে মা অপ্রসন্ন ছিলেন, ভালো করে ঠাহর করে দেখলেন না দিশপাশ। বললেন, 'সত্যিই তো. এদিকে চলো। ছোট বউয়ের পথ সব জানা। ও তো মাঠে-মাঠেই ঘুরে বেড়ায়।'

আশুরও কি হল, মেনে নিলো।

এখন দেখে, নদীর ঘাটে না পৌঁছে এক আঘাটায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোথায় কূল কোথায় কিনারা কে বলবে।

'আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি নদীর ধারে-ধারে গিয়ে ঘাট দেখে আসি।' আশু বললে ভয়ে-ভয়ে।

'কোথায় এই তেপান্তরের মাঠে আমাদের ফেলে রাখবে!' মা ঝলসে উঠলেন : 'যেতে হবে না তোমায়।'

মা'র মুখের তিরস্কারটিই বা কি মধুর!

নদী প্রায় নির্জলা। বেশ দিব্যি হেঁটে পার হওয়া যাবে দেখছি। অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে তাই এগুতে লাগল সকলে। যাচ্ছেন-যাচ্ছেন আর বকছেন আশুকে, 'তুমি বেটাছেলে হয়েছ কেন? আমাদের কথা শুনলে কেন? তোমার মেয়েমানুষ হওয়াই উচিত ছিল।'

দূরে আলো দেখা গেল।

'কে গা আলো নিয়ে যায়? এদিকে আমাদের একটু ধরো না। আমরা পথ হারিয়েছি।'

আলো চলে এল কাছে। দেখল, খানিক আড় হয়ে এসেছে, তাই গাঁয়ের গা ছেড়ে পড়েছে গিয়ে বাইরে।

বাড়ি পৌঁছেই প্রথমে ভাজের কাছে জল চাইলেন মা। তেষ্টায় আকণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে। এক ঘটি জল দিল এনে। দাওয়ায় বসে তাই খেলেন পুরোপুরি।

এবার গাড়ির খোঁজে পাঠাও চাকরদের। তারপর কালীকে ডাকো।

চিঠি পাওয়া স্বীকার করলেন কালীকুমার। তবে পালকি পাঠালে না কেন? পালকি পাওয়া গেল না। মুনিষ-মাইনদার? রাখাল-বাগাল?

এটা-ওটা ওজুহাত দেখায়। কোনোটাই টেঁকসই নয়। আসল কারণ হচ্ছে ঔদাসীন্য। যে এদের সংসারের জন্যে দেহপাত করছে তার মূল্য না বোঝা।

'আমার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস আমি কারু দোষ দেখতে পারতুম না।' বলছেন মা। 'আমার জন্যে যে এতটুকু করে, আমি তাকে তাই দিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করি। তা আবার মানুষের দোষ দেখা! যদি শান্তি চাও মা, কারু দোষ দেখবে না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।'

সকালে কলকাতা থেকে কটি ভক্ত এসেছে। খুব সাজগোজ। এক গাদা ফল নিয়ে এসেছে মা'র জন্যে, কিন্তু আদ্ধেক পচে গোবর হয়ে গিয়েছে। এখন সেগুলি কোথায় যে ফেলেন খুঁজে পান না। এদিকে ফিটফাট ফুলবাবু, গামছা আনেনি। এখন দাও একটা কিছু দেখে-শুনে। তারপরে আবার বলছে মশারির দড়ি নেই। হরি এখন দড়ি খুঁজে বেড়াক।

ঠাকুরের উপর অভিমান করে বলছেন : 'ঠাকুর, তোমার সংসার তুমি দেখ গিয়ে। এদিকে রাঁধি আর ওদিকে এই সব।'

সেদিন একটা বুড়ো মতন লোক এসে হাজির, মাকে প্রণাম করবে। তাকে দূর থেকে দেখেই মা ঘরের মধ্যে কাঠ হয়ে রইলেন। বাইরে থেকেই প্রণাম সেরেছে বটে, কিন্তু বলছে, পায়ের ধুলো চাই। চৌকিতে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন মা, না-না করছেন, তবু কিছুতে ছাড়লে না, জোর করে কেড়ে নিল পায়ের ধুলো। সেই থেকে মা'র পায়ের জ্বালা আর পেটের ব্যথা শুরু হল। তিন-চার বার পা ধুলেন তবু উপশম নেই।

'যে বিষ আমরা ধারণ করতে পারি না তাই পাঠাচ্ছি মা'র কাছে।' বলেছিল প্রেমানন্দ : 'স্বচ্ছন্দে পান করছেন সে-বিষ, হজম করে ফেলছেন।'

কোয়ালপাড়ায় এক ভক্ত এসেছিল মাকে প্রণাম করতে। গভীর সঙ্কোচ, কিছুতেই মা'র পা ছোঁবে না, পাছে মা কষ্ট পান। মা বুঝতে পারলেন তার মনের না-বলা কথাটি। বললেন, 'বাছা, আমরা তো এর জন্যেই এসেছি। আমরা যদি অন্যের পাপ আর দুঃখ না নিই, তবে আর কে নেবে?'

সেদিন পুলিশের এক বড়বাবু এসে হাজির। ইয়া তার গোঁফ। গোঁফ পাকাতে-পাকাতে বললে, পায়ের ধুলো চাই। কি রকম চঞ্চল স্বভাব লোকটার, মা রাজী হলেন না। পরে ভাবলেন, কি জানি, লোকটার পদমর্যাদায় ঘা পড়বে না কি। তাই, পায়ের ধুলো নয়, হালুয়া করে পাঠিয়ে দিলেন সদরে।

পুজো সেরে সবে উঠেছেন, কোত্থেকে এক ভক্ত কতগুলি ফুল নিয়ে এসে হাজির। চেনেন-না-শোনেন-না, সর্বাঙ্গ চাদর মুড়ি দিয়ে বউ-মানুষটির মতন বসে রইলেন তক্তপোশে। শুধু ঝোলানো পা দুখানিই অনাবৃত। পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করে সামনে আসন পাতল ভক্ত। সেই আসনে দৃঢ় হয়ে বসে ন্যাস আর প্রাণায়াম শুরু করলে।

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত, কেউ নেই মা'র কাছাকাছি। অনেকক্ষণ

হয়ে গিয়েছে, গোলাপ-মা কি উপলক্ষ্যে এসেছে এ-ঘরে। এক নজরেই বুঝে নিল ব্যাপারটা। সহসা সেই ভক্তের হাত ধরে তাকে টেনে তুলল আসন থেকে। বললে ধমক দিয়ে, 'এ কি কাঠের ঠাকুর পেয়েছ যে ন্যাস-প্রাণায়াম করে তাকে চেতন করবে? আক্কেল নেই গা? মা যে ঘেমে অস্থির হচ্ছেন।'

সেবার কি হয়েছিল জানো না বুঝি? এক ভক্ত মাকে প্রণাম করতে এসে মা'র বুড়ো আঙুলে খুব জোরে মাথা ঠুকে দিলে। উঃ—কাতর শব্দ করলেন মা। কি হল? কি করলে? ভক্ত বললে, 'এমনি তো মনে রাখবেন না, ব্যথা করে দিলে যদি মনে রাখেন।'

সাধ্য কি তাকে ভুলি? সে যে মা'র পায়ে ব্যথা করে দিয়েছে। কত বার কত জনের কাছে তার কথা বলেছেন মা। বলেছেন আর হেসেছেন। হেসেছেন ব্যথার আনন্দে।

বরিশাল থেকে এক ভক্ত এসেছে, কিন্তু মা'র সেবকেরা তাকে ঢুকতে দেবে না। তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে, মহা হৈ-চৈ। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছে ভক্ত, যদি মা'র দেখা না পাই থাকব অনশনে। তাই থাকো না, বাইরে বসে অনশন করো। কিন্তু অনশনে বসবার আগে শেষ চেষ্টা করে যাব। এখনো গলার জোর আছে, গায়ের জোর আছে—

কি ব্যাপার? মা দাঁড়ালেন এসে দরজার সামনে। সেবকরা বললে, স্বামী সারদানন্দের বারণ, যখন-তখন যে-সে লোককে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

'শরৎ বারণ করবার কে?' মা যেন ঈষৎ বিরক্ত হয়েছেন। বললেন, 'আমি তবে আর কিসের জন্যে আছি!' পরে সেই ভক্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু খাও গে আজ। কাল এসো। কাল তোমাকে দীক্ষা দেব।'

'ঠাকুরের শিষ্যদের দেখ। এক-একটা বিরাট পুরুষ। আর তোমার শিষ্যরা?' যোগেন-মা বললেন পরিহাস করে। 'যত সব চুনোপুঁটি—'

'কি করব!' মা স্নেহবিষণ্ণ মুখে বললেন, 'ঠাকুর সব দেখে-শুনে বাছাই করে নিয়েছেন, আর আমার জন্যে পাঠিয়েছেন যত চুনোপুঁটির ঝাঁক। যত সার-বাঁধা পিঁপড়ে। তাঁর শিষ্যের সঙ্গে আমার শিষ্যের তুলনা কোরো না।'

কি করব! আমি যে মা। আমি কি কাউকে ফেলতে পারি? আমার কাছে তো আসবেই সব হেঁজি-পেঁজি, গরিব-গুরবো, কেউকেটার দল।

কেষ্ট-বিষ্টু আমি কোথায় পাব? আমি যে সকলের মা। যারা সামান্য নগণ্য অধম-অযোগ্য তারা কোথায় যাবে? আমিও যদি তাদের ফিরিয়ে দিই, তবে কেন আমি মা হয়েছিলুম?

শুধু দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়। নইলে আমার কী লাভ! মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপ নিতে হয়। ভাবি দেহটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।

'জানি কত অযোগ্য লোক আসে।' বলছেন একদিন মা: 'হেন পাপ নেই যা জীবনে করেনি। কিন্তু আমাকে যখন মা বলে ডাকে তখন সব ভুলে যাই। যা হয়তো পাওয়া উচিত নয় তারও বেশি দিয়ে ফেলি।'

কি করবো, আমি যে মা। আমাকে যে সবাই মা-মা করে ডাকে।

অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন মা, এক ভক্ত এসে বললে, 'আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন, কষ্টটা আমায় দিন না।'

মা চমকে উঠলেন। বললেন, 'বলো কি? ছেলে! ছেলেকে মা কি কখনো দিতে পারে অসুখ? ছেলের কষ্ট হলে যে মা'র আরো বেশি কষ্ট। আমি সেরে যাব, ভয় নেই।'

মা'র তখন শেষ অসুখ, দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন। চেহারা ভীষণ শুকিয়ে গিয়েছে, উঠতে পাচ্ছেন না বিছানা ছেড়ে। সন্ন্যাসী-ভক্তরা বলাবলি করছে, এবার মা সেরে উঠলে আর তাঁকে মন্ত্র দিতে দেওয়া হবে না। মন্ত্র দিয়ে যত লোকের পাপ টেনে নিয়ে মা'র এই ব্যাধি। বিচিত্র লোকের বিচিত্র পাপ।

কথাটা মা'র কানে গেল। রোগশীর্ণ মুখে তিনি একটু হাসলেন। বললেন, 'ও কেন বলছ? ঠাকুর কি এবার শুধু রসগোল্লা খেতেই এসেছেন?'

শুধু আরামের জীবন যাপন করতে আসেননি। কণ্টকণ্টকে বিদ্ধ হতে এসেছেন। পরের পাপকে নিজের ব্যাধিতে রূপান্তরিত করেছেন। নিজে নাগপাশে বাঁধা পড়ে পরকে বিষমুক্ত করে দিয়েছেন।

আর যে ঠাকুর সেই মা।

এক সাধুকে মুরুব্বি ধরে দুই ভক্ত এসেছে দীক্ষা নিতে। মা বলে দিয়েছেন শরীর ভালো নয়, দীক্ষা হবে না। খবর শুনে ভক্ত দুজন কাঁদতে বসেছে।

'বাবা কিছু বলবে?' সাধুকে জিগগেস করলেন মা।

'দীক্ষা দেবেন না শুনে ভয়ানক কাঁদছে ছেলে দুটো।'

'কি করে দিই! শরীরটা ভালো নয় যে।'

'কিন্তু মা, বড় কাঁদছে যে ওরা। আপনি না দিলে কে দেবে?'

'তুমিও বলছ?'

'হ্যাঁ, মা—'

'কিন্তু,' মা একটু থেমে বললেন, 'ওদের দেহ যে অশুদ্ধ।'

সাধু চমকে উঠল। ভাবল, পড়ল বুঝি জলের তলে। আশ্রয়হীনের মত তাকাল মা'র মুখের দিকে।

'এখানে ওদের তিন রাত্রি বাস করতে বলো। এখানে তিন রাত্রি বাস করলেই দেহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা যে শিবের পুরী।'

... ছাব্বিশ ...

'ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক—' পাগলী সুরবালা মাকে গাল দিচ্ছে। মা পুজোয় বসেছেন, রইলেন মূক হয়ে।

পুজো শেষে বললেন মা. 'ছোট বউ জানে না যে আমি মৃত্যুঞ্জয় হয়েছি।'

পাগলী আবার কখনো রসিকতাও করে। ঠাকুরের ছবি মা ফুল দিয়ে সাজাচ্ছেন। পাগলী তা দেখে মুচকে-মুচকে হাসছে আর বলছে ভক্তদের, 'দেখ তোমাদের মা'র কাণ্ড। নিজের সোয়ামীকে নিজেই সাজাচ্ছে।'

মন্মথ, রাধুর স্বামী, জলে ডুবেছে—একদিন এমনি শোর তুলল সুরবালা।

'ওগো ঠাকুরঝি গো, আমার জামাই বাঁড়ুয্যে পুকুরে ডুবে গেছে গো। কি হবে গো?'

মা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন সুরবালা ভিজে কাপড়ে উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়েছে। জামাইকে খুঁজতে সে নিজেও জলে নেমেছিল, একগাছা চুলও দেখতে পেল না। ঠাকুরঝি, এ সব তোমার কাজ। আমার সুখ তোমার দুচোখের বিষ। চালাকি চলবে না, আমার জামাইকে ফিরিয়ে দাও। ব্যস্ত হয়ে মা সবাইকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

কে এসে বললে, 'মন্মথ বেনেদের দোকানে তাশ খেলছে। দেখে এলাম এইমাত্র।'

তাকে খবর দিয়ে নিয়ে এস শিগগির। জলজ্যান্ত মন্মথ এসে দাঁড়াল সশরীরে, শুকনো কাপড়ে। অপ্রস্তুত হল পাগলী, কিন্তু ঠাণ্ডা হল না। বিষজিহ্বা সমানই লকলক করতে লাগল।

মাও তাশ খেলেছেন।

এই পাগলীই খেলিয়েছিল। মা কিছুতেই রাজী হন না তখন মা'র পা দুখানি জড়িয়ে ধরল সুরবালা। মা রাজী হলেই তো হল না, আরো দুজন তো চাই, পাবি কোথায়? কেন? নলিনীকে আনছি আর আশু আছে। মা'র ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে বসেছে চারজনে। আশু আর মা এক দিকে, ও দিকে সুরবালা আর নলিনী। গ্রাবু খেলা হচ্ছে। সেই থাকতে-তুরুপের খেলা। প্রথমেই একখানা ছক্কা পেলেন মা। পাগলী রাগে ফুলতে লাগল। ক্রমে পর-পর পাঁচ বারে একখানি পঞ্জা। রাগের চোটে হাতের তাশ ফেলে দিল পাগলী। বললে, তোমরা বুঝি খালি-খালি জিতবে ঠাকুরঝি, আর আমরা বারে-বারে হারব, না? মা হাসিমুখে বললেন, 'আমরা সৎপথে. সাত্ত্বিক, আমরা জিতবো না তো কি তোরা জিতবি?'

মা গ্রামোফোন শুনছেন বালিগঞ্জে এক ভক্তের বাড়িতে। শুনে কী খুশি! বালিকার মত আনন্দ করছেন, আর বলছেন, 'কি আশ্চর্য কল করেছে মা।'

বিকেলে রাত্রের কুটনো কুটছেন মা, হঠাৎ পাগলী এসে বললে, 'তুমিই তো আফিং খাইয়ে রাধুকে বশ করে রেখেছ। আমার মেয়েকে, নাতিকে আমার কাছে পর্যন্ত যেতে দাও না।'

'নিয়ে যা না তোর মেয়েকে। ঐ তো পড়ে আছে।'

'দাঁড়াও দেখাচ্ছি।' পাগলী ছুটে বেরিয়ে গেল। বলে গেল. চেলা কাঠ নিয়ে আসছি। তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

ওগো কে আছ গো পাগলী আমায় মেরে ফেললে। মা চেঁচিয়ে উঠলেন।

কাঠ প্রায় মা'র মাথায় পড়ছে এমন সময় একটি ভক্ত মেয়ে এসে রুখে দিলে পাগলীকে। কাঠ ছিনিয়ে নিলে হাত থেকে। ঠেলে বাড়ির বার করে দিলে।

'পাগলী, কি করতে যাচ্ছিলি?' মা বলে ফেললেন, 'ঐ হাত তোর খসে পড়বে।'

বলেই জিব কাটলেন। ঠাকুরের দিকে চেয়ে করজোড়ে বললেন, 'ঠাকুর

এ কি করলাম! আমার মুখ দিয়ে শাপ তো কখনো বেরোয়নি। এ কি হল? তুমি দেখো। রক্ষা কোরো।'

সামনের কুলি-বস্তিতে এক মজুর তার স্ত্রীকে মারছে। অপরাধ? সময়মত ভাত রেঁধে রাখেনি। আর যায় কোথা! প্রথমে চড়, ঘুঁষি, শেষে এমন এক লাথি মারলে যে বউটা কোলের ছেলেশুদ্ধ ছিটকে গড়িয়ে পড়ল উঠোনে। পড়েও রেহাই নেই, আবার পদাঘাত। মা জপ করছিলেন, আর্তকণ্ঠের অসহায় কান্নায় জপ বন্ধ হয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালেন রেলিঙ ধরে। অমন যে লজ্জাশীলা, অমন যে মৃদুকণ্ঠী, নিচে থেকে উপরে যার কথা শোনা যায় না তীব্রস্বরে তিরস্কার করে উঠলেন : 'বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি?'

মজুর তাকালো একবার মা'র দিকে। যেন সাপের মাথায় ধুলো পড়ল। অত যে আগুনের মত রাগ, জলের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রাগারাগির পর চলতে লাগল সাধাসাধি।

বিকেলে রাধু ফিরেছে ইস্কুল থেকে। মা তার চুল বেঁধে দিচ্ছেন। কি খেয়াল হল রাধুর, বললে, আমি নিজেই বাঁধব। মা কেন তবু চুল বাঁধবে, তারই জন্যে চিরুনি ছিনিয়ে নিয়ে চিরুনি দিয়ে মাকে মারতে লাগল।

'সে কি? আমাদের মাকে রাধু কেন মারবে?' যোগেন-মা তেড়ে এল। 'আমি ওকে মারব।'

ওরে, আর যে ব্যথা সইতে পারি না। মা কাৎরে উঠলেন : 'এবার শরৎকে ডাকি।'

শরৎ মহারাজকেই যা একটু ভয় করে রাধু। তার আওয়াজ পেতেই ভালোমানুষটির মত মাথা পেতে দিল। কুসুম তখন বেঁধে দিলে চুল।

'দেখ গো, তোমার কে-ছেলে যেন কি সব নিয়ে এসেছে!' বললে এসে সুরবালা, 'যদি কাপড় এনে থাকে, আমায় দিও, আমি মশারির চাঁদোয়া করব।'

সত্যি সেই ভক্ত ছেলে কাপড় নিয়ে এসেছে. সঙ্গে মিষ্টি আর ফল। ও গোলাপ, এ-সব তুলে নিয়ে রাখো। ঠাকুর উঠলে ভোগ হবে।

একখানা নয়, দুখানা কাপড়। সুরবালা একেবারে দু হাত বাড়িয়ে দিলে। বললে, 'দাও না গো কাপড়খানা, আমি মশারির চাঁদোয়া করব।'

মা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তা কি হয়? তা হয় না। ছেলে মনে দুঃখ পাবে।'

কী সংসারেই মা বাস করছেন, কি-সব আত্মীয়স্বজনের সমাবেশে! ছোট মন, ছোট আকাঙ্ক্ষা, ছোট-ছোট বন্ধনের সংসার। একটা কিছুকে ধরে মায়ায় অবস্থান করা! জীবজগতের শান্তির জন্যে, উদ্ধারের জন্যে। 'জল খাব,' 'তামাক খাব' বলে ঠাকুর যেমন মনকে নামিয়ে আনতেন বস্তু-ভূমিতে, মা'রও তেমনি রাধু-রাধু।

'খা, খা, এ গাঁদালের ঝোল, ঠাকুর খেতেন।' রাধুকে সাধছেন মা।

'খাব না।'

'ওরে খা, ভালো জিনিস। তিনি ভালোবাসতেন, গাঁদাল, ডুমুর, কাঁচকলা।'

'খাব না বলছি।' ধমকে উঠল রাধু।

'আচ্ছা, তবে এই দুধটুকু খা।'

'না বলছি—' রাধু আবার ঝামটা দিল।

রাধুর একটি ছেলে হয়েছে। চারটের সময় দুধ খাওয়াবার কথা, রাধুর জিদ সময় হবার আগেই তাকে খাওয়াতে হবে। মা বারণ করছেন। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে রাধু। গালাগাল শুরু করে দিয়েছে। শেষকালে বলে ফেলেছে, 'তুই মর, তোর মুখে আগুন।'

মা চুপ করে রইলেন। ধৈর্য ধরে রইলেন। কিন্তু রাধু কি থামবার মেয়ে? আরো সব বলতে লাগল যা-তা, যা তার মুখে আসে।

রোগে ভুগে-ভুগে মা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। বললেন, 'হ্যাঁ, টের পাবি, আমি মলে তোর কি দশা হয়! কত লাথি ঝ্যাঁটা তোর অদৃষ্টে আছে কে জানে। তবু তোর ভালোর জন্যে বলছি তুই আগে মর, তারপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজি।'

সেবিকা মেয়ে কে কাছে ছিল তাকে বললেন উদ্দেশ করে, 'বাতাস করো মা, আমার হাড় জ্বলে গেল ওর জ্বালায়।'

আমি তো জন্মাবধি কোনো পাপ করেছি বলে মনে পড়ে না। মা বলছেন আপন মনে। ঠাকুরকে স্পর্শ করে কত লোক মায়ামুক্ত হয়ে গেল। আর আমারই এত মায়া! আমিও তো তাঁকে ছুঁয়েছি। সেই পাঁচ বছর বয়সে ছুঁয়েছি। আমি না হয় তখন নিতান্ত অবোধ কিন্তু তিনি তো ছুঁয়েছেন! তবে আমার কেন এত জ্বালা? আমি তো আমার মন উঁচুতে তুলে রাখতে পারি, কিন্তু জোর করে নিচে নামিয়ে রাখি কেন? নামিয়ে রেখে আমার এত যন্ত্রণা?

মা'র একটি ভক্ত-মেয়ে রাধারানীর জন্যে একজোড়া শাঁখা কিনে এনেছে। কিন্তু রাধিকে পরাতে গিয়ে দেখে, শাঁখা ছোট হয়েছে। মোটেই হাতে উঠছে না। রাধি তো কেঁদে আকুল। গালাগাল যে দিচ্ছে না তাই ঢের। শাঁখা হাতে উঠল না তাইতে ভক্ত-মেয়েরও চোখে জল। মা ডেকে শুধোলেন, কি হয়েছে?

রাধি কেঁদে পড়ল, 'এমন সুন্দর শাঁখা এনেছেন দিদিমণি, কিন্তু হাতে উঠছে না কিছুতেই। ছোট হয়েছে।'

'তোদের যেমন কথা! বৌমা শাঁখা এনেছে, আর সে শাঁখা লাগবে না?' মা আশ্চর্য হবার ভঙ্গি করলেন, বললেন, 'শাঁখা নিয়ে আগে আমার কাছে আসতে হয়! আয় তো দেখি কেমন লাগে না!'

মা শাঁখা নিয়ে বসলেন। ধরলেন রাধুর হাত টিপে। সে স্পর্শে রাধুর হাত নম্র, দ্রব হয়ে গেল। সে স্পর্শ গভীর মমতার স্পর্শ। মায়ার স্পর্শ।

দেখতে-দেখতে রাধুর দুটি মণিবন্ধ বলয়িত হয়ে উঠল। চোখের জল নিয়েই হেসে ফেলল রাধু।

'সুন্দর শাঁখা পরেছ,' মা বললেন স্নেহস্বরে, 'ঠাকুরকে প্রণাম করো, আমাকে প্রণাম করো, বৌমাকে প্রণাম করো।'

ভক্ত-মেয়ে কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'আমি নিচু জাত, আমাকে কেন প্রণাম করবে?'

মা জিভ কাটলেন। বললেন, 'ওসব বলতে নেই। ভক্তের শুধু এক জাত। উঁচু-নিচু বলে কিছু নেই।' রাধিকে লক্ষ্য করলেন, 'যা, তোর দিদি-মণিকেও প্রণাম কর।'

ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করে রাধু দিদিমণিকে প্রণাম করল। ফেরা-ফিরতি ভক্ত-মেয়ে রাধুকে প্রণাম করল। মা হাসতে লাগলেন। বললেন, 'প্রণামটা ফিরিয়ে দিলে?'

এদিকে এই, ওদিকে নলিনীর শুচিবাই।

মনের মধ্যে কত পাপ সঞ্চিত থাকলে তবে মন সব অশুদ্ধ দেখে। কৃষ্ণ বোসের বোনের অমনি শুচিবাই ছিল। গঙ্গায় ডুব দিচ্ছে, আর জিগগেস করছে, হ্যাঁ গা, টিকিটা ডুবল কি? বারে-বারে ডুব, বারে-বারে সংশয়, বারে-বারে জিজ্ঞাসা।

নলিনীও তর্ক করতে ছাড়ে না। বললে, 'সেদিন গোলাপ-দিদি ময়লা সাফ করে এসে শুধু কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল। আমি

বললুম, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস। শুনলে না, উলটে বললে, তোর সাধ হয় তুই যা। এ কোন ধরনের শুদ্ধতা?'

'গোলাপের কথা বলিসনে। অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার। ওই দেহে শুচিবাইয়ের ধার ধারতে হয় না।'

জয়রামবাটির রাঁধুনি বামনি রাত নটা-দশটার সময় এসে বললে, 'কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান করে আসি।'

মা বললেন, 'এত রাতে স্নান কোরো না। হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়ো।'

'তাতে কি হয়?' রাঁধুনি খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল।

'তবে গঙ্গাজল নাও।'

তাতেও রাঁধুনির মন ওঠে না।

তখন মা বললেন, 'তবে আমাকে ছোঁও।'

নলিনীও তেমন বিশেষ ভালো ঘরে পড়েনি। শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে, আর যাবে না কিছুতেই। একদিন রাতে সবাই ঘুমুচ্ছে, নলিনীর স্বামী গরুর গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। কি ব্যাপার? নলিনীকে নিয়ে যাবে। নলিনী ঘরে ঢুকে দরজায় খিল চাপিয়ে দিয়েছে। বলছে, আত্মহত্যা করবে।

এই নিয়ে আবার ঝঞ্ঝাট পোয়ানো। এ দরজায় সাধাসাধি, আবার ও-দরজায় বুঝ-প্রবোধ। তোকে পাঠাব না শ্বশুরবাড়ি, কিছুতে না, এ প্রতিজ্ঞা করার পর নলিনী দরজা খুললে। তখন ভোর হয়েছে। সারা রাত সামনে লণ্ঠন জ্বালিয়ে তার দোরগোড়ায় বসে ছিলেন মা। লণ্ঠনটি এখন নেবালেন। বলতে লাগলেন, 'গঙ্গা, গীতা গায়ত্রী। ভাগবত ভক্ত ভগবান।' শেষে গুঞ্জরণ করতে লাগলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ।'

নলিনীরও মেজাজ কম নয়। সেদিন রাগ করে চারবেলা উপোস করে রইল। মা অনেক সাধ্যসাধনা করলেন, কিছুতে নরম হল না নলিনী। তখন মা বললেন, 'আমাকে তোমার পিসিমা মনে কোরো না। মনে করলে এ দেহ আমি এখুনি ছেড়ে দিতে পারি।'

রাধু আবার মল পরেছে! একটা ঘটি-বাটি জোরে ফেললে পর্যন্ত মা বিরক্ত হন, তায় এই ঝমঝম মলের আওয়াজ!

ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাগাছটা ছুঁড়ে একদিকে ফেলে গেল এক ভক্ত-মেয়ে। মা বললেন, 'ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল অমনি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে ফেললে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, ধীর হয়ে আস্তে রাখতেও ততক্ষণ।

ছোট জিনিস বলে এত তাচ্ছিল্য? শোনো, যাকে রাখো সেই রাখে।'

ভক্ত-মেয়ে দাঁড়িয়ে রইল অপ্রস্তুত হয়ে।

'যার যা সম্মান তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও রাখতে হয় মান্য করে।'

মল-পায়ে দোতলা থেকে নামছে রাধারানী। জোরে শব্দ করতে-করতে নামছে। মা নিচে। ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন উপরের দিকে। সে চাউনিতে আর সকলের বুকের রক্ত শুকিয়ে যায় কিন্তু রাধি বেপরোয়া। মা তখন ঝলসে উঠলেন, 'রাধি, তোর লজ্জা নেই? নিচে সব সন্নেসী ছেলেরা রয়েছে, আর তুই মল পায়ে উপর থেকে দৌড়ে নামছিস? পায়ের মল এখুনি খুলে ফেল।'

খুলে ফেলে মলগুলি মা'র দিকে ছুঁড়ে মারল রাধু। গায়ে যে মারেনি এই রক্ষে।

সেদিন আবার পরিপাটি করে চুল বাঁধছে। ভিজে গামছার চাপ দিয়ে চুলের পাতা নামাচ্ছে।

'ও সব কি করছিস? ও করলে ভাবিস বুঝি খুব সুন্দর দেখাবে? আমি তো জীবনে চুলই বাঁধিনি। গৌরদাসী এসে কখনো-কখনো বেঁধে দিত, তাও বেশি সময় রাখতে পারতুম না, খুলে ফেলতুম।'

গোলাপ-মা বললে, 'তুমি যে মা মুক্তকেশী।'

আবার এই রাধুই মা'র বেতো পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর মা সুর করে তাকে শেখাচ্ছেন, 'বল, ওরে রসনা রে, পুরা বাসনা রে, রাধা-গোবিন্দ গোবিন্দ বলে নে রে। জয় রাধাগোবিন্দ, শ্যামসুন্দর, মদনমোহন, বৃন্দাবনচন্দ্র—'

... সাতাশ ...

ভোরবেলা উঠে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে আসেন মা—একটু দুধ দিতে পারো? হয়তো কোনো ভক্ত এসে অসুখে পড়েছে, তার জন্যে একটু দুধ চাই। কিংবা কোনো ভক্তের একটু চা না হলে চলে না, তারো তৃষ্ণাবারণ করতে হবে। কি করব বলো, শহুরে ছেলে, অভ্যেস করে ফেলেছে, আমি মা হয়ে কি করে তার মুখখানি শুকনো দেখি? কারু যদি অসুখ হয় মা

প্রাণ দিয়ে পড়েন, কে বলবে পেটে-ধরা মা নয়! একবার একজনের হাতে খোস হল, মা তাকে দিনের পর দিন নিজের হাতে খাওয়ালেন। দুপুরে যদি কেউ এসে পড়ে, না খাইয়ে তাকে ছাড়বেন না। অসময়েও যদি কেউ আসে তবে তাকে দেবেন কিছু ফল-মিষ্টি, ফল-মিষ্টি না জুটলে অন্তত দুটি পান। কী বা জিনিস, তুচ্ছের চেয়েও তুচ্ছ, কিন্তু দেওয়ার মধ্যে হৃদয়ের সুঘ্রাণটি এমন মিশে থাকবে, যে নেবে তার করপুট থেকে প্রাণপুট ভরে উঠবে অমৃতে। যখন-তখন যে-সে আসবে আর তার জন্যে তখুনি খাবার যোগাড় করো—গোলাপ-মা ঝাঁজিয়ে ওঠে মাঝে-মাঝে। মুখে এক-বার মা-মা বললেই হল! তা ছাড়া আবার কি! এমন মধুর ধ্বনি তুমি আর শুনেছ কোথাও? ভোরবেলা পাখির ডাক, মাঝরাতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ, শীতের দুপুরে পাতা-ঝরার গান, পাড়ের কাছে নদীর ঢেউয়ের ছলছলানি, কোনো আওয়াজই কি এত মিষ্টি?

মা'র জন্যেও কেউ-কেউ নিয়ে আসে কিছু-কিছু। যদি খাবার জিনিস হয়, মা তা তুলে রাখেন—কখন কোন ছেলে এসে পড়ে তার ঠিক কি। কলকাতা থেকে শরৎ মহারাজ মিষ্টি পাঠান মাকে, মা তা বিলিয়ে দেন অকাতরে। কিছু সিংহবাহিনীর মন্দিরে, কিছু বা ধর্মঠাকুরের থানে। বাকি ভাগ আত্মীয়মহলে নয়তো কখন-কে-আসে ভক্তের জন্যে। নিজে এক কণা মুখেও ঠেকান না। করবো কি বলো! আমি যে মা। আমি শুধু দেব, নিজের জন্যে রাখব না কিছুই।

কিছুই রাখব না? তা কি হতে পারে? একটা জিনিস শুধু রেখেছি। সে সন্তানের জন্যে ব্যাকুলতা। সন্তানের জন্যে শুভাকাঙ্ক্ষা।

কাজ আছে, আমি একটু পাশের গাঁয়ে যাচ্ছি, মা। ফিরবে কখন? এই এলুম বলে। ফিরতে-ফিরতে ছেলের সেই বিকেল। এসে দেখে, মা-ও সারাদিন খাননি, পথ চেয়ে বসে আছেন। তোমার রোগা শরীর, আমি কোন-না-কোন বিদেশ-বিভুঁয়ের ছেলে, তুমি আমার জন্যে উপোস করে বসে থাকবে? মা আর ছেলের মধ্যে বিদেশ-বিভুঁই নেই বাছা, শুধু আঁতের টান।

বসন্ত হয়েছিল মা'র, এখন সেরে উঠেছেন। অন্নপথ্য হয়নি, কিন্তু বড় ইচ্ছে লুকিয়ে একটু ডাঁটা-চচ্চড়ি খান। একটি ভক্ত-ছেলেকে বললেন তা চুপি-চুপি। দেখো কেউ যেন টের না পায়। ভয় নেই, রাঁধুনি বামুনের থেকে আনছি আমি লুকিয়ে। শালপাতায় করে চচ্চড়ি আনলে ভক্ত। দু-

একটি ডাঁটা শুধু মুখে দিয়েছেন, এমন সময় গোলাপ-মা উপস্থিত। ও কি হচ্ছে, মুখ নড়ছে কেন? দুটো ডাঁটা চিবুচ্ছি। কে এনে দিলে? ভক্ত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, চিনতে দেরি হল না। ওমা, ও এনে দিলে? ও তো শুদ্দুর, আর এ তো ভাতে-ছোঁয়া জিনিস, তুমি শুদ্দুরের হাতে খাচ্ছ? মা রোগনাশন হাসি হাসলেন। বললেন, 'ছেলে কি কখনো শুদ্দুর হয়?'

'আচ্ছা মা, আপনি মঠের সন্ন্যাসীদের তাঁদের সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকেন না কেন?' মাকে একদিন জিগগেস করল এক সন্ন্যাসী ছেলে।

মা বললেন, 'আমি মা কিনা, ছেলের সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকতে আমার প্রাণে লাগে।'

কখন রওনা হয়েছ? কোথায় খেয়েছ রাস্তায়? কী খেয়েছ? চেনা-অচেনা যে ছেলেই আসে জয়রামবাটিতে, মা খোঁজ নেন। রাস্তায় কোনো কষ্ট হয়নি তো? এখানে আসতে বড় কষ্ট, তবু তুমি ছেলেমানুষ, একা-একা এসেছ এতদূর। আর কী কাঠফাটা রোদ, মাঠের দিকে তাকানো যায় না, চোখ ঝিম-ঝিম করে।

কামারপুকুর দেখে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল ভক্ত, মনের মধ্যে একটা কান্না উঠে গেল, মাকে একবার দেখে আসি। হোক দুঃসহ রোদ, চলো জয়রাম-বাটি। খাড়া রোদের মধ্যে ধু-ধু মাঠ ভেঙে ছুটে আসছে ভক্ত, কতক্ষণে মিলবে মা'র আতপবারণ স্নেহাঞ্চল। পৌঁছুনো মাত্র ওখানকার ভক্তেরা অনুযোগ দিলে, এত রোদে কখনো আসতে হয়? মাকে কী ভীষণ কষ্ট দিলে বলো দেখি। তুমি রোদে-রোদে আসছ, আর মা বলছেন, রোদের তাপে জ্বলে যাচ্ছি!

বরং গয়া-কাশী সহজ, ক্লেশকর তীর্থ হচ্ছে জয়রামবাটি। টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ো, সোজা গিয়ে হাজির হও দরবারে। কিন্তু এখানে? ট্রেনে উঠেও শান্তি নেই। গরুর গাড়ি, নৌকো, আবার পায়ে হাঁটো। হাজার রকম হ্যাঙগাম। কিন্তু, যাই বলো, মা'র জন্যে ছেলে পথে-পথে ঘুরে বেড়াবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না জয়রামবাটিতে গিয়ে ওঠে। মা ফেলে ছেলে স্বর্গেও যেতে চায় না।

যখনই কেউ বিদায় নেয়, সে ক্ষণটি মা'র কাছে একটি পরম বেদনার বিন্দু হয়ে দেখা দেয়। কতটা পথ এগিয়ে দিয়ে যান, স্নেহভারাতুর চোখ দুটি জলে ছলছল করে ওঠে। যতক্ষণ না চোখের আড়াল হয়ে মুছে যায় একান্তে চোখ ফিরিয়ে নেন না। বৃষ্টি হলেও বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে

থাকেন। অশ্রুমতী প্রকৃতির মত। স্নেহচ্ছায়ানিবিড় সিক্ত দৃষ্টিটি প্রসারিত করে।

তারপরে কত জনের কত রকম আবদার, কত রকম বেয়াড়াপনা। কত রকমের বিরক্তিকর ব্যবহার। সব অম্লানমুখে সয়ে যান। মন্ত্র দাও, প্রসাদ দাও, পুজো করব তোমাকে, তোমার পা ছোঁব, মাথা ঠুকে তোমার পায়ে ব্যথা করে দেব, ধুলোকাদা মেখে এসেছি, ত্রাণ করো।

অসুখের সময় অনুপায় হয়ে শুয়ে আছেন মা, কোত্থেকে এক সাধু এসে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম। ভালো লাগেনি মা'র। সাধুকে কিছু বললেন না, তার চলে যাবার পর বললেন সেবিকা মেয়েদের, 'আমার মাথায় কাপড় দেওয়া নেই, কাপড়টা দিয়ে দাওনি কেন? আমি কি মরে গেছি?'

একজন ভক্ত এসে মাকে ধরলে। 'এত তো জপ-তপ করলুম, কিছুই তো হল না।'

যেন মা'র অপরাধ! বললেন, 'বাবা, একি শাক-মাছ যে দাম দিয়ে কিনলুম? মনের ময়লা কাটাও। চন্দন ঘষে-ঘষে গন্ধ বার করো। ও কি দু-চার দিনে হয়? ঠাকুরের কৃপার জন্যে প্রার্থনা করো।'

সেদিন বুড়ো-মতন কে একজন এসেছে, বলছে, মন্ত্র চাই। রামকৃষ্ণ নামে একজন মস্ত সাধু ছিলেন, তাঁকে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি তাঁর স্ত্রীও নাকি কিছু শক্তি পেয়েছেন তাঁর থেকে। তাই তাঁর স্ত্রীর থেকে মন্ত্র নিতে এসেছি।

ঠাকুর শুধু সাধু কি গো? তিনি যে ঠাকুর।

তা যখন দেখিনি, তখন কি করে বলব! যাঁকে দেখছি চোখের সামনে তাঁকে ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ।

'ও যোগেন, এ যে ঠাকুরকে মানে না,' মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, 'কি করি বলো তো?'

'মন্ত্র দাও। ও জানে না তোমার মন্ত্রের ফল কি।' বললে যোগেন-মা।

পাথরও তো মাটিই। কি মন্ত্র পায়, তার গুণে মাটিও পাথর হয়, সাধনায় দৃঢ়ীভূত হয়। মন্ত্র দিলেন মা। মন্ত্রের গুণে সমস্ত জীবনে একটি স্তব গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। মঙ্গলকথান্বিত প্রণামপ্রসন্ন স্তব। ধীরে-ধীরে চিনতে পারল রামকৃষ্ণকে। সর্বসংশয়নির্মোক্তাকে। ছিল শুকনো কাঠ হয়ে দাঁড়াল ফলপুষ্পব্যাপ্ত শাখা।

কী হয় ঈশ্বরকে পেলে? বললেন একদিন মা। দুটো শিঙ বেরোয়, না, ল্যাজ গজায়? মনটা ফুলের মত হয়ে যায়, শিশুর মত হয়ে যায়, জ্যোৎস্নার মত হয়ে যায়। আর মন পবিত্র হয়ে গেলেই তাতে আলো জ্বলে। জ্ঞানের আলো। সেই আলোতেই বিশ্বরূপদর্শন।

অন্নের মত মন্ত্র বিতরণ করছেন মা। সেই মন্ত্রই উপবাসী জীবনের পরমান্ন। জীবজীবনের বধির দেয়ালে কি করে একটি ফোকর ফোটাবেন, যা দিয়ে দেখা যাবে নবপ্রভাতের সূর্যোদয়, পাওয়া যাবে মুক্তিমলয়ের তৃপ্তিস্পর্শ।

যত্র-তত্র মন্ত্র দিয়েছেন। বারান্দায়, ছাঁচতলায়। স্বদেশী আন্দোলনে লিপ্ত থেকে পুলিশের নজরে পড়েছে, তাই সে মা'র বাড়িতে ঢুকতে নারাজ, অথচ তার মন্ত্র চাই এখুনি। সেই বন্দেমাতরং মন্ত্র। যা জননী জন্মভূমি তাই দশপ্রহরণধারিণী রিপুদলবারিণী দুর্গা। মা মাঠে এসেছেন ছেলের সঙ্গে, আসন কোথায়, খড় পেতে বসেছেন দুজনে। মৃত্যুতরণ মন্ত্র দিলেন ছেলেকে। একবার একজনকে মন্ত্র দিলেন বৃষ্টির মধ্যে, রেল-কম্পাউন্ডে—দুজনের মাথার উপর ছাতা ধরা। পাপপাবন জল কোথায়? গোষ্পদে যে জল জমে আছে তাই আঙুলে করে তুলে নিলেন মা। মা'র ছোঁয়া-লাগা সেই জল জ্বলদগ্নির মত কাজ করবে।

কিন্তু যাই মন্ত্র দিই, আমার এই মন্ত্রণাটি নিও, ঠাকুরই সব। প্রধান-পুরুষেশ্বর। সবই তাঁর, সবই তিনি।

তিনিই যদি সব, তবে আপনি কি? জিগগেস করলে একজন। মা বললেন, 'আমি কিছুই না, ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট।'

'কেমন আছ?' প্রণাম করছে একজন ভক্ত, তাকে জিগগেস করলেন মা।

'আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি।'

'তোমাদের ওই বড় দোষ। সব কথায় আমাকে টানো কেন? ঠাকুরের নাম বলতে পারো না? যা কিছু দেখছ সব ঠাকুরের।'

কিন্তু যাই বলো, কান্নার মত মন্ত্র কি! ভালোবাসার মত দীক্ষা কি।

মাঝি-বউ অনেকদিন আসে না এদিকে। কি হলো তার কে জানে। সেদিন মজুরনী সেজে এসেছে মাথায় মোট নিয়ে। চুল রুক্ষ, মুখখানি বড় শুকনো। মাকে প্রণাম করল বিমনার মত। মা জিগগেস করলেন, কি হয়েছে রে? মাগো, আমার সেই রোজগারী জোয়ান ছেলেটা মারা গেছে।

বলিস কি? মা কেঁদে উঠলেন। যে বোবা কান্না গুমরে উঠছিল মাঝি-

বউয়ের বুকের মধ্যে তাকে মা মুক্তি দিলেন। তার সমস্ত শোক টেনে নিলেন নিজের মধ্যে। বারান্দার খুঁটিতে মাথা রেখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। কি হল, কি হল, লোকজন ছুটে এল চারদিক থেকে। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। মাঝি-বউও যেন স্তম্ভিত। সংসারে পুত্রহারা জননীর শোক যেন মা'র অজানা নয়, মর্মের অন্তস্থল থেকে উঠেছে সেই বেদনার উৎসার।

যেন মা'রই ছেলে নেই। যেন মাঝি-বউয়েরই এবার সান্ত্বনা দেবার পালা। মা, কেন কাঁদছ? কার ছেলে? যিনি দিয়েছিলেন তিনিই নিয়ে গেছেন। সংসারে সবই তাঁর। আমার-তোমার বলে কেউ নেই।

অক্ষয় সেন সবজি পাঠিয়েছে একটি কুলি-মেয়ের হাত দিয়ে। সন্ধে হয়ে গেছে, এখন কোথায় আর যাবে, মা'র বাড়িতেই থাকো। ম্যালেরিয়ার রুগী, মাঝ রাতে প্রবল জ্বর, সঙ্গে বমি। মা ঠিক টের পেয়েছেন। নিজে গিয়ে সমস্ত বমি পরিষ্কার করে দিলেন, জল দিয়ে ধুয়ে দিলেন আগা-গোড়া। এ কাজ করবার লোক ছিল বাড়িতে, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই হত, কিন্তু যে-ই মুক্ত করতে আসবে, মেয়েটাকে নির্ঘাত বকে নেবে একদফা। সেই বকুনির থেকে রেহাই দিলেন মেয়েটাকে।

নবদ্বীপ যাবে বলে কামারপুকুরে এসেছে একটি মেয়ে। নাম হরি-দাসী। কি ভাব হল, আর গেল না নবদ্বীপ। শুধু মুঠো-মুঠো ঠাকুরের জন্মস্থানের ধুলো কুড়োতে লাগল। বললে, 'এই তো নবদ্বীপ। গৌরাঙ্গ তো এইখানেই এসেছিলেন। আবার কি করতে যাব ও-পাড়া?'

তারপরে তুমি আছ।

ধারাবারিসমা করুণা। শিবভাবিতা অনন্তমায়া।

একটি স্ত্রী-ভক্ত এসেছে, সঙ্গে একটি পরের ছেলে। এটি আবার কেন? স্ত্রী-ভক্ত বললে, এটিকে মানুষ করব। বড় মন পড়েছে।

'অমন কাজও কোরো না।' মা বারণ করে উঠলেন : 'এই দেখ না রাধুকে নিয়ে আমার কী দশা! যার উপর যেমন কর্তব্য তেমনি করে যাবে হাসি-মুখে। ভালো এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। ভালোবাসলেই অনেক দুঃখ।'

বিষ্ণুপুর থেকে গরুর গাড়িতে করে আসছেন মা। সঙ্গে রাধু। কোতুলপুরে নামবেন। কাছাকাছি আসতেই রাধু পা দিয়ে মাকে ঠেলতে লাগল। বললে, 'সর্, সর্ বলছি, তুই গাড়ি থেকে নেমে যা।'

গাড়ির পিছন দিকে সরে যেতে-যেতে মা বললেন, 'আমি যদি যাব তবে তোকে নিয়ে তপস্যা করবে কে?'

একবার তো সরাসরি মাকে লাথিই মেরে ফেলল।

'করলি কি, করলি কি রাধু?' বলে নিজের পায়ের ধুলো মা রাধুর মাথায় বারে-বারে ঠেকাতে লাগলেন।

সেই রাধুর ছেলে হয়েছে। কোয়ালপাড়ার মত বুনো জায়গায় হয়েছে বলে মা তার নাম রেখেছেন বনবিহারী। রোজ সকালে যখন সেই ছেলের ঘুম ভাঙান মা, গান ধরেন : 'উঠ লালজি, ভোর ভায়, সুর-নর-মুনি-হিতকারী। স্নান করে দান দেহি গো-গজ-কনক-সুপারি। জানো, এ কৌশল্যার গান। এই গান গেয়ে ঘুম ভাঙাতেন রামচন্দ্রের।'

...আটাশ...

আমাকে ঠাকুর রেখে গিয়েছেন। কেন তা বলতে পারো? তিনি চলে যাবার পরও চৌত্রিশ বছর বেঁচেছি।

কেন তা তোমাকে বলি। ঈশ্বরের মধ্যে একটি মাতৃরূপ আছে। সেইটিই জগতের সামনে প্রকাশ করে দেখাতে।

রাত্রে এসেছে নিবেদিতা। মা'র জন্যে যে কি করবে ভেবে পায় না। মা'র চোখে আলো পড়ছে, একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিলে। প্রণাম করলে পায়ে হাত দিয়ে। যেন পায়ে হাত দিতেও তার কত কুণ্ঠা। রুমালে করে সন্তর্পণে কুড়িয়ে নিল পায়ের ধুলো।

সরস্বতী পুজোর দিন খালি পায়ে ঘুরে বেড়াল। কপালে হোমের ফোঁটা। সে কি গৌরগৌরব মূর্তি! আগুন কি লাল? লাল তার বাইরের রঙ। তার ভেতরের রঙ শাদা। নিবেদিতা যেন সেই শ্বেতবহ্নি।

খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিবেদিতা। আকাশে ঝড় উঠেছে। কালির মত কালো করে এসেছে অন্ধকার। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ফেটে পড়ছে বজ্র। চুল উড়ছে, স্পন্দনহীনের মত দাঁড়িয়ে আছে নিবেদিতা। যুগ্মকর বুকের কাছে যুক্ত করা। জপ করছে অস্ফুটস্বরে : কালী, কালী, কালী।

মা নিবেদিতার জন্যে ছোট একটি উলের পাখা করেছেন। 'তোমার

জন্যে আমি এটি করেছি।' হাত বাড়িয়ে নিল সেটি নিবেদিতা।

সেটি নিয়ে কি যে করবে ভেবে পায় না। একবার মাথায় রাখে, একবার বুকে ঠেকায়, একবার মুখের কাছে বাতাস খায় মৃদু-মৃদু। আর থেকে-থেকে বলে ওঠে, কি সুন্দর, কি চমৎকার। যত লোক আসে, সবাইকে দেখায় আনন্দ করে, 'কি সুন্দর মা করেছেন দেখ।' পরে কথার সুরে একটু গর্ব মেশায় : 'আর, আমাকে দিয়েছেন!'

সামান্য জিনিস নিয়ে অসামান্য খুশি—এই না হলে ভক্তি!

'কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ! আহা কি সরল বিশ্বাস। যেন সাক্ষাৎ দেবী।'

সেই দেবীমূর্তির বৈভব মা'র রূপেও প্রস্ফুট ছিল। যতদিন পর্যন্ত রাধুকে আঁকড়াননি ততদিন। ঠাকুর অপ্রকট হবার পর যখন প্রেমানন্দের মা প্রথম দেখল মাকে, উল্লাস করে উঠল, বললে, 'মা, এত রূপ এত লাবণ্য তুমি কোথা পেলে?'

যখনই রাধু এল মায়া এসে ছায়া ফেললে। সেই ছায়ায় রূপ মলিন হয়ে গেল। আগে তপস্যায় দেবী ছিলেন। সর্বসৌন্দর্যনিলয়া সর্বেশ্বরী। এখন মায়ায় মা হয়েছেন। দীনবৎসলা করুণাবরুণালয়া।

কাশীতে যেবার গিয়েছিলেন, কটি স্ত্রীলোক এসেছেন মাকে দেখতে। মা আর গোলাপ-মা কাছাকাছি ব'সে, কোন জন যে দর্শনীয় বুঝে উঠতে পারছে না। গোলাপ-মা'রই বেশ ভারিক্কি চেহারা, সবাই ভাবলে এই বুঝি মা-ঠাকরুন। গোলাপ-মাকে প্রণাম করতে এগুলো সকলে। পোড়া কপাল! কাকে ধরতে এসে কাকে ধরছে! ওগো ঐ যে, উনিই মা-ঠাকরুন। দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। মাও অমনি দুষ্টুমি করে বললেন, না গো না, তোমরা ঠিকই ধরেছিলে, উনিই মা-ঠাকরুন। মেয়েরা দোটানায় পড়ল। শেষে সাহস করে সাব্যস্ত করলে গোলাপ-মাই আসল মা—বেশ মোটা-সোটা বুড়ো-সুড়ো যখন দেখতে। শেষ পর্যন্ত যখন তার দিকেই এগুচ্ছে, গোলাপ-মা ধমক দিয়ে উঠল, 'তোমাদের কি কারুই বুদ্ধি-বিবেচনা নেই? ওদিকে তাকিয়ে দেখছ না, ও কি মানুষের মুখ, না, দেবতার মুখ?'

সবাই তাকাল একদৃষ্টে। সত্যি, আরতির আলোকে প্রতিমার মুখের মত দেখল এবার মা'র মুখ, দেখল হৃদয়ের নির্জনে-জ্বালানো ভক্তির আলোতে। দেখল দেবতার মুখ।

বুড়ো হবেন এ ঠাকুরের একেবারে মনঃপূত ছিল না। বলতেন, 'লোকে ঐ যে বলবে রানি রাসমণির কালীবাড়িতে একটা বুড়ো সাধু থাকে, সে কথা আমি সইতে পারবোনি।'

সারদা বললে, 'ও কথা কি বলতে আছে? বুড়ো হয়ে থাকলেও লোকে বলবে, রাসমণির কালীবাড়িতে কেমন একজন পিরবীণ সাধু থাকেন।'

'হ্যাঁ,' পরিহাস করলেন ঠাকুর : 'লোকে তোমার অত পিরবীণ-ফিরবীণ বলতে যাচ্ছে আর কি। চণ্ডীদাসের গল্প জানো না?'

বলে গল্প শুরু করলেন :

'চণ্ডীদাস লেখাপড়া কিচ্ছু করত না। ছেলেবেলায় বড় মুখখু ছিল। বাপ একদিন রেগে-মেগে মাকে বললে, চণ্ডেটাকে আর ভাত দিও না। চাট্টি-চাট্টি ছাই দিও।

চণ্ডীদাস খেতে বসেছে, পাতের একধারে ছাই। মাকে জিগগেস করলে, একি? মা বললে, তুমি কিছু পড়-টড় না, তোমার বাবা তোমাকে ছাই খেতে দিতে বলেছেন। আমি মা, শুধু ছাই দিই কি করে, তাই কটি ভাতও দিয়েছি।

অভিমান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল চণ্ডীদাস। মনের দুঃখে মা-বাশুলীকে ডাকতে লাগল। বাশুলী দেখা দিলেন। বললেন, মূর্খতা ঘুচে যাবে। গান গাইতে পারবে।

চমৎকার গান গায় চণ্ডীদাস। যে ঘাটে মেয়েরা চান করে তার কাছে বসে মিষ্টি গলায় গান গায়। যে শোনে সেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। শুধু নিন্দুকের দল বলে চণ্ডীদাস বকে গিয়েছে।

রাজার কানে কথা উঠল। চণ্ডীদাসের গানের কথা। সমাদর করে রাজা তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। তার দুঃখের রাত ভোর হল। নামযশ হল, অপবাদের লেশও রইল না। কিন্তু দুঃখের মধ্যে, বেশি দিন বেঁচে অবশেষে বুড়ো হয়ে গেল। তার মধুর ভাব, মেয়েদেরও বিস্তর আনাগোনা। মেয়েরা আসে কিন্তু বুড়োকে বাপ বলে। তাতে চণ্ডীদাস বড় বেজার। বলছে খেদ করে,

বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে, এ বড় বিষম তাপ,
যুবতী আসিয়ে শিয়রে বসিয়ে আমারে কহিবে বাপ।

তা আমি বুড়ো-নাম সহ্য করতে পারবোনি বাপু।'

গল্প শুনে সকলের হাসি।

যত ভার আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি চলে গেলেন। সাতষট্টি বছর বাঁচলুম। নিলুম জরা, নিলুম ব্যাধি, সংসারজ্বালায় কালো হয়ে গেলুম। সকলের বিষ নিয়ে-নিয়ে আমার এ জীর্ণদশা।

কি করব, আমি যে ব্যথানাশিনী বিশল্যকরণী। আমি যে নিস্তার-দাত্রী।

মাকুর যে ছেলেটি মারা যায় ডিপথিরিয়ায় তার নাম ছিল নেড়া। সংসারীদের ছেলেমেয়ে মরলে কি কষ্ট তাও আমাকে বুঝতে হবে!

যেহেতু মাকুর পিসি সেই সুবাদে নেড়াও পিসি ডাকে। শুধু তাই নয়, ও ছোট ছেলের কি ভাব, সীতা বলে। দাঁত পড়ে গিয়েছে মা'র, সিঁড়িতে বসে পা দুলিয়ে-দুলিয়ে বললে, 'পিসিমা, আমার দাঁত দুটি নাও।'

নিবেদিতাও চলে গেল। তুই বিদেশিনী মেয়ে, তুই আবার কেন কাঁদাতে এলি? কেন এত ভালোবাসলি আমাকে? গির্জেয় গিয়ে যীশু-মাতা মেরীকে না দেখে তুই আমায় কেন দেখতে গেলি? আমি তোর কে?

নিবেদিতার জন্যে আক্ষেপ করে মা বলছেন : 'যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্যে কাঁদে মহাপ্রাণী।'

যে ভালো লোক হয় তার জন্যে অন্তরাত্মা কাঁদে। আর, ভালো লোক কে? যে ভালোবাসে।

'স্বামী বলো, পুত্র বলো, দেহ বলো, সব মায়া।' বলছেন মা ভক্তদের : 'এই সব মায়ার বন্ধন। কাটতে না পারলে ত্রাণ নেই। কিসের দেহ মা, দেড় সের ছাই বই তো নয়—তার আবার গরব কিসের! যত বড় দেহখানিই হোক না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই! তাকে আবার ভালোবাসা!'

দেহের মধ্যে যিনি দেহী আছেন তাঁকে ভালোবাসো।

বলছেন আবার জের টেনে, 'দেহী সব শরীর জুড়ে রয়েছেন। যদি হাঁটু থেকে মন তুলে নিই তা হলে আর হাঁটুতে ব্যথা নেই।'

নিজের হাতে ফুলের মালা গেঁথেছেন। ঠাকুরের ছবিতে পরিয়ে দেবেন। কাপড় কেচে এসে বসলেন বিকেলের ভোগ দিতে। কে এক ব্রহ্মচারী ছেলে রসগোল্লা এনে রেখে গেছে। তার রস গড়িয়ে লেগেছে ফুলের মালায়। ফলে, পিঁপড়ে ধরেছে। এ কি করেছ? মা বলে উঠলেন,

ঠাকুরকে যে পিঁপড়েয় কামড়াবে। ফুল থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে লাগলেন। নিষ্কীট করে পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।

স্বামীকে সাজাচ্ছেন তাই দেখে সুরবালা মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগল।

দু গাছি গড়ে মালা পাঠিয়েছে কে এক সন্ন্যাসী। পুজোর সময় পরিয়ে দিলেন ঠাকুরের গলায়। পরে সেই সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'অত ভারী মালা দিও না, ঠাকুরকে বড্ড লাগবে।'

ঠাকুর কি পট, ছায়া, শূন্য? ঠাকুর স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, পরিপূর্ণ। সর্ব-দ্রব্যে মহাদেব। জ্বলজ্বল করছেন চোখের সামনে। চলছেন ফিরছেন খাচ্ছেন ঘুমোচ্ছেন।

তাঁর ছবি দেখ। দেখ তাঁর এই বিশ্বপ্রকৃতি।

ছেলেরা পালা করে ঠাকুরের সেবা করছে কাশীপুরে। গোপাল এক ফাঁকে ধ্যানে বসেছে। গিরিশ ঘোষ দেখে বলছে, কার ধ্যান করছিস রে চোখ বুজে? যার ধ্যান করছিস তিনি রোগশয্যায় কষ্ট পাচ্ছেন। ওঠ তাঁর পা টিপে দে গে।

চোখ বুজে যাকে দেখতে চাইছ তাকে যে চোখ মেলেই দেখা যায় অনায়াসে। তাকে তোমার ঘরের চারদিকে দেখ, দেখ তোমার পৃথিবীর দশ দিকে। ছবিতে-ছবিতে ভুবনের হাটে আনন্দমেলা বসিয়ে দাও।

ঠাকুরকে ভোগ দেবার সময় হয়েছে। চুপি-চুপি মা ঢুকলেন ঠাকুর-ঘরে। লাজমুখী বধূটির মত বলছেন ঠাকুরের ছবিকে উদ্দেশ করে, এস খেতে এস।

গোপালের বিগ্রহ আছে পাশটিতে। তাকেও বলছেন বাৎসল্যবিহ্বল কণ্ঠে, এস খেতে এস।

কে একটি ভক্ত-মেয়ে দেখছিল এই অন্তরঙ্গ দৃশ্যটি। তার উপরে চোখ পড়তেই মা বলে উঠলেন : 'সকলকে খেতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।'

ভক্ত-মেয়েটি অনুভব করল মা এমনি ভাব করছেন যেন ঠাকুররা চলেছেন তাঁর পিছনে।

কোয়ালপাড়াতে এসে মা জ্বরে ভুগছেন।

সেদিন জ্বর নেই, দুর্বল শরীরে বসে আছেন বারান্দায়। পাশে বসে নলিনী কি সেলাই করছে। বাইরে প্রচণ্ড রোদ, মাঠ-ঘাট খাঁ-খাঁ করছে।

হঠাৎ মা দেখতে পেলেন, সদর দরজা দিয়ে ঠাকুর ঢুকে পড়েছেন

বাড়িতে। দিব্যি এসে বসলেন বারান্দায়। শুধু তাই নয়, ঠাণ্ডা পেয়ে শুয়ে পড়লেন।

মা তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল পেতে দিতে গেলেন। 'ঠাকুর' এই কথাটি বলতে-না-বলতেই টলে পড়লেন মাটিতে। কেদারের মা, আরো লোকজন সব ছুটে এল। চোখে-মাথায় জল দিতে লাগল। সুস্থ হলে পরে নলিনী জিগগেস করলে, 'অমন হল কেন, পিসিমা?'

মা চেপে গেলেন। বললেন, 'ও কিছু না, ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।'

মনের মধ্যেই কেঁদে মরি। আমার হৃদয়ের ঘট ভগবদরসে ভরা হয়ে আছে। বাইরে বড় রোদ। এসো আমার হৃদয়কুঞ্জের শ্যামচ্ছায়ায়। তুমি আমাকে সরস করেছ নিজে তুমি স্নিগ্ধ হবে বলে। আমার মানসাঞ্চলে শোও, নাও আমার শ্রদ্ধাপূত সেবা, আমার সত্যপূত বাক্য, আমার উন্মেষনিমেষশূন্য তন্ময়তা।

আমার পূজার ঘরটিতে এস। জ্ঞানদীপ জেবলেছি সেখানে, সত্য-ধূপের সুগন্ধ উঠেছে। ভক্তিই সেখানে গঙ্গাবারি, সেবাকর্মই পুষ্প। আর বিল্বপত্র প্রেম, অনুরাগই চন্দন। অর্ঘ্য হচ্ছে মন, নৈবেদ্য শরীর। হে সুহৃদন্তরাত্মা, নাও আমার অন্তরের অমিয়।

'হাতখানি দাও তো মা, ধরে উঠি।' কলঘরে যাবেন, রোগশয্যা থেকে হাত বাড়ালেন মা। বললেন, 'প্রায়ই আজকাল জ্বর হয়। শরীরে আর জোর নেই।'

একটি মেয়ে এসে মা'র হাত ধরল। কষ্টে উঠলেন বিছানা থেকে। এগিয়ে দোরগোড়া পর্যন্ত এসেছেন, সহসা খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'এই দেখেছ গো, দোরগোড়ায় কে একগাছি লাঠি রেখে গেছে।'

বহুদিন থেকেই বলছিলেন, আপন মনে, একটা লাঠি পাই তো ভর দিয়ে একটু হাঁটতে-চলতে পারি। কাঁহাতক আর পরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াব। পা দুখানি তো নিয়েছ, এখন একখানি লাঠি না যোগাতে পারো কিসের তুমি ক্লেশহারী জনার্দন!

ঠাকুর ঠিক যুগিয়ে দিয়েছেন লাঠি। কে ফেলে গেছে গো লাঠি, কখন ফেলে গেল? কার লাঠি এটি? কেউ জানে না। যেন নিজের থেকে চলে এসেছে হাঁটতে-হাঁটতে।

নিজেই বা কি কম হেঁটেছি? যখন পা ছিল জয়রামবাটি থেকে

দক্ষিণেশ্বর হেঁটে এসেছি। হেঁটে-হেঁটে কত কাশী-বৃন্দাবন দর্শন করেছি। এখন ধরে-ধরে নিতে হয়। দু-হাত যেতে পালকি লাগে। তাই বলি শরীরে শক্তি থাকতে-থাকতে করে নাও সাধন-ভজন। শেষে একদিন দেখবে চোখ মেলে, সবই ঠিক আছে, শুধু তোমারই আর সময় নেই।

ঠাকুরের ছবি একখানি নিজের কাছে রাখবে সব সময়। তাঁর সঙ্গে কথা কইবে। যা কিছু খাবে তাঁকে আগে নিবেদন করে খাবে। দেহের রক্ত শুদ্ধ হয়ে যাবে।

জয়রামবাটিতে যাচ্ছেন একবার, পথের পাশে রান্না হচ্ছে জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে। মাটির হাঁড়িতে ভাত চেপেছে। নামাতে গিয়ে পড়ে গেল হাঁড়ি, ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ভাতের থূপ পড়ল মাটির উপর। নিজেরা কি খাবে সেটা ভাবনার কথা নয়। ভাবনার কথা ঠাকুরকে কী ভোগ দেবে! আর-আর মেয়েরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তাতে কি? মা সকলকে নিশ্চিন্ত করলেন। এই ভাতই দিব্যি খাবেন আজ ঠাকুর—যেদিন যেমন জুটবে তেমনি। উপর-উপর পরিষ্কার ভাত তুলে নিলেন মা, সরল স্বচ্ছন্দ মনে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিলেন। 'যেমন মেপেছ তেমনি খাবে আজ। নাও, বোসো।'

ঠাকুর যেন ঘরের মানুষ। আত্মভোলা আশুতোষ। একেবারে সহজ-সুলভ শিব। সামান্য মাটিতে শিবের পুজো। একটু গঙ্গাজল আর কটি বেলপাতা। শঙ্খ-ঘণ্টাও লাগে না, সামান্য একটু গালবাদ্য।

আর তুমি? 'তুমি অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।' তুমি সহজের সহযায়ী।

ঠাকুর যেমন তাঁর ছেলেদের ভালোবাসতেন তেমনি করে তুমি কি বাসো আমাদের? তাঁর সে কী ব্যাকুলতা ছিল, তোমার কি তেমনি আছে?

'তা আর হবে না?' মা বললেন, 'ঠাকুর নিয়েছেন সব বাছা-বাছা ছেলে কটি। তাও, এখানে টিপে, ওখানে খোঁচা মেরে। আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে পিঁপড়ের সার।'

যত অধম আতুর অনাথ অবল। আমার তো ব্যাকুলতা নয় আমার সহিষ্ণুতা। আমি আবার ডাকব কাকে? সবাই যে আমার অঞ্চলছায়ায় বসে আছে। কার জন্যে অস্থির হব? সবাই যে রয়েছে আমার গণনার মধ্যে।

একটি নাথের ছেলে বারান্দায় এসে বসেছে।

১৩১৬ সাল — পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদামাতা

'ঘরে এসে বোসো।'

'না মা, বারান্দাতেই বসি। আমি হীনজাত।'

'কে বলেছে হীনজাত? আমার ছেলে কখনো হীনজাত হতে পারে? এসো, ঘরে এসো।'

...উনত্রিশ...

হরীশের বউ হরীশকে ওষুধ করেছে। হরীশ ত্যাগের পথে যাবে এ তার স্ত্রীর মনঃপূত নয়। ওষুধের ফল হল এই, হরীশ পাগল হয়ে গেল।

তার জন্যে তার উপরে মা'র অপার করুণা। সৌভাগ্যামৃতবর্ষী দুটি চোখে মুছে নিতে চান তার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত কালিমা।

তার অনেক পাগলামি সহ্য করেন মা। কখনো-কখনো পাগল মাকে প্রকৃতি-রূপে সম্বোধন করে। বলে, প্রসাদ রেখে গেলাম তোমার জন্যে। ভুক্তাবশিষ্ট ফেলে রাখে খাবার থালায়। তার এই প্রচণ্ড অশিষ্টতাও মা গায়ে মাখেন না। ক্ষমাময় ঔদাসীন্যে নিরস্ত করে রাখেন।

সেবার কামারপুকুরের বাড়িতে মা একা আছেন। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তাঁর দিকে ছুটে এল হরীশ। এ যে পাগলামির চেয়েও ভয়ানক। মাও ছুটতে লাগলেন। হরীশও পিছু নিল। উপায়? বাড়িতে আর কেউ নেই, কে রক্ষা করে? ধানের মরাই ছিল একটা উঠোনে, তার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন। পিছনে সেই হরীশ, তেমনি দুর্দম্য-উদ্যত। সাত-সাত বার ঘুরলেন মা, পাগলের তবু নিবৃত্তি নেই। তখন অন্তরীক্ষের দিকে তাকিয়ে অপ্রত্যক্ষকে না ডেকে নিজের সুপ্তশক্তিকে আহ্বান করলেন। মৌন মাটির আস্তরণ সরিয়ে অভ্যুত্থান হল আগ্নেয়গিরির। ঘুরে দাঁড়ালেন, রুখে দাঁড়ালেন। ধরলেন তাকে সবলে, পেড়ে ফেললেন তাকে মাটিতে, হাঁটু গেড়ে বসলেন তার বুকের উপর। এক হাতে টেনে ধরলেন তার জিব, অন্য হাতে চড় মারতে লাগলেন অবিরল। হে°-হে° করে হাঁপাতে লাগল হরীশ।

হয়ে গেল বুঝি। ছেড়ে দিলেন শেষকালে। হয়ে যায়নি, কিন্তু তরে গেছে। কেউ তরে মন্ত্রে, কেউ তরে মারে। প্রহারও মা'র উপহার। মা

যখন মারেন তখনও মাকেই আঁকড়ে ধরি, তখনও কান্নার বুলি মা-মা।

মানুষ করে আম্বা, ঘটান জগদম্বা। হরীশের পাগলামি সেরে গেল। পালিয়ে গেল বৃন্দাবন।

'আচ্ছা মা, তখন কি আপনি বগলা-মূর্তি ধরেছিলেন?' জিগগেস করল ভক্তদল।

'কে জানে বাপু, তখন আমাতে আমি ছিলুমনি।'

তখন আমি সাকারশক্তিস্বরূপা। তখন আমি প্রবলিকা হুঙ্কার-ঘোরাননা। প্রলয়ঘনঘটা-ঘোররূপা প্রচণ্ডা। কী জানি আমি তখন কে!

কেন ভাবছ? সকল মেয়ের মধ্যেই রয়েছে এই গুহ্যকালী। এই সাট্ট-হাসা বগলামূর্তি। বাইরে দেখছ লাবণ্যবারিভরিতা মেঘশ্রেণী, কিন্তু অন্তরে আগ্নেয়ী বিদ্যুন্মালা। শুধু মধুমতী লক্ষ্মী নয়, জ্বালামালিনী কালী। শুধু লাস্যের লীলাকমল নয় বৈরিমর্দনের আয়ুধ-বজ্র।

সকলের মা। বৈরীর মা, বান্ধবের মা। ভক্তের মা, বিমুখেরও মা। সতের মা, অসতেরও মা। বর্তমানের মা, ভবিষ্যতেরও মা।

যে উপেক্ষা করে তারও মা, যে অপেক্ষা করে তারও মা।

একটি মায়ের একটি মাত্র সন্তান। সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে। গৃহ শ্মশান হয়ে গেছে, তাই পুত্রহারা মা এসেছে শ্মশানবাসিনীর কাছে। পায়ের কাছটিতে বসে কাঁদছে নীরবে।

মা'র চোখও অশ্রুতে টলটল করছে। বলছেন, 'আহা, একটিমাত্র ছেলে, মা'র প্রাণের ধন, এমন করে চলে গেল! আহা, এখন মা কী নিয়ে থাকে বলো দেখি।'

কিন্তু আরেকটি মায়ের দু-দুটি ছেলে সন্ন্যাসী হয়েছে। মা'র কাছে এসেছে দুঃখ জানাতে নয়, আনন্দ জানাতে। বলছে সেই মা : 'বিধবা হবার পর ঐ দুটি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসার করছিলুম। কিন্তু ওরা ভাবলে মানুষের কল্যাণের পথ সংসারে নয়, সন্ন্যাসে। ওরা যদি পরম কল্যাণের পথ তেমনি করে দেখে থাকে, আমি তাতে বাধা দেব কেন? সে তো গৌরবের কথা। সত্যি, কী আছে এই সংসারে?'

মা'র চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। মায়ের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'ঠিক বলেছ মা, সন্তান যদি পরমকল্যাণের পথ খুঁজে পায় তাতে মা'র আনন্দ ছাড়া দুঃখ কোথায়!'

কারণ এক ক্রিয়া বিচিত্র। কারণস্বরূপে আছেন বলে ক্রিয়ায়ও

প্রতিবিম্বিত হয়েছেন। জ্যোৎস্না একই আছে কিন্তু কখনো তা সান্ত্বনা কখনো বা বিষশর। অন্ধকার একই আছে, কখনো তা সুনিদ্রা কখনো তা পাষাণ গুরুভার। একই স্তব্ধতা, কখনো তা বিষণ্ণ কখনো বা সুখ-সমুজ্জ্বল।

একই সন্ন্যাস—যে মা কাঁদে তার সঙ্গেও আছেন, যে মা তৃপ্তি অনুভব করে তার সঙ্গেও আছেন। এবং সর্বক্ষেত্রেই আন্তরিক। প্রসাদেও আছি বিষাদেও আছি। আমি যে কিছু ফেলি না, কাউকে ফেলি না। আমি যে সকলেরটা বুঝি, সকলেরটা ভাগ করে নিই। আমি যে সকলের। আমি যে সংসারীরও মা, সন্ন্যাসীরও মা।

নানারকম পুতুলখেলা খেলছেন মহামায়া। কতগুলোকে শাদা পোশাক পরিয়েছেন কতগুলোকে গেরুয়া। কিন্তু, আসলে, যারা সংসারী তারা হল কালো কাপড়, যারা সন্ন্যাসী তারা হল শাদা। তাই, ঠাকুর বলতেন, সাধু সাবধান।

'কালো কাপড়ে কালি পড়লে অত ঠাওর হয় না।' বললেন মা, 'কিন্তু শাদা কাপড়ে এক বিন্দু পড়লেই সকলের চোখে পড়ে। তাই সব সময় হুঁশিয়ার।'

সংসারীদের জন্যে ক্ষমা, সন্ন্যাসীদের জন্যে কৃপা। আমি আছি বিশ্বজননী, সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করী, সর্বসৌখ্যস্বরূপিনী। সকলে এসে আমার কোলে সমান হবে। যে পথেই যে হাঁটুক কণ্টকে বা কুসুমে, কর্দমে বা কুঙ্কুমে—সব এসে সমাপ্ত হবে আমার অঙ্কাশ্রয়ে। তাই আমি ঘরে আছি মঠেও আছি, কেল্লায়ও আছি, আবার আছি মুক্ত প্রান্তরে।

'সাধুর রাস্তা বড় পিছল।' বললেন আবার মা। 'পিছল পথে সর্বদা পা টিপে-টিপে চলতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে। মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। কুকুরের বখলসের মত গেরুয়া তাকে রক্ষা করবে। গেরুয়া হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন। এ আগুন যে গায়ের উপর রাখতে পারে সে কি কম শক্তিমান?'

তাই সাধুর সদর রাস্তা। তার পথ কেউ রুখতে পারে না।

এক ওড়িয়া সাধু এসেছে কামারপুকুরে। তার প্রতি মা'র কী প্রাণ-ঢালা সেবা! চাল-ডাল যা জোটান সব সাধুকে দিয়ে আসেন, আর জিগগেস করেন, 'সাধুবাবা, কেমন আছ?'

সাধুবাবা ভাবে এ কণ্ঠস্বরটি কার? যার জন্যে সাধনা করছি সে

যখন কাছে এসে কথা কইবে, তখন কেমন শোনাবে তার কলকণ্ঠ?

সাধুবাবার মাথা গোঁজবার একটু জায়গা দরকার। কাঠকুটো যোগাড় করে একখানি কুঁড়ে ঘর তুলে দেবে গাঁয়ের লোকেরা। কিন্তু তুলবে কি, যা আকাশ ভরে মেঘ করে রোজ, এই বুঝি বৃষ্টি এসে গেল! হাওয়া উঠে উড়িয়ে নিল বুঝি খড়-পাতার আস্তানাটুকু। ঠাকুর, রাখো গো রাখো, হাতজোড় করে প্রার্থনা করেন মা, ঘরখানি আগে খাড়া হতে দাও। আগে হয়ে যাক কুঁড়েটুকু তারপর যত পারো ঢেলো।

ঠাকুর শুনলেন মনের কথাটুকু। কুঁড়েঘর তৈরি হল সাধুর। শুধু মাথা গোঁজবার ঠাঁই নয়, দেহ রাখবার ঠাঁই। কদিন পরেই ঐ ঘরে দেহ রাখলেন সাধুবাবা।

সাধুসন্ন্যাসীকে ব্যঙ্গ করছে নলিনী। মা শুনতে পেয়ে তাকে তিরস্কার করে উঠলেন। বললেন, প্রণাম কর, শুচি-শুদ্ধ হয়ে যা। যারা সৎ চিন্তা সৎ কর্মের আশ্রয়ে আছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটুকু আনতে পারলেও মন নির্মল হয়।

রাধুকে বলেন, প্রণাম কর সাধু ভক্তদের।

কে এক সংসারী কোন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। শুনতে পেয়ে মা বললেন সেই সংসারীকে, 'এ রকম কাজও কোরো না। সন্ন্যাসীর একটি কথায়, কথা কেন, একটি চিন্তায় মহা অনিষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

এক সন্ন্যাসী-ছেলে বসে আছে মা'র কাছে। একটি ভক্ত-মেয়ে চলা-ফেরা করছে পাশ দিয়ে। হঠাৎ সেই মেয়ের আঁচলের ডগাটা লাগল সন্ন্যাসীর পিঠে। 'এ কী করলে?' মা ধমকে উঠলেন : 'আঁচল দিয়ে ছুঁয়ে গেলে সন্ন্যাসীকে? এ কী অন্যায় কথা! শিগগির ওর পায়ের ধুলো নাও বলছি।' মেয়েটি তৎক্ষণাৎ প্রণত হল। কোথায় আমার আঁচল? হে তাপসকুমার, যদি দাও তোমার পদধূলি, আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাই।

নামজাদা ঘরের ভক্ত-স্ত্রী, উদ্বোধন আপিসে এসে এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করেছে। যাবার সময় শাসিয়ে গেছে, ঐ ব্রহ্মচারী যদ্দিন আছে ততদিন আর হচ্ছি না এমুখো।

মা'র কানে উঠল। যাচাই করে দেখলেন ভক্তির চেয়েও আভিজাত্যের ভার বেশি স্ত্রীলোকটির। তাই বললেন, 'নাই বা এল! এ সব আমার সর্বত্যাগী ছেলে, এদের সঙ্গে ঝগড়া! এরা না হলে আমি কাদের নিয়ে থাকব?'

ভগবানকে দেখব কোথায়? সাধুকে দেখি ভক্তকে দেখি। দর্শনেই ভববন্ধন ঘুচে যাবে, যেমন সূর্যদর্শনে তমসাবৃত দৃষ্টির বাধা দূর হয়। সাধুর দেহই ব্রহ্মজ্যোতিতে দীপ্যমান। কে জানে, ব্রহ্ম থেকেও হয়তো সাধু সরস, যেমন সমুদ্রের থেকেও গঙ্গা মধুর। সাধুর রুচি রামজপে, রামের রুচি সাধুজপে।

তেমনি, দুটি তরুণী বিধবা এসেছে মা'র কাছে। 'এ কি শাদাপেড়ে কাপড় কেন পরেছ?' মা বলে উঠলেন, 'তোমরা ছেলেমানুষ, পাড়-দেওয়া কাপড় পরবে। নইলে মন যে বুড়ো হয়ে যাবে। মন যদি বুড়ো হয়ে যায় তবে কাজ করবার উৎসাহ পাবে কি করে?' শুধু কথা নয়, নিজের বাক্স থেকে দুজনকে দুখানি কাপড় বের করে দিলেন।

ভক্তকল্পলতিকা জনকজননীজননী সবাইকে বেষ্টন করে আছেন।

কিন্তু যে যাই বলুক, সন্ন্যাসী অপেক্ষা সংসারী ছেলেদের প্রতিই মা'র টান বেশি। কেন হবে না? মা বললেন, 'সন্নেসী ছেলেরা সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ধ্যান-জপ নিয়ে আছে, নিজের চেষ্টাতেই উঠবে। কিন্তু এদের, সংসারী ছেলেদের দেখবে কে? কচি অবোলা ছেলের মত সকলে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আমি ছাড়া ওদের আর কেউ নেই। কাজেই আমাকেই দেখতে হয়।'

চিরদিনের মত সংঘ ছেড়ে চলে যাচ্ছে এক সন্ন্যাসী-ছেলে। বোধহয় উপরওয়ালার হুকুম, কোনো শাস্তির ব্যবস্থা। কিন্তু মাতা-পুত্রের বিচ্ছেদ শাস্তির খবর রাখে না, সান্ত্বনা পায় না আইনের বিচারে।

মা কাঁদছেন, ছেলে কাঁদছে।

কেউ বুঝি চুপি-চুপি এসে দেখে ফেলবে হঠাৎ! আঁচলে চোখ মুছলেন মা, ছেলেকে বললেন, কলঘরে গিয়ে চোখ ধুয়ে এস।

আবার দেখা হল। এবার আর কান্না নয়। ছেলে প্রণাম করল মাকে। মা বললেন, 'এস বাবা। যেখানে বলেছি সেখানে গিয়ে থাকো গে। জেনো, আমি সব সময় আছি তোমার কাছে-কাছে।'

শাস্তি যার দেবার সে দিক, কিন্তু মা দেন শান্তি।

বললেন, 'কোনো ভয় নেই। ছাড়া পেয়ে গেলে। এবার হেসে নেচে কুঁদে লও।' যতদূর দেখা যায় জানলায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন ছেলেকে। চোখের আড়াল হলে আবার কাঁদতে বসলেন।

সাঁড়াসাঁড়ির বানে পড়ে একটি ছেলে প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিল।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কোনোক্রমে। জয়রামবাটিতে খবর এসেছে মা'র কাছে। মা তো ভেবে প্রায় দিশেহারা। কোথাকার কে ছেলে, তার জন্যে দুশ্চিন্তা। ঠাকুরকে তুলসী দিলেন; বললেন, আমার ছেলেকে ভালো রাখো। কলকাতায় চিঠি পাঠালেন, ছেলেকে বোলো, সেরে উঠে একবার যেন দেখা দিয়ে যায়।

ভগবান যে আমাকে অহেতুক কৃপা করবেন, তাঁকে আমি কী দেব? শুধু দেব না কেবল নেব এ দীনতা অসহনীয়। তাই আমাকেও দিতে হবে। কিন্তু কী দিতে পারি, আমার সাধ্য কি! আমি দেব তাঁকে অহেতুক ভালোবাসা। অহেতুক ভালোবাসা কার উপর হতে পারে? শুধু মা'র উপর। তাই ভগবানকে মা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন ঠাকুর। আর এই মা-ই সারদা, সারভূতা, সংসারৈকসারা।

তাঁর অহেতুক কৃপা আর আমার অহেতুক ভালোবাসা। ফুলের সঙ্গে মিলল এসে সুগন্ধ। সত্যের সঙ্গে মিলল এসে সরলতা। ভাবের সঙ্গে মিলল এসে রূপের সুছন্দ।

আরেক ছেলের মঠের উপর বিরাগ হয়েছে। বললে, 'মা, যদি অনুমতি দেন, কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি। এখানে থেকে আমার মন বিগড়ে গেছে। বাইরে থেকে কিছুদিন ঘুরে এলে যদি ঠিক হয়।'

'কোথায় যাবে?'

'কাশী।'

'সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আছে?'

'না। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে-হাঁটতে চলে যাব।'

'কার্তিক মাস, লোকে বলে, যমের চার দোর খোলা। আমি মা, আমি কি করে বলি তুমি যাও। আবার বলছ হাতে টাকাকড়ি কিছু নেই। খিদে পেলে কে খেতে দেবে বাবা?'

আর পা উঠল না যেতে। নিজের কি কষ্ট তার কথা কে ভাবে। কিন্তু মা যে কষ্ট পাবেন তাই যেন সহনাতীত!

সংসার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এসেছে এক ছেলে। মা বললেন, 'ভগবান তোমাকে কতগুলো পোষ্যের ভার দিয়েছেন—তাদের তুমি ফেলে যাবে কি! তুমি ফেলে গেলে তাদের জন্যে আমাকেই তখন ভেবে মরতে হবে। তোমার সংসার ছাড়বার দরকার নেই। আমার সংসার মনে করে তুমি থাকো।'

কিন্তু সেই যে একটি কচি বউ নিয়ে এল সেদিন অন্নপূর্ণার মা, তাকে মা অন্য কথা বলে দিলেন। অন্নপূর্ণার মা একজন স্ত্রী-ভক্ত, বউটিকে নিয়ে এসেছে তার স্বামীকে যেন মা সন্ন্যাস-সংকল্প থেকে নিরস্ত করেন। আপনি যদি অনুমতি না দেন সাধ্য নেই সে সংসার ছাড়ে। বউটি অনেক কাঁদাকাটা করল, অন্নপূর্ণার মাও ফোড়ন দিল।

মা বললেন, 'আমি কি করে নিষেধ করব মা, ওর যে ভগবানের জন্যে ঠিক-ঠিক অনুরাগ হয়েছে।'

বউটি তাকিয়ে রইল সজল চোখে। তা হলে কি আমার কোনো উপায় নেই?

মা ছেলেকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'শোনো, যাবে তো বাঙলা দেশ ছেড়ে যেও না। আর, বউ যদি চিঠিপত্র লেখে উত্তর দিও। আর যদি দেখবার জন্যে খুব ব্যাকুল হয়, দেখা দিও মাঝে-মাঝে।' পরে বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে তো আমার কাছেই থাকতে পারো। থাকবে?'

এক দিকে ঈশ্বরবিরহীর অনুরাগ, আরেক দিকে স্বামীবিরহিণীর কান্না। মা দুয়েরেই মা। দুই বিরহের সেতু। একে দেন খাদ্য ওকে দেন পানীয়। একে দেন অভয়, ওকে দেন আশ্রয়। এক হাত থেকে আরেক হাত। ওকে সান্নিধ্য একে সন্ধান।

...ত্রিশ...

আরো কবার তীর্থে গিয়েছেন মা।

প্রথম গয়ায়, বুড়ো গোপালকে সঙ্গে নিয়ে। আমি তো পারলুম না, তুমি আমার হয়ে মা'র পিণ্ড দিয়ে এস। ঠাকুর বলে রেখেছিলেন। সেইটি পূরণ করলেন।

তারপর সে বছরই পুরী গেলেন। কলকাতা থেকে চাঁদবালি বড় জাহাজে, চাঁদবালি থেকে কটক ক্যানাল-স্টিমারে। আর কটক থেকে গরুর গাড়িতে শ্রীক্ষেত্র। সঙ্গে রাখাল, শরৎ, যোগেন, যোগেন-মা।

বলরাম বসুর ভাই হরিবল্লভ বসু সে অঞ্চলের মস্ত উকিল। খুব রবরবা। মন্দিরের পুরোতরা খুব মানে-গোনে। পুরোতদের মধ্যে একজন

প্রধান হচ্ছে গোবিন্দ শিঙগারী। হরিবল্লভের অতিথি—মাকে খাতির দেখাতে এল গোবিন্দ। বললে, 'মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্যে পালকি নিয়ে আসব।'

'না গোবিন্দ, আমি হে'টে যাব মন্দিরে।' মা বললেন মধুর আর্তির সঙ্গে, 'তুমি শুধু আমাকে আগে-আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেও। আমি দীনহীন কাঙালের মত যাব আমার প্রভুর মন্দিরে, জগৎপতি জগন্নাথকে দেখে আসব।'

কিন্তু মন্দিরে ঢুকে মা'র চোখ বোজা। জগন্নাথের দিকে মুখ করে আছেন বটে, কিন্তু দেখছেন না, চোখ বন্ধ করে আছেন।

'ও কি, দেখ,' যোগেন-মা ঠেলা দিলেন, 'তোমার চোখের সামনে জগন্নাথ। ও কি, চোখ বুজে আছ কেন?'

'উনি আগে দেখুন—'

লক্ষ্য করে দেখল যোগেন-মা, আঁচলের তলা থেকে কি-একটা বের করছেন মা। কি ওটা? ওমা, একটা ফোটো। কার? ঠাকুর রামকৃষ্ণের।

মা বললেন, 'উনি আগে দেখুন। কোনোদিন আসেননি দক্ষিণে। আসবার সুযোগ হয়নি। উনি না দেখলে আমার দেখায় তৃপ্তি নেই।'

আঁচলের মধ্যে ছবি নিয়ে এসেছেন কিন্তু বুকের মধ্যে কতখানি মমতা! যে চিরদিন দূরে-দূরে রেখেছে তাকে নিয়ে এসেছেন বুকের নিবিড়ে। যারা বলে তুমি দূরে আছ, তারা নিজেরাই দূরে আছে। তুমি যে আমার চোখের মধ্যে চোখের মণিটি হয়ে রয়েছ। হায়, চোখ নিজেকে দেখে না। দর্পণ পেলে দেখে। জগন্নাথ আমার সেই দর্পণ। সেই দর্পণে আমি আজ আবার তোমাকে দেখব।

ছবিকে আগে দর্শন করালেন। পরে উন্মীলিত করলেন চোখ।

দেখলেন জগন্নাথ পুরুষসিংহ হয়ে রত্নবেদীতে বসে রয়েছেন আর মা দাসী হয়ে তাঁর সেবা করছেন। কে এই পুরুষসিংহ? ভালো করে চেয়ে দেখ দেখি। রত্নবেদীতে বসে আছেন সেই নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী। সেই দক্ষিণ-ঈশ্বর।

ঠাকুর আর দুবার আসবেন বলেছেন। একবার বাউল সেজে। গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, দাড়ি এতখানি।

একশো বছর পরে আসবেন। এই একশো বছর থাকবেন ভক্তহৃদয়ে। ঘনীভূত মূর্তিতে। তারপর আবার বিগলিত হবেন।

'আমি আর আসতে পারব না।' বললেন মা।

লক্ষ্মী বললে, 'আমাকে তো তামাককাটা করলেও আর আসব না।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'যাবে কোথা? সব কলমির দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব এসে পড়বে।' এ সামান্য কথাটুকু বলতেও ঠাকুর একটি উপমার আশ্রয় নিলেন—কলমির দল।

মা'র দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'তোমার হাতে থাকবে হুঁকো-কলকে, আমার হাতে ভাঙা পাথরের বাসন। হয়তো ভাঙা কড়ায় রান্না হবে। যাচ্ছি তো যাচ্ছি, খাচ্ছি তো খাচ্ছি—দিকবিদিক খেয়াল নেই।' একটু থেমে বললেন, 'ঐ দিক থেকে আসব।' গোল-বারান্দা থেকে বালি-উত্তর-পাড়ার দিক দেখিয়ে দিলেন। হয়তো বা বর্ধমানের দিক।

রত্নবেদীতে পুরুষসিংহ দেখলেন—আবার দেখলেন, লক্ষ শালগ্রাম-শিলার উপর শিব বসে রয়েছেন। স্বর্গলোকে দেবদেব, মর্তলোকে সদা-শিব। ভক্তমধ্যে আশুতোষ, দীনমধ্যে দীননাথ।

পুরী থেকে ফিরে কিছুকাল পরে মা ভাইদের নিয়ে আবার যান কাশী-বৃন্দাবন। কিছুকাল পরে আবার যান পুরী। সঙ্গে যত রাজ্যের আত্মীয় আর ভক্ত-সেবক। দলপতি প্রেমানন্দ।

ধুলোপায়ে রোজ যান জগন্নাথদর্শনে, আবার দর্শনান্তে আঁচলের গ্রন্থিতে বেঁধে নেন রাধুকে। ভিড়ের মধ্যে সে না হারায়। একবার অখণ্ড-লোকে মহামায়া, আবার জীবলোকে মায়াবিনী। একবার রাধা, আরেকবার রাধু।

মা'র পায়ে ফোড়া হয়েছে। তীব্র যন্ত্রণা। পেকে উঠেছে কিন্তু ফুঁড়তে দেবেন না। অথচ এই পা নিয়ে মন্দিরে যাবেন। ভিড়ের চাপে ব্যথা পাবেন, চীৎকার করে উঠবেন, অথচ চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে দেবেন না।

এও একরকম দুঃসহ কষ্ট, অন্তত প্রেমানন্দের পক্ষে। সে একটি ভক্ত ডাক্তার ডেকে আনল। বললে, 'হাতে করে ছুরি নাও। মাকে প্রণাম করো গিয়ে নুয়ে পড়ে। আর অমনি—'

'যদি দেখতে পান?'

'পাবেন না। চাদরে গা ঢেকে মুখে ঘোমটা টেনে বসবেন।'

যেমনি ষড়যন্ত্র তেমনি শর-যন্ত্র। ডাক্তার নুয়ে পড়ে মাকে প্রণাম করলে আর সঙ্গে-সঙ্গে চিরে দিলে ফোড়া। 'মা, আমার অপরাধ নেবেন না—' বলেই পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

তীক্ষ্ম আর্তনাদ করে উঠলেন মা। প্রেমানন্দ আগে থেকেই সরে রয়েছে, সামনে যাকে পেলেন যন্ত্রণার প্রাবল্যে তাকেই বকতে লাগলেন অনর্গল।

ভক্ত ছেলেটি, যে কাছে থাকার দরুন ধরা পড়ে গেছে, বললে আর্দ্র-কণ্ঠে, 'মা, আমারই দোষ। আমি নিজের চোখে দেখলুম এই দুঃখের দৃশ্য। আপনি আমাকে শাপ দিন।'

শাপ দেব? না, এখন যে বেশ আরাম লাগছে। পুঁজ-রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে, বেরিয়ে গিয়েছে যন্ত্রণা-ভর্ৎসনা। নিমপাতার জলে ধুয়ে নিয়ে বাঁধা হল ব্যাণ্ডেজ। যন্ত্রণা প্রায় আর নেই বললেই হয়।

যাকে বকেছিলেন তাকে এখন আদর করলেন চিবুক ধরে।

মা'র ক্রোধ এমনি করেই শোধ হয়। তখন মা'র মুখের সেই তিরস্কার পুরস্কারের মত পুণ্যের জিনিস বলে বেঁচে থাকে।

মা'র খুড়োমশাই গিয়েছিলেন সঙ্গে, কলকাতায় ফিরে এসে মারা গেলেন। মা শুধু ঠাকুরের পুজো আর ভোগের সময় ওঠেন, নয়তো মা সব সময় বসে আছেন খুড়োর পাশে। যেদিন যাবেন, দুপুরবেলা, সেদিন মাকে অনেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠানো হল খেতে। আর, মাও গেছেন খুড়োমশাই তিরোভাব করলেন। সবাই চুপ করে রইল, মা'র খাওয়া সমাধা হোক শান্তিতে। মা কিছু বুঝতে পারলেন কিনা কে জানে, কোনোরকমে হাতে-মুখে করেই চলে এলেন। মাথা নিচু করে সব চুপচাপ বসে আছেন দেখে মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তবে কি খুড়ো নেই?'

'কেন তোমরা আমায় ও ছাইপাঁশ খেতে পাঠালে? একবার শেষ দেখা দেখতে পেলুম না,' বলে উচ্চনাদে কেঁদে উঠলেন। পরে আবার অপূর্ব সৌম্যশীতল অবস্থা ধারণ করলেন। শবদেহের মাথায় ও বুকে করজপ করে দিলেন। মোক্ষদ্বারের কপাট যেন উৎপাটিত হল।

একটি কায়স্থের ছেলে কাঁধ দিয়েছে শবের খাটে। গোলাপ-মা নালিশ করে উঠল : 'শুদ্দুর হয়ে বামুনের মড়া ছুঁলে?'

'শুদ্দুর কে? ছেলে?' করুণার্দ্র চোখে তাকালেন ছেলের দিকে। বললেন, 'ভক্তের কি জাত আছে, গোলাপ?'

ভক্তদের এক জাত, এক জল। তারা সকলেই ছেলে, সকলেরই তাদের চোখের জল।

ঠাকুর বলেছিলেন মাকে, একবার বিষ্ণুপুরে যেও। বিষ্ণুপুর হচ্ছে

গুপ্ত বৃন্দাবন। ঠাকুরের কথা রাখতে মা একবার গেলেন বিষ্ণুপুর।

'যেখানে-যেখানে আমি যাইনি, সব জায়গায় তুমি যাবে।'

কত হৃদয়তীর্থেও হয়তো স্পর্শ পড়েনি আমার, তুমি সেখানে রেখো তোমার অমিয়দৃষ্টি। তোমার মর্ম-মন্ত্র। আমার যা মন্ত্র, তারই মর্ম তুমি। আমি বাক্য তুমি ব্যাখ্যা। আমি ভাষা তুমি ভাষ্য। আমি অন্বয় তুমি অর্থ।

সকলকে তুমি নিমগ্ন করো তোমার অপরিচ্ছিন্ন সত্তায়।

পুরী থেকে এসে গরুর গাড়িতে করে গেলেন তারকেশ্বর। তারপর মাহেশে যান মোটরে করে। রথরজ্জুতে টান দিয়ে আসেন।

ঠাকুরকে একবার রথে চড়ানো হল। মা বসে-বসে অনিমেষ নয়নে তাঁকে দেখতে লাগলেন। 'তাঁকে কোনোদিন নিরানন্দে দেখিনি।' এই কথাটিই আবার প্রত্যক্ষ করলেন চোখের সামনে। রাস্তায় নিয়ে গিয়ে গঙ্গা-পর্যন্ত টেনে আনা হল। তারপর রথ উপরে তুললে। রাধু নলিনীকে নিয়ে মা টানলেন, ভক্ত-মেয়েরাও হাত মেলাল। একটি আনন্দচপলা কিশোরীর মত হয়ে গেলেন মা।

যখন রাস্তায় টানা হচ্ছিল, মা বললেন, 'সকলে তো আর জগন্নাথ যেতে পারে না। যারা এখানে থেকে ঠাকুরকে রথে দেখলে তাদেরও হবে।'

যেটুকু হবার তাই হবে। পুরীতে যখন দেখলেন, এত লোক জগন্নাথ দর্শন করছে, তখন মা কাঁদলেন আনন্দে। আহা, এত লোক মুক্ত হয়ে যাবে! শেষে দেখেন, মুক্তি কি এতই সোজা? শুধু যারা বাসনাশূন্য তারাই মুক্তি পাবে। তাদের সংখ্যা আর কটি? কোটিতে গোটিক মেলা ভার। চক্রের মত সৃষ্টি চলছে। যে জন্মে মন বীতকাম সেইটিই তার শেষ জন্ম।

আমি লক্ষ জন্ম চাই—সে এক বলেছিল নরেন। ভয় কিসের? নরেন হল রোদ্দুরের তলোয়ার—সপ্তর্ষি থেকে এসেছে। সে হল প্রজ্বলন্ত জ্ঞানী। জ্ঞানীর আবার জন্ম নিতে ভয় কি? তাদের তো আর পাপ হয় না। তারা তো সমস্ত বন্ধনের বাইরে।

ঠাকুর কি রথে উঠে বসলেন, না, নেমে বসলেন?

পুরীতে প্রথম দিন যখন জগন্নাথ দর্শনে যান, ঠাকুরের পুজো একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিয়েছিলেন মা। একটা ঘিয়ের টিনের উপর ঠাকুরের ছবি ঠেসান দিয়ে রেখে পুজো করেছিলেন। ঘর-দোর তালা-দেওয়া। মন্দির থেকে ফিরে এসে ঘর খুলে দেখেন ঠাকুরের ছবি নিচে নেমে বসেছে।

সকলে মনে করলে, চোর ঢুকেছিল, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে উপরের ফোটো নিচে নামিয়ে বসিয়েছে। কিন্তু চোর কোথায়? বাইরে থেকে ঘর বন্ধ, ভিতরের জিনিসের কোথাও এতটুকু নড়চড় হয়নি—চোর ঢুকলেই হল? শেষকালে ঠাহর করে দেখে সকলে, বড়-বড় লাল পিঁপড়ে ধরেছে টিনে, ঘিয়ের টিনে। তারই জন্যে আলগোছে ঠিক নেমে বসেছেন।

কে জানে অভিমান করেছেন কিনা। জগন্নাথদর্শনের তাড়ায় আমার পুজো আজ একটু সংক্ষেপে করলে? বা, তাই বুঝি? তোমাকে অঞ্চলে চেপে নিয়ে গেলাম বুকে করে। ঘিয়ের টিনের উপর না দেখে তোমাকে দেখে এলাম রত্নসিংহাসনে।

তোমার কৃপা ছাড়া তো তোমাকেও দেখা যায় না। তোমার আবার অভিমান কি, তোমার শুধু কৃপা।

একটি স্ত্রী-ভক্ত বললেন মাকে, 'মা, ভগবানের যদি কৃপা হয় তখন তো আর সময়ের বাছবিচার করে না। যাকে বলে, আলটপকা এসে পড়ে। অসাধ্যও সুসাধ্য হয়ে যায়।'

'তা বটে। কিন্তু কালের মত কি মিষ্টি হয়?' মা বললেন গম্ভীর মুখে, 'মানুষ অকালে ফলাবার চেষ্টা করছে। আশ্বিন মাসেও তো আম মেলে, কিন্তু জষ্টি মাসের মতো কি মিষ্টি হয়? ঈশ্বরলাভের পথও তেমনি। এ জন্মে হয়তো জপ-তপ, পরের জন্মে ভাব, তার পরের জন্মে সমাধি—এই ভাবে আর কি।'

কিন্তু যাই বলো কৃপার পাত্র হওয়া চাই। রস যে ধরবে ভাব চাই। কৃষ্ণরস ধরতে শ্রীমতীভাব।

কৃপার আবার পাত্রাপাত্র কি। সূর্যের আলো তো সকলের উপর সমান।

কিন্তু ঘরে রোদ আনতে হলে জানলাটিকে মেলে ধরতে হবে। কৃপার হাওয়া তো বইছে চারদিকে, কিন্তু পালটি তো খুলে দিতে হবে আকাশে। মাছ তো রয়েইছে সরোবরে, কিন্তু ছিপটি ফেলে তো বসে থাকা চাই।

'তাই বলি,' মা বললেন, 'নদীর কূলে বসে ডাকো, সময়ে তিনি পার করবেন।'

তা হলে কৃপাতেও বিচার আছে? না ডাকলে পার করবেন না?

করতে দেরি হবে। যার যেমন কর্ম তার তেমনি কৃপা।

'এই দেখ না, আমার যখন অসুখ তখন যদি কেউ আসে দেখা পাবে

না। তখন সে আসে কেন? বলবে, ভাগ্য। আমি বলব, কর্ম। যার যেমন কর্ম তার তেমনি সুযোগ-সুবিধে। কতবার করে আসছে, যাতায়াতে বহু খরচ, তবু যতবারই আসে, ততবারই আমার অসুখ। আবার কেউ হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, দেখা পেল না-চাইতেই। যার পারে যাবার সময় হবে সে দড়ি ছিঁড়ে আসবে, সাধ্য নেই, তাকে কেউ বেঁধে রাখে।'

সে-দড়ি ছিঁড়ব কি দিয়ে?

শুধু কর্ম দিয়ে। কর্ম দিয়ে কর্মক্ষয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। দড়ির সঙ্গে দড়ি ঘষে-ঘষে আগুন করে বন্ধন পুড়িয়ে ফেলা।

এই দেখ না একটি ভক্ত-ছেলে আমাকে দর্শন করে হৃষীকেশ গেল। আমাকে দেখেছে, এখন ঠাকুরকে দেখাও। আমি বললুম, সময়ে দর্শন পাবে। এখন হৃষীকেশ গিয়েই চিঠি লিখেছে, কই, দর্শন তো পেলুম না এখনো? ভাবখানা এই, যেহেতু সে হৃষীকেশ গিয়েছে, ঠাকুর তার জন্যে সেখানে এগিয়ে থাকবেন। সাধু হলে কি হয়, ভগবানকে ডাকতে হবে তো? সাধু হওয়া তো এই নয় যে সাধন-ভজন আর করব না।

ঈশ্বরকে না ডাকলে কী হয়? কী হবে! কিছুই হয় না। কত লোকই তো তাঁকে ডাকছে না, তার উপর তুমিও একজন না ডাকলে! তাতে তাঁর কী! তাঁর অনন্ত আছে। মাঝখান থেকে তুমিই একটা আনন্দের স্বাদ পেলে না, জানলে না কাকে বলে অমৃতের পিপাসা! তুমি বেশ আছো তো তাই থাকো। তাঁর এমনি মায়া তোমাকে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন। আশ্চর্য, এমন আপনজনকে তুমি ভুলতে দিলে?

...একত্রিশ...

বালেশ্বর জেলার কোঠারে বলরাম বোসের জমিদারি। রামেশ্বর যাবার পথে মা নামলেন কোঠারে, থাকলেন প্রায় দুমাস।

দেবেন চাটুজ্জে কোঠারের পোস্টমাস্টার। পাকে-চক্রে প'ড়ে খৃস্টান হয়েছিল—এখন আবার মাকে দেখে ইচ্ছে হয়েছে স্ববাসে ফিরে আসতে। মা অনুমতি দিলেন। যথাবিধি কর্মকরণ শেষ করে গায়ত্রীসহ যজ্ঞোপবীত ধারণ করলে। মাকে এসে প্রণাম করে দাঁড়াল। মা তাকে দীক্ষা দিলেন, প্রসাদরূপে দিলেন একখানি নিজের কাপড়।

মা'র কাছে কারুর কোনো দেরি নেই। যখন হোক চলে এলেই হল। জানবে আমিই তোমার জন্মমৃত্যুর সাথী, তোমার সুখদুঃখের সঙ্গিনী, তোমার অনন্তযাত্রার একমাত্র সহচরী। একবার 'মা যাব' বলো, মাতৃ-অন্বেষী শিশুর মত ব্যাকুল হয়ে ওঠো, ঠিক আমাকে পাবে।

খুরদা-রোড পেরিয়ে চিলকা-হ্রদ চোখে পড়ল। সবে ভোর হয়েছে। উড়ে চলেছে বকের পাঁতি। আবার ঝাঁক বেঁধেছে নীলকণ্ঠের দল। পাখি দেখে মা ছোট বালিকার মত উছলে উঠলেন খুশিতে। নীলকণ্ঠ পাখি দেখে প্রণাম করলেন যুক্তকরে।

বহরমপুর হয়ে মাদ্রাজ হয়ে এলেন মাদুরা। মাদুরায় 'সুন্দর' নামে শিব ও মীনাক্ষীর মন্দির। পাশেই শিবগঙ্গা নামে সরোবর। মা স্নান করলেন। স্ত্রীলোকেরা দীপ জেলে রেখে যায় শিবগঙ্গার পারে। মাও দীপ জেলে রেখে গেলেন।

চারদিকে সব দেবালয় দেখছেন, আর বলছেন, ঠাকুরের কী লীলা!

রামনাদের রাজা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমার গুরুর গুরু পরম গুরু যাচ্ছেন, সব ব্যবস্থা করে দিও।

দুষ্পার জলধির উপর সেতু বেঁধেছেন রামচন্দ্র। লঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়ে অযোধ্যায় ফেরবার পথে স্বামীর কীর্তি দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিপ্লুত হলেন সীতা। ভাবলেন এ কীর্তি এখানে শাশ্বত করে রেখে যেতে হবে। এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শিবমূর্তি।

হনুমানকে বললেন, শিব নিয়ে এস।

জানকীর আদেশ, হনুমান তখুনি মহাবলভরে যাত্রা করল শূন্য-পথে। সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে নানা জাতের শিব নিয়ে এল। কিন্তু আসল শিব, কাশীর বিশ্বনাথকেই আনেনি।

'করেছ কি? আসল শিবই যে নেই।' বললেন সীতা, 'যাও কাশী থেকে বিশ্বনাথকে ধরে নিয়ে এস।'

হনুমান আবার ছুটল বায়ুবেগে।

কখন যে গেল আর ফিরছে না। সীতা অস্থির হয়ে উঠলেন। অন্নপিণ্ড তৈরি করেছিলেন তাই ঢেলে দিলেন। দেখতে-দেখতে সেই পিণ্ড জমে-জমে পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল, আর লিঙ্গের আকার নিলে। সীতা তার নাম রাখলেন রামেশ্বর।

এদিকে, কিছু পরেই ফিরেছে হনুমান। ফিরেছে কাশীর বিশ্বনাথকে সঙ্গে নিয়ে, একেবারে ল্যাজে বেঁধে। এসে দেখে, এই অবস্থা। আগে-ভাগেই শিব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে।

স্বভাবতই, অভিমান হল হনুমানের। অভিমান ক্রমশ ক্রোধে পরিণত হল। সীতার ঐ অন্নপিণ্ডের শিব উৎপাটিত করবার জন্যে তার গায়ে ল্যাজ জড়াল। ল্যাজ দিয়ে টেনেই তাকে সমূলে উপড়ে ফেলবে। বল-প্রয়োগ করামাত্র উলটো ফল হল। শিবের জায়গায় শিব রইল অচল হয়ে, হনুমান ছিটকে পড়ল এক মাইল দূরে, রামঝরকায়।

ভক্তবৎসল রাম হতাভিমান হনুমানকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, তোমার আনা শিবও ফেলা হবে না। হনুমান তখন উঠে বসল। আর ভক্তের মান বাড়াবার জন্যে বললেন, আগে হনুমানের শিবের পূজা হবে, পরে রামেশ্বরের।

ভগবান চিরকালই ভক্তের কাছে হেরেছেন। প্রহ্লাদের কাছে যেমন হেরেছিলেন। হিরণ্যকশিপুর হাত দিয়ে কত মারই না মারলেন তাকে, তবু সে হটল না। শেষে স্তম্ভ বিদীর্ণ করে বেরুতে হল। তারপর যখন বর দিতে চাইলেন, তখন আবার তাঁকে হারাল প্রহ্লাদ, বললে, এ তোমার কেমন কথা? আমি কি বণিক? আমি কি তোমাকে নিয়ে ব্যবসা করতে বসেছি?

শশী মহারাজ পুজোর ব্যবস্থা সব করে রেখেছে। গড়িয়ে রেখেছে একশো আটটি সোনার বেলপাতা। বালুকাময় পাষাণের মূর্তি রামেশ্বর কুণ্ডের মধ্যে আছেন। আধ হাতটাক শুধু উঁচুতে, তাও সোনার মুকুটে ঢাকা। মুকুট সরানো হয় সকালবেলা, গঙ্গাজলে স্নান করবার সময়। গঙ্গাজলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অহল্যাবাঈ। তুমি-আমিও গঙ্গাজল ঢালতে পারি শিবের মাথায়, তার জন্যে মন্দিরের আফিসে ফি জমা দিয়ে ছাড়-পত্র আদায় করতে হয়। তবে মা'র জন্যে অন্য কথা। মা হচ্ছেন গুরুর গুরু পরমগুরু।

মা মন্দিরে ঢুকে বসলেন কুণ্ডের পাশে। মুকুট সরিয়ে গঙ্গোত্রীর জল ঢালা হবে, মা বলে উঠলেন অস্ফুটস্বরে, আপন মনে : 'তোমাকে যে ভাবে রেখে গিয়েছিলাম তুমি দেখছি সেই ভাবেই আছ—'

কথাটা বুঝি কানে ঢুকল গোলাপ-মা'র। সমস্ত গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। উৎসুক হয়ে ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করলে, 'কি বললে, মা?'

আর কী বলে! নিজেরও অলক্ষ্যে কখন বেরিয়ে পড়েছে মুখ থেকে। আর কি পুনরুক্তি করেন!

সেই ত্রেতার সীতা নবরূপ ধরেছেন কলিতে। কলিকলুষহরা সেজেছেন। ঠাকুরের যখন সীতাদর্শন হয়েছিল, দেখেছিলেন তার হাতের বালা ডায়মনকাটা। তেমনি গড়িয়ে দিয়েছিলেন সারদাকে। বলেছিলেন, 'ও রূপ ঢেকে এসেছে। কিন্তু সাজতে-গুজতে ভালোবাসে।'

হায়, সাজ, আমার সাজ দিয়ে কী হবে? আমি আছি আভরণহীনতায়, অভিমানহীনতায়। আগে ঘরের মেঝেতে শুতেন, এখন ভক্তেরা পালঙ্কে এনে শোয়াচ্ছে। 'কই আমি তো কোনো তফাত বুঝি না।' তফাত কি জিনিসে? তফাত মনে। আসলে, ঘুমের মতন বিছানা নেই, খিদের মতন তরকারি নেই। যদি আমার অভাববোধেরই অভাব হয় তবে আমার কিসের দৈন্য? যদি শত দুঃখেও আমি দুঃখ না পাই তবে দুঃখ নিজেই দুঃখিত হয়ে চলে যাবে।

মনের প্রসন্নতাই বিষ্ণুর পরম পদ। আমার মধ্যে যখনই জাগবে প্রসন্নতা তখনই জানবে আমি পরমপদলীনা।

কিসের অভাব আমার? ভূমিতল থাকতে শয্যার কি দরকার? কি হবে উপাধানে, আমার বাহুই তো স্বাভাবিক উপাধান। যখন অঞ্জলি আছে তখন কি হবে ভোজনপাত্রে? বৃক্ষ কি আর ভিক্ষা দেয় না? সরোবর কি শুকিয়ে গেছে? পাহাড়ের গুহা কি রুদ্ধ? আর, ভগবান শ্রীহরি কি শরণাগতকে রক্ষা করা ছেড়ে দিয়েছেন? তা যদি না হয় আমার তবে কিসের অপ্রতুল?

মন্দিরের মণিকোঠা মা'র জন্যে খুলে দিল একদিন। সামান্য একটি দীপ জ্বলছে, তারই ক্ষীণ আলোকে ঝকঝক করছে সমস্ত ঘরখানি।

রামনাদের দেওয়ান বললেন, যদি কোনো অলঙ্কার আপনার পছন্দ হয়, নিতে পারেন অনায়াসে।

আমার কী হবে অলঙ্কারে? আমার হাতে যে হোগলাপাকের বালা আছে, যা ঠাকুর হাত চেপে ধরে খুলতে দেননি, এই তো আমার চরম অলঙ্কার। অলঙ্কার আমার শুচিতা, নির্মলতা, সরলতা। ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা। সুখে দুঃখে ঔদাসীন্য, ক্লান্তিহীন কর্ম, সর্বজীবে সমপ্রেম। দয়া ক্ষমা ব্রত নিষ্ঠা সত্য আর সাম্য। অলঙ্কারের চূড়ামণি হচ্ছে সন্তোষ। যদৃচ্ছালাভ।

১৩১৯ সাল　　পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

১৩১৯ সাল　　　　শ্রীশ্রীমা ও বধ

কিন্তু রাধুর প্রতি বড় মায়া। বললেন, 'আচ্ছা, রাধুর যদি কিছু দরকার হয়, নেবে এখন।' বলে রাধুর দিকে ঝুঁকে এলেন। 'দ্যাখ, তোর যদি কিছু দরকার হয় নিতে পারিস।'

কি সর্বনাশ! এ যে সব হীরে-জহরৎ ঝলমল করছে। মা'র বুক দুরদুর করতে লাগল। রাধু যদি তেমন কিছু একটা চেয়ে বসে! ঠাকুরের কাছে কাতরমনে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'ঠাকুর, রাধুর মনে যেন কোনো আকাঙ্ক্ষা না জাগে।'

রাধুও তেমনি মেয়ে, বললে, 'এ সব আবার কী নেব? আমার পেন্সিলটা হারিয়ে গেছে, আমাকে একটা পেন্সিল কিনে দাও।'

মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। রাস্তায় বেরিয়ে একটা পেন্সিল কিনিয়ে দিলেন রাধুকে।

যত তীর্থ করে আসুন মা'র কাছেও জননী-জন্মভূমি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

জয়রামবাটি থেকে কলকাতা যাচ্ছেন মা, তাঁর খুড়ি বললেন, 'সারদা, আবার এস।'

মা বললেন, 'আসবো বৈ কি।' ঘরের মেঝেয় হাত দিয়ে বার-বার সেই হাত মাথায় ঠেকাতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

... বত্রিশ ...

সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে মাটিতে। উপরে সূর্য নিচে জল। জলকে কি ডেকে বলতে হয়, ওগো সূর্য আমাকে তুমি টেনে তুলে নাও উপরে? সূর্য নিজের স্বভাব থেকেই টেনে নেয়। নিজের স্বভাব থেকেই জলকে বাষ্প করে টেনে নেয়। তেমনি আমি সকলের মা। সকলকে স্বভাববলেই টেনে নেব। তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না।

কত অযোগ্য লোক আসে। দুনিয়ায় না করেছে এমন কাজ নেই, তারাও। যা প্রাপ্য নয় তারও বেশি আদায় করে নিয়ে যায়। শুধু মা বলে ডেকে। শুধু মা বলে আমাকে ভুলিয়ে দিয়ে। কেউ পায়ে হাত দেয়

প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়। আবার কেউ যেন হাতে বোলতা নিয়ে আসে। পায়ে হাত রাখা মাত্রই বোলতা দংশন করে।

'ভালো ছেলের মা তো সকলেই হতে পারে, মন্দটিকে কে নেয়?' বললেন মা, 'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তা মার্জনা করে নিতে হবে।'

আমার অঞ্চল বিস্তীর্ণ কেন? আবর্জনাকে মার্জনা করবার জন্যে।

'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারি না, চালান দিচ্ছি মা'র কাছে।' বললেন প্রেমানন্দ : 'সকলকেই মা কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি, অপার করুণা। সকলকে স্থান দিচ্ছেন সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব বেমালুম হজম হয়ে যাচ্ছে।'

'আমরা না নিলে নেবে কে?' বললেন মা, 'আমরাই তো পাপ-তাপ হজম করতে পারি। সেই জন্যেই তো এসেছি আমরা।'

খোকা-মহারাজ আর বাবুরাম-মহারাজ খাচ্ছে পাশাপাশি বসে। একটা বেড়াল অতিলোভে মুখ বাড়িয়েছে খোকা-মহারাজের পাতে। খোকা-মহারাজ এক চড় বসিয়ে দিলে।

'মারলি?' বাবুরাম আঁৎকে উঠল : 'করলি কি? মা'র বাড়িতে কোন দেবদেবী কি বেশে আছে ঠিক কি।'

খোকা-মহারাজ তো অপ্রস্তুত। ভয়ে মুখ পাংশু হয়ে গেল।

মা সব শুনেছেন। খোকার ম্লান মুখও দেখলেন বোধহয়। বললেন, 'বেড়ালটাকে মেরেছে, বেশ করেছে। বড় দুষ্টু হয়েছে ও আজকাল।'

সামনাসামনি মারও ভালো, কিন্তু কারু নিন্দা কোরো না, ঠাকুর বলেছেন, পিঁপড়েটিরও না। 'খোসা আর চাল, নিন্দা হল খোসা। আমার নরেনকেই লোকে কত নিন্দা করেছে। লোকে কাপড় ময়লা করে, ধোপা সেই কাপড় সাফ করে দেয়। লোকে খারাপ কাজ করে, আর যারা সেই কাজের চর্চা করে তারাই তাদের পাপের ভাগী হয়। কোথায় সাফ করবে, তা না, নিজেরাই কালো হয়ে যায়।'

এ তো হচ্ছে পিছনে থেকে নিন্দা. মুখের উপরও কারু মনে দুঃখ দিয়ে কথা বোলো না। ঠাকুর বলতেন, 'একজন খোঁড়াকে যদি বলতে হয় তুমি খোঁড়া হলে কি করে, তাহলে বলা উচিত, তোমার পা-টি অমন মোড়া হল কি করে?'

ঠাকুর বললেন, উপোস করবে না। উপোস করলে মন সর্বক্ষণ পেটের

দিকে পড়ে থাকবে, ভগবানের দিকে যাবে না। আর মা বললেন, ভোগ দেবার আগে চেখে দেখবে।

দুটিই সরলতার কথা। অনুরাগের কথা। বৈধী ভক্তিকে নস্যাৎ করলেন দুজনে। সমস্বরে বললেন, বৈধী ভক্তি ভক্তিই নয়। ভক্তি হচ্ছে কিছু-না-মানা কিছু-না-জানা ভালোবাসা। অনিমিত্তা, অহেতুকী।

একটি ছেলে মাকে সরবত করে দিচ্ছে। বললে, 'আমি তো আপনার সরবত চেখে দেখেছি।'

'ঠিক করেছ। ভালোবাসার পাত্রকে ঐ ভাবেই দিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে ফল খেতে দেবার আগে চেখে দিত রাখালেরা।'

শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণী চামর দিয়ে বীজন করছে। তুমি আমাকে বরণ করলে কেন? জিগগেস করলেন শ্রীকৃষ্ণ। কত মহাবলী রাজা তোমাকে প্রার্থনা করেছিল, তোমাকে সংকল্পিতা করে দিয়েছিল তোমার বাপ-ভাই। তবু আমাকে তুমি পছন্দ করলে কি দেখে? আমি জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রাশ্রিত। আমি অকিঞ্চন, শুধু নিষ্কিঞ্চনেরই প্রিয়। আমি স্ত্রী-পুত্রের অভিলাষী নই, দেহে ও গেহে আমি উদাসীন, আত্মলাভে তুষ্ট আর গৃহ-দীপের মত অক্রিয়। হে সুমধ্যমে, আমি তোমার উপযুক্ত নই। অধম আর উত্তমের মৈত্রী প্রশস্ত নয়। তুমি আর কাউকে ভজনা করো যাতে তোমার ইহ-পর দু কালই সার্থক হবে, ফলান্বিত হবে।

রুক্মিণী জানত সে-ই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। এই দারুণ বাক্যে তার সমস্ত গর্ব ধূলিসাৎ হল। হাত থেকে খসে পড়ল পাখা, অধোমুখে পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে হর্ম্যতল বিলেখন করতে লাগল। আর সহ্য করতে পারল না, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

পরিহাস বুঝতে পারেনি রুক্মিণী। শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি তাকে ভুজ-বন্ধনে তুলে নিলেন। বললেন, 'বৈদর্ভি, তোমার কোপকুটিল বিপান্ডুর মুখখানি দেখবার জন্যেই ঐ কথা বলেছিলাম। তুমি যে পরিহাস বুঝবে না তা কে জানত! তুমি তো জানো ঘরে ফিরে এসে প্রিয়ার সঙ্গে নর্ম-লীলায় কিছুক্ষণ কালহরণ করা গৃহস্থের পরম লাভ।'

আশ্বস্ত হল রুক্মিণী, কিন্তু উত্তর দিল। সেই উক্তিটিই হচ্ছে রাগানুগা ভক্তির চিত্রলেখা।

বললে, 'আপনি যে অসম মৈত্রীর কথা বললেন তা ঠিক। কোথায় আপনি ত্রিগুণাধীশ্বর আর কোথায় আমি গুণাশ্রয়া প্রকৃতি! আপনি

শত্রুভয়ে সমুদ্রে শরণ নিয়েছেন তার মানে আপনি বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে অন্তর্হৃদয়ে অচলরূপে বিরাজ করছেন। আপনি নিষ্কিঞ্চন সন্দেহ কি, কিন্তু তা আপনি নির্ধন বলে নয়, আপনি ছাড়া আর অন্য কিছু নেই সেই কারণে। অন্য কোন পুরুষের ভজনা করব? যে একবার আপনার পাদপদ্মের ঘ্রাণ পেয়েছে সে কোন জীবন্ত শবের ভজনা করবে? আপনি উদাসীন যেহেতু আপনি নিরপেক্ষ। তবুও আপনার প্রতি আমার অনুরাগ স্থির। আপনার কৃপাকম্পিত দৃষ্টিপাতই আমার সর্ব আকাঙ্ক্ষার উপশম।'

'অনঘে, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ কামশূন্য।' শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে অভিনন্দন করলেন, 'তুমি মায়ামুগ্ধ মন্দভাগ্য নও, তুমি ব্রত-তপস্যার বিনিময়ে বিষয়কামনা করোনি। তুমি উদারকীর্তি তপস্বিনী।'

মা'র প্রেম যেন আরো গাঢ়, আরো পরিপক্ক, আরো শুদ্ধ-শুচি।

'মা, তুমি ঠাকুরকে কি ভাবে দেখ?'

পরিপূর্ণ সমর্পণের সঙ্গে বললেন মা, 'সন্তানের মতো দেখি।'

ভক্ত যখন সত্যি-সত্যি শরণাগত তখন সে মা'র কোলে নবজাত শিশু। তার মুখে কান্না ছাড়া ভাষা নেই, আর তার সমস্ত কান্না মা'র জন্যে। যখনই তার মুখে কথা ফুটবে তখন থেকেই সে অভিযোগ করতে শুরু করবে। জানতে চাইবে অথচ মানতে চাইবে না। এখন, তার এই নির্ভাষ-নির্বাক অবস্থায় তার কিছু জানাও নেই মানাও নেই। তাকে রাখতে চাও তো রাখো, ফেলতে চাও তো ফেল। সে এখন সম্পূর্ণ পরনির্ভর, সর্বতোভাবে সমর্পিত। তার কিছু বলবার নেই কইবার নেই জানাবার নেই বোঝাবার নেই। আছে শুধু একটি কান্না। এই তার একমাত্র মন্ত্র, মাতৃমন্ত্র।

তুমি অগ্নিরূপে মা, হবিরূপে মা। হোতাও তুমি, অর্পণও তুমি। ভোগেও তুমি অপবর্গেও তুমি। বন্ধনেও তুমি মোচনেও তুমি। সংসারেও তুমি সন্ন্যাসেও তুমি। 'প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য।'

হলেই বা তুমি চীরবাসা রুক্ষকেশী ভিখারিনী। রোগশীর্ণা রূপ-হীনা। তবু তুমি আমার মা। যে মুহূর্তে মা বলে তোমার পায়ে নিজেকে অঞ্জলি দেব সেই মুহূর্তেই তুমি রাজ্যেশ্বরী মূর্তিতে সমারূঢ় হবে। তুমি 'পরাপরাণাং পরমা।'

'ঠাকুরের আবির্ভাবের থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়ে গেছে।' বললেন

মা। 'ঠাকুর বলেছেন, আমি ছাঁচ করে গেলুম, তোরা সব ছাঁচে ঢেলে তুলে নে।'

ছাঁচে ঢালা মানে ধ্যান-চিন্তা করা। অভ্যাসযোগে ঠাকুরের ভাবকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করা। তাঁকে ভাবো তা হলেই তাঁর ভাব আসবে।

তা কি পারব? তাঁর ভাব কি ধরতে পারব এই ভগ্ন দেহে, রুগ্ন জীবনে? মাগো, আরো সহজ করে দাও।

করুণাময়ী সহজ করে দিলেন।

দীক্ষার পর এক ছেলে জিগগেস করল মাকে, 'কতবার জপ করব?'

মা বললেন, 'তোমরা সংসারী, তোমরা বেশি করতে পারবে না, একশো আট বার করলেই হবে।'

মোটে? ভক্ত যেন আরো বেশি আশা করেছিল।

মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমার কাছে ওরকম বোলো না।' বেশি পারবে না বলেই তো একশো আট দিয়েছি, এখন দেখ, এই একশো আটই বা হয় কিনা।

'মা, আমার?' আরেকজন এল এগিয়ে।

'তোমার দ্বাদশ বার।'

একজন এল, তার হাতে বাত। আঙুল নাড়তে পারে না।

'তোমার তো বাবা করজপ হবে না। পঁচিশটে রুদ্রাক্ষ দিয়ে মালা করিয়ে নিও। দিনে শুধু একবার স্পর্শ করে জপ করবে। আর—আর ঠাকুরকে ভক্তি করবে।'

'আমার?'

'তোমার শুধু স্মরণ-মনন।'

'মা, আমি তো কিছুই করতে পারি না।' বললে এসে আরেক ছেলে। 'আমার কী হবে?'

'তুমি কী করবে? তুমি কী করতে পারো? তোমার জন্যে আমিই সব করছি।'

আমি তোমার মা, শুধু এইটুকু জেনে থাকো। তুমি অনাথ অনাশ্রয় নও, মা তোমার সব দেখছেন-শুনছেন রাখো শুধু এইটুকু নির্ভরতা। তোমার যে প্রাণ আছে, জেনো সেই তোমার মা। যদি পরের কাছে কৃপা না চেয়ে নিজের কাছে কৃপা চাও, সেই আত্মকৃপাই জেনো মা'র কৃপা। জগন্ময় সমস্ত পদার্থই মা'র প্রাণমূর্তি, মাকে দাও তোমার প্রাণভিক্ষা।

তোমার সমস্ত আর্তির অবসান হবে। তোমার মা-ই আর্তিহন্ত্রী পরমা।

শুধু ধরে থাকো, লেগে থাকো, ছেড়ে দিও না। তোমার মাকে ছেড়ে দিও না।

সেই পতুর কথা মনে আছে? পতু আর মণীন্দ্র? দশ-এগারো বছরের দুটি ছেলে। যেন শ্রীদাম-সুদাম। কাশীপুরের বাগানে, আসে ঠাকুরের কাছে। বলে, তোমার সেবা করব।

দোলের দিন সব বাইরে গেছে রঙ খেলতে। ওরা গেল না। ঠাকুরের তখন কাশি, মাথায় বড় যন্ত্রণা। তাই হাওয়া করতে হত মাথায়। দুটি ছেলে একের পর এক হাওয়া করতে লাগল। একবার এর হাত ব্যথা হয় তো ও, ওর হাত ব্যথা হয় তো এ। ঠাকুর বলছেন, 'যা-যা তোরা নিচে যা, আবির খেলগে যা।'

পতু বললে, 'না মশাই, আমরা যাব না।'

মণীন্দ্র বললে, 'আমরা এইখানে আছি। এইখানেই থাকব।'

পতু আবার বললে, 'আপনি এখানে রয়েছেন আমরা কি ফেলে যেতে পারি আপনাকে?'

শোনো কথা! দশ-এগারো বছরের ছেলে, কোথায় রঙ খেলে স্ফূর্তি করবে, তা না, ঠাকুরকে আঁকড়ে আছে। ঠাকুরকে সেবা করাই তাদের ফাগ-রাগ, তাদের মাধবোৎসব।

কিছুতেই গেল না। শত সাধাসাধিতেও না।

তখন ঠাকুর কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'ওরে, এরাই আমার সেই রামলালা। আমার কে ওরা, তবু আমার সেবা করতে এসেছে। ছেলেমানুষ, তবু আমোদ-আহ্লাদের দিকে মন নেই। আমাকে ফেলে কিছুতেই যাবে না খেলাধুলোয়।' জল পড়তে লাগল চোখ বেয়ে।

এরকম ভাবে পারবে ধরে থাকতে? ঈশ্বরসেবায় লেগে আছ, সংসার ডাকছে তোমাকে তার ক্ষণবসন্তের উৎসবে, আবিরকুঙ্কুম যেখানে অবসিত হবে পঙ্ককর্দমে—সাড়া দিচ্ছ না কিছুতেই—পারবে সেই সাধনা?

তার চেয়ে, সামান্য মানুষ, সহজে চলে এস। ভগবানের মন্ত্র জপ করো। একশো আটবার না পারো দ্বাদশবার করো। দ্বাদশবার নয় তো একবার। একবারও না পারো তাঁতে লেগে থাক, ডুবে থাকো।

'আঙুল দিয়েছেন কেন?' বললেন মা, 'আঙুল দিয়েছেন মন্ত্র জপ করে এর সার্থকতা করতে।'

আর যে ছেলে পারে, যে ছেলে পুকুরপাড়ে বসতে জানে ছিপ ফেলে, সে কত সংখ্যা জপ করবে? মা বললেন, দশ হাজার, বিশ হাজার—এক লক্ষ। যতক্ষণ না মনের ময়লা কাটে। যখনই সময় পাও তখুনি। শুধু মন্ত্রজপ। শুধু গভীরগুঞ্জন।

মা যত ঠাকুরকে ধরিয়ে দিতে চান, সবাই এসে মাকে ধরে। বলে, 'মা, আমরা তো ঠাকুরকে দেখিনি, আমরা আপনাকে জানি, আপনাকে দেখেছি।'

আমার সেই গুরুর মতন হবে আর কি। এক শিষ্য গুরুনামে বিশ্বাস করে 'জয় গুরু' বলে নদী পার হয়ে গেল চোখের সামনে। গুরু ভাবলেন, আমার নামের এত জোর! তখন তিনি 'আমি' 'আমি' বলতে-বলতে পেরুতে গেলেন নদী। সিধে ডুবে মরলেন। তোমরা কি আমাকে তেমনি ডুবে মরতে বলো?

কিন্তু, আমরা, যারা মাকেও দেখিনি? আমাদের কী হবে? আমরা কাকে ধরব?

মা হাসছেন। দেখনি নাকি? তবে কী দেখছ তোমার চারদিকে? অন্ধকার? নৈরাশ্য? নিষ্ফলতা? মা, যখন তোমার হাসিটুকু দেখতে পাচ্ছি তখন কার নাম বা অন্ধকার, কার নাম বা নৈরাশ্য! আর নিষ্ফলতা তো তখন ফলসিদ্ধি।

কুন্তীর প্রার্থনা মনে করো। হে গোবিন্দ, তুমি বার-বার আমাকে ও আমার পুত্রদের বহু বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ। তবু, প্রভু, নিয়ত আমাকে বিপদই তুমি দাও যাতে নিয়তই তোমার দর্শন পাই। যে দর্শন পেলে 'অপুনর্ভবদর্শনম্'—আর সংসারদর্শন হবে না।

... তেত্রিশ ...

শেফালিকা গাছের তলায় একটি শাদা চাদর বিছিয়ে রাখে। শেষ রাতের দিকে টুপ-টুপ করে ঝরে পড়া শুরু হয়। যে ছেলেটি এমনি করে ফুল কুড়োয়, তার নামও সারদা—উত্তরকালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ফুল কুড়িয়ে মাকে পুজো করে।

ছেলে-সারদার সঙ্গে মা-সারদা চলেছেন জয়রামবাটিতে, বর্ধমান হয়ে। দামোদর পেরিয়ে পালকি মিলল না, অগত্যা গরুর গাড়ি। মা গাড়িতে আর

ছেলে লাঠি-কাঁধে গাড়ির আগে-আগে। রাত প্রায় তিন প্রহর, মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ ছেলে দেখতে পেল, বানের জলে রাস্তায় ফাট ধরেছে। আর এ সামান্য ফাটল নয়, দিব্যি একটি খানা। সাধ্য নেই যে গাড়ি যায়। গাড়ির চাকা তো বসে ভেঙে পড়বেই, মা'রও আহত হবার সম্ভাবনা। আর গাড়ি যদি থামিয়ে রাখা হয়, তা হলেও তাল কেটে যাবার দরুন মা'র ঘুম ভেঙে যাবে। এখন উপায়? গাড়িও থামবে না মাও জাগবেন না—কি এর সমাধান? ছেলে-সারদা সেই খানার উপরে উপুড় হয়ে পড়ল, গাড়োয়ানকে বললে, আমার পিঠের উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাও।

গাড়োয়ানের দ্বিধা কাটবার আগেই মা জেগে উঠলেন। চাঁদের আলোয় পলকের মধ্যেই বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। চীৎকার করে গাড়ি থামাতে বললেন গাড়োয়ানকে। গাড়ি থামতেই নেমে পড়লেন। ছেলে-সারদাকে উঠে আসতে বললেন খানা থেকে। 'তুমি কি মরবে আমার জন্যে? তারপর, তুমি না থাকলে এই রাত্রে এই নির্জন জায়গায় আমাকে কে দেখত?' মধুর মমতায় ভর্ৎসনা করলেন : 'তোমার কী বুদ্ধি!'

মা হেঁটে পার হলেন খানা। ছেলে-সারদা আর গাড়োয়ান ঠেলাঠেলি করে খালিগাড়ি পার করে দিলে।

একটি ভক্ত-মেয়ে স্বপ্ন দেখেছে মাকে লালপেড়ে শাড়ি দিতে হবে। মা'র জন্যে কিনে এনেছে শাড়ি। স্বপ্নের কথা বললে সে মেয়ে। মা হেসে হাতে করে নিলেন কাপড়খানি ও মেয়েকে খুশি করবার জন্যে পরলেন। অল্পক্ষণ পরে ফের ছেড়ে ফেললেন। বললেন, 'কি করে পরে থাকি মা! লোকে বলবে পরমহংসের স্ত্রী লাল পেড়ে কাপড় পরেছে।'

তবু, মেয়ের মুখ ম্লান দেখে, আরো কদিন পরেছিলেন। পরে নাইতে যেতেন গঙ্গায়। শেষে দিয়ে দিলেন একজনকে।

এক মহাষ্টমীর দিন বহু মেয়ে মাকে পুজো করছে। প্রায় সকলেই নববস্ত্র দিচ্ছে মাকে। মা'র গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে কাপড়খানা, যেমন কালীকে দেয় কালীঘাটে। সকলের পুজোর শেষে আরেকটি মেয়ে এসেছে কাপড় নিয়ে। সকলে কত ভালো কাপড়, দামী কাপড় দিয়েছে, আর এর কাপড়-খানা নিরেস। একটু-বা কুণ্ঠিত হয়ে আছে মেয়ে, গরিব মেয়ে। পুজো-অন্তে কাপড়খানি মায়ের গায়ে দিতে যেতেই মা খুশি হয়ে বলে উঠলেন, সুন্দর পাড়টি তো! এই শাড়ি আমি আজ পরব। একখানি তো পরতেই হবে আজ।

মেয়েটির দারিদ্র্যলজ্জা হরণ করলেন মা। দারিদ্র্যকে ঐশ্বর্যবান করলেন চিত্তের সন্তুষ্টিতে। সন্তুষ্ট লোকের যে সুখ লোভধাবিত লোকের সে সুখ কোথায়? ঈশ্বরের কাছে দীন হও, তা হলে মানুষের কাছে আর দরিদ্র থাকবে না।

'মা গো, প্রারব্ধের কি ক্ষয় নেই?' আকুল হয়ে প্রশ্ন করল এক ভক্ত : 'ভগবানের নাম করলেও কি হবে না ক্ষয়?'

যা করে এসেছ তার ফল ভোগ করাই প্রারব্ধ। যেমন টিকিটটি কেটে এসেছ তেমনি তোমার আসন। প্রারব্ধের ভোগ না ভুগে তাই উপায় নেই। কিন্তু একেবারে কি জয় করা যায় না প্রাক্তনকে? যায়। সেই জয়ের পথটিই হচ্ছে তপস্যা। প্রাক্তন পুরুষকারকে বর্তমান পুরুষকার দিয়ে জয় করো। কি ভাবে, কোন তপস্যায়? কোন দুঃসাধ্য যোগসাধনে?

অরণ্যগহনে শশিকলাটির মত হাসলেন মা। বললেন, 'শুধু ভগবানের নাম করে। ধরো পূর্বজন্মের কর্মের দরুন, একজনের পা কেটে যাবার কথা। নামের গুণে সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।'

রাধু অসুস্থ, তার পাশে তার মা, 'পাগলী-মামী', এসে বসেছে। রাধু বিরক্ত হচ্ছে, চায় না যে তার পাগলী-মা এসে বসে। 'সত্যিই তো, তুমি এখন যাও না'—মা তাকে সরিয়ে দেবার জন্যে তার গায়ে হাত দিলেন। তাড়াতাড়িতে হাত গা থেকে ফস্‌কে পাগলীর পায়ে লাগল। পাগলী তখন আর্তনাদ করে উঠল : 'কেন তুমি আমার পায়ে হাত ঠেকালে? আমার কী হবে গো?'

মা তো হেসে খুন। এদিকে এত গালাগালি করে, জ্বলন্ত চেলাকাঠ নিয়ে মারতে আসে, অথচ পায়ে হাত লেগেছে বলে ভয়! বাইরে পাগল, অন্তরের গভীরে কোথায় স্থিরজ্ঞান।

তা, পায়ে হাত লাগলে কি হয়? পা তো সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়, এ সৃষ্টির ভিতরে পা দুটোও তো আছে। আসল হচ্ছে মন। হাত-পা চোখ-মুখ কিছু নয়। মন যদি বলে, তুমি, অন্ধকারে, অদৃশ্যালোকেও তুমি। আর মন যদি বলে তুমি নও, শত স্পর্শ-ঘ্রাণ স্বাদ-গন্ধ সত্ত্বেও তুমি নিঃসাড়, তুমি নির্জীব।

ঈশ্বর, আমার মন রাখব তোমার পাদপদ্মে, বাক্যকে নিযুক্ত করব তোমার গুণকথনে, হাতকে তোমার মন্দিরমার্জনায়, কানকে তোমার সৎ-কথাশ্রবণে, চোখকে তোমার বিগ্রহদর্শনে, স্পর্শকে তোমার ভক্তগাত্রসঙ্গমে,

ঘ্রাণকে তোমার পদকমলের সৌরভভোগে, পদদ্বয়কে তোমার তীর্থভ্রমণে, আর মাথাকে তোমার পদবন্দনায়। আর কোনো কাম্যবস্তুতে আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার সমস্ত কামনা তোমার দাস্যেই সহাস্য থাক। তোমার যারা ভক্ত তাদের প্রতি আমার রতিই তোমার প্রতি আমার একমাত্র আরতি।

এক দণ্ডী সন্ন্যাসী এসেছে মা'র কাছে। পশ্চিম ভারতের অধিবাসী, প্রকাণ্ড পণ্ডিত, শাস্ত্র-কাব্য সব মুখস্ত। দণ্ডীরা গুরু ছাড়া আর কারু কাছে প্রণত হয় না, নারী তো কোন ছার। আমি কেউকেটা নই, আমি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আমি ভগবদ্‌ভক্তিতে আরূঢ়—চেয়ে দেখ আমার দিকে—এই বিজ্ঞাপনের ধ্বজাই হচ্ছে তার হাতের ঐ দণ্ড। লোকের মনে ভয় ও সম্ভ্রম উৎপাদনের উদ্যত অস্ত্র। দূরে রহো, নত হও আমার পদতলে, সর্ব-ক্ষণ তাই যেন বলছে লাঠি ঠুকে।

কিন্তু আসল দণ্ডের অর্থ কি? তাৎপর্য কি দণ্ডধারণের?

'দণ্ডগ্রহণমাত্রেন নমো নারায়ণো ভবেৎ।' আমি কারু প্রতি দণ্ডবিধান করব না, সকলের দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব, তারই সাক্ষীস্বরূপ এই দণ্ড। এই দণ্ডই আমার জাগ্রত, উদ্যত, প্রবুদ্ধ নারায়ণ। কারুর প্রতি দ্রোহ না করে মনোবাকদেহের দণ্ডসাধনেরই এ প্রতীক। শুধু ত্রিখণ্ড যষ্টি হাতে নিলেই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী হয় না। ত্রিদণ্ড মানে শম দম আর ক্ষমা। ক্ষমাই হচ্ছে সর্বধর্মনমস্কৃত পরমধর্ম। আর শম-দম হচ্ছে তার নিত্য সখা।

মা'র পায়ের কাছে আভূমি প্রণত হয়ে লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসী। অর্থাৎ সে তার দণ্ড ত্যাগ করলে—অভিমানের দণ্ড, অহংকারের দণ্ড, পাণ্ডিত্য-পিণ্ডের দণ্ড, ক্ষুদ্র সম্প্রদায়বুদ্ধির ধ্বজপট।

মা সঙ্কুচিত হলেন। পা দুখানি সরিয়ে নিতে চাইলেন। বললেন, আপনি কেন প্রণাম করবেন?

কে শোনে! আহা, কী শান্তি, বৈভবের বোঝা কাঁধ থেকে ফেলে দিতে। নামিয়ে দিতে এই গর্বের পর্বতভার। 'চলে গেলে জাগবি যবে, ধন-রতন বোঝা হবে।' তোমাকে চলে যেতে দেব না, তার আগেই সমস্ত সঞ্চয়ক্লান্তির বোঝা তোমার পায়ের তলায় নামিয়ে দেব। আহা কী শান্তি, নিজেকে এমনি সম্পূর্ণভাবে নামিয়ে নিয়ে আসা, নিজেকে নিপাত করে দেওয়া। তারই নাম তো প্রণাম, তারই নাম তো প্রণিপাত।

'সপ্তশতী' থেকে স্তোত্র পাঠ করতে লাগল সন্ন্যাসী।

বললে, 'মা, আশীর্বাদ দাও। শুধু ইহকালের নয়, পরকালেরও।'

একটি ভক্ত ছিল কাছে দাঁড়িয়ে। মা বললেন, 'সন্ন্যাসীকে ফল দাও।'

খুঁজে-পেতে তিনটি আম পেল ভক্ত। তাই উপহার দিল সন্ন্যাসীকে। আম তিনটি মাথায় ঠেকিয়ে ঝুলির মধ্যে পুরল সন্ন্যাসী। সমস্ত হৃদয় অমৃতরসে ভরে নিয়ে চলে গেল।

শূন্য হতে পেরেছিল বলেই পূর্ণ হতে পারল। প্রমাদ থেকে শূন্য করতে পারলেই পূর্ণ হবে প্রসাদে।

সন্ন্যাসী চলে গেলে ভক্তকে মা জিগগেস করলেন, 'আর ফল ছিল না?'

ভক্ত বললে, 'না।'

'দেখ আরো খুঁজে। পাবে।'

সত্যি, আরো একটি আছে। কোথায় লুকিয়ে ছিল বোধহয়, পাওয়া গেল।

মা বললেন, 'সন্নেসীকে দিয়ে এস।'

সন্ন্যাসী তখন রাস্তায় নেমে পড়েছে। ছুটে গিয়ে ভক্ত তার সঙ্গ ধরল। বললে, 'মা আপনাকে আরো একটি আম পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'আরো একটি?' রাস্তার উপরেই সন্ন্যাসী উল্লাসে নৃত্য করে উঠল: 'মা'র কী অসীম করুণা! আমাকে তিনটি ফল দিয়েছিলেন—ধর্ম, অর্থ আর কাম—এখন চতুর্থ ফল, মোক্ষ পাঠিয়ে দিলেন। স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমস্তুতে—'

কিন্তু কেন মা এই চতুর্থ ফল মোক্ষ দিলেন তাকে, তা কি জানে সেই সন্ন্যাসী? কেন মা যোগক্ষেম বহন করে নিয়ে এলেন? ভক্তকে ছুটিয়ে পৌঁছিয়ে দিলেন রাস্তায়? কেন? কিসের জন্যে?

সন্ন্যাসী তার সেই অহঙ্কারের দণ্ড ত্যাগ করেছিল বলে। নিজেকে সম্যক নত ও নিপাতিত করতে পেরেছিল বলে। আদিভূতা সনাতনীর কাছে ভূলুণ্ঠিত হতে পেরেছিল বলে। যে মুহূর্তে অহঙ্কার থেকে বিমুক্ত হতে পারবে সেই মুহূর্তেই তুমি মোক্ষফলের অধিকারী হবে।

কিন্তু, আরো এক প্রশ্ন, কিসের আকর্ষণে সন্ন্যাসী পড়ল পায়ে লুটিয়ে? কিসের টানে মোচন করল দোর্দণ্ড অহঙ্কারের দণ্ড?

সেই সর্বশুক্লা সারদা, মূর্তিমতী সরলতার কাছে কে অহঙ্কারে স্তূপীভূত হয়ে বসে থাকবে? মা'র ডাক যে নির্ভূষণ হবার ডাক, নিরভিমান নিরভিযোগ হবার ডাক। শুধু আভরণ ছাড়লে হবে না,

অভিযোগ ছাড়তে হবে। আর, আমাদের যত অভিযোগ সব এই আভরণের জন্যে।

অঞ্জলি শূন্য করে প্রসাদ নাও মা'র। ঠিক-ঠিক প্রণাম করতে পারলেই ঠিক-ঠিক প্রসাদ পাবে।

একটি মেয়ে প্রসাদের জন্যে ডান হাত বাড়াল।

মা বললেন, 'ওরকম করে বুঝি প্রসাদ নেয়? দুই হাত পেতে অঞ্জলি করে প্রসাদ নাও। প্রসাদে আর হরিতে তফাত নেই। হরিকে পেলে কি এক হাতে ধরবে? না, দুহাতে ধরবে?'

অন্তরে দীনতা আনো। দুটি হাত অঞ্জলিবন্ধ করতে গেলেই অন্তরে দীনতা আসবে। এক হাত নিজের এক্তিয়ারে রেখে আরেক হাত ঈশ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিলে সম্পূর্ণ সমর্পণ হল না। দীনতা মানে হীনতা বা দুর্বলতা নয়। ভগবানে সর্বসমর্পণের যজ্ঞে পূর্ণ আহুতির নামই দীনতা। মা'র জন্যে আর্তনাদই দীনতা। সান্দ্রানন্দা মা। আর তাঁর জন্যে পরমামৃতায়মান আর্তনাদ।

'ঠাকুর নানান জনকে নানান ভাবে খেলাচ্ছেন, টাল সামলাতে হয় আমাকে।' মা বলছেন একদিন মেয়েদের, 'কিন্তু সব নিজের জিনিস, ফেলতে পারি না কাউকে—'

আমি যে সামঞ্জস্যবিধায়িনী। আর, পরিণামপ্রদায়িনীও তো আমিই। 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'

'আপনি যখন থাকবেন না তখন কী নিয়ে থাকব?'

মা হাসলেন। বললেন, 'নাম নিয়ে থাকবে, জপ নিয়ে থাকবে।'

জপই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্বাধ্যায়। আর নামমন্ত্র হচ্ছে ভেলা। নাম তো করি, কিন্তু আনন্দ পাই কই? বলো কি? বেশ তো, যদি আনন্দ না পাও, নামের কাছে প্রার্থনা করো। হে নাম, হে চিন্তামণি, আমার হৃদয়ে তোমার প্রসন্নাভা প্রকাশ করো।

'আর, বলে যাই আরেক কথা, বেশি জিগগেস কোরো না। যেটুকু পেয়েছ তাইতে ডুবে থাকো। সৎসঙ্গে থাকবে, অহঙ্কারকে মাথা তুলতে দেবে না, আর জীবনের সঙ্গিণী করে নেবে লজ্জা আর সরলতাকে—'

আরেক সাধু দেখেছিলাম কাশীতে, নাম চামেলী পুরী। গোলাপ জিগগেস করলে সাধুকে, 'কে খেতে দেয়?' সাধু হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'এক দুর্গা মাঈ দেতী হ্যায়. অউর কোন দেতা?'

বুড়ো সাধুর মুখটি মনে পড়ছে। একেবারে শিশুর মত মুখ। যদি নিরন্তর সৎভাবনায় নিমগ্ন থাকো, মুখে আসবে এই শিশুর লাবণ্য।

কৃষ্ণনাম হচ্ছে পারক, রামনাম হচ্ছে তারক।

দু' অক্ষর নামও যেন আমাদের কাছে কঠিন। দাও আমাদের একের মন্ত্র, একাক্ষর মন্ত্র। সেই মন্ত্র তুমি। তোমাকে ডাকলেই সেই মন্ত্রোচ্চারণ। ন্যাস-প্রাণায়াম বুঝি না, বুঝি না ভক্তি-মুক্তি, না বা ব্রত-তীর্থ, শুধু কাঁদতে পারলেই তোমার মন্ত্র বলা হল। সুখেও মা বলি দুঃখেও মা বলি, ভয়েও বলি জয়েও বলি। তুমি আমাদের সর্বভাবিনী সর্বব্যাপিনী মা।

জানিনা কণ্টকে আছি না কুসুমে আছি, কর্দমে আছি না কুঙ্কুমে আছি—আছি তোমার কোলের মধ্যে।

...চৌত্রিশ...

মা আরো সহজ করে দিলেন।

বললেন, 'কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'

আর কী চাই, আর কত অভয় চাও? কটা আর কুকার্য করো, কুচিন্তাই পর্বতপ্রমাণ। চিতার আগুন নেভে, চিন্তার আগুন নেভে না। বনের নির্জনে গেলাম সেখানেও কুবাসনা উচ্ছিন্ন হয় না মন থেকে। এই তো পূর্বাপর দ্বন্দ্ব। কি করে সম্ভাবনা মনের মধ্যে রোপণ করব! কি করে তা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, মুকুলিত, কুসুমিত, সফলীকৃত হবে?

ঘর-বন দুই সমান হল, কুবাসনা রইল প্রচ্ছন্ন হয়ে। যদি ঈশ্বরকে না আনতে পারি নিমন্ত্রণ করে, তা হলে আমার ঘরও মরুভূমি, বনও মরুভূমি। বৈরাগী বনের মোহে ঈশ্বরকে দূরে রাখল, গৃহীও দূরে রাখল ঘরের মোহে। ঈশ্বরকে আনব কি করে, হৃদয়ে যে কামনা-কণ্টকের আবর্জনা, সেখানে যে ফেনিল তৃষ্ণার আবিলতা। যদি অমলাশ্রুর সরোবরে শতদল না প্রস্ফুটিত করতে পারি শ্রীহরি এসে বসবেন কোথায়?

শুভাননা মা অভয় দিলেন। বললেন, 'কিছু ভয় কোরো না। আমি বলছি—'

'আমি বলছি'—এইখানেই সমস্ত কথার জোর।

'আমি বলছি, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার কোনো ভয় নেই।'

কুকার্য করার কত বাধা। প্রথমত অসাহস, দ্বিতীয়ত অপযশ। একমাত্র শত্রু হচ্ছে কুবাসনা। কিছুতেই পারছি না পরাস্ত করতে। কোথা চরণার্চন-চিন্তা করব, তা নয়, পরের সর্বনাশের চিন্তা করছি। যা কামনা করবার নয় তাকেই আরতি করছি, যা স্বপ্নেরও অসিদ্ধ তাকেই বাস্তবরেখায় খুঁজে ফিরছি এখানে-সেখানে। এমন খেলোয়াড় তো নই যে ঢিল পড়লে তলোয়ারে লেগে ঠিকরে যাবে। আর কাঁহাতক লড়াই করব মনের সঙ্গে? এক বাসনা যায় তো আরেক বাসনা ভেসে ওঠে। এক ছায়া মেলায় তো দেখা দেয় আরেক অপচ্ছায়া। কী গতি হবে আমাদের?

'ও সব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না।' সর্বকল্যাণকারিণী মা বললেন, 'যদি ঈশ্বরে আশ্রয় নাও তিনিই রক্ষা করবেন। চিন্তা যখন কু বলে বুঝতে পারছ, তখন আর ভাবনা নেই। যে ভালো হতে চায় তাকে যদি ঈশ্বর রক্ষা না করেন তবে সে পাপ ঈশ্বরের।'

কেমন জগদীশ্বরীর মত কথা! মা যে পঞ্চাশৎবর্ণরূপিণী তাতে আর সন্দেহ কি।

বললেন, 'আর কিছু নয়, তাঁকে ডাকো, নির্ভর করে থাকো তাঁর উপর। তিনি ভালো করতে হয় করুন, ডোবাতে হয় ডোবান।'

ভালো হতে চাও—ইচ্ছার এই শুক্লধর্মে, এই নৈর্মল্যশক্তিতেই তুমি জয়ী হবে। ইচ্ছাময়ই চলে আসবেন তোমার সাহায্যে।

সংগ্রামই তো সাধনা। জয়ী হবার ইচ্ছাই তো জয়মাল্য।

এক সন্তান এসে বললে মাকে সরলের মত। 'মা, মন বড় চঞ্চল। কিছুতেই ঠিক হয় না।'

অভয়দা বিজয়দা মা বললেন, 'কি এসে যায় চাঞ্চল্যে? ঝড় যেমন মেঘ উড়িয়ে নেয় তেমনি তাঁর নামে বিষয়মেঘও উড়ে যাবে।'

'কিন্তু মা, কাম কিছুতেই যায় না।'

সকল সন্তানের রোগব্যাধির খবর নেন মা। সেই সরলতার কাছে সকলে অবারিত।

প্রসন্ন গম্ভীর স্নেহে মা বললেন, 'কাম কি একেবারে যায় গা? দেহ থাকলেই কিছু না কিছু থাকে। তবে কি জানো?' মা আরো অন্তরঙ্গ হলেন, 'সাপের মাথায় ধুলোপড়া পড়লে যেমনটি হয় তেমনটি হয়ে যাবে।'

কাম না থাকলে যে ঈশ্বরকামনাও থাকবে না। কাম না থাকলে অকাম হবে কি করে? ক্ষুধা না থাকলে অমৃতভোজের আনন্দ পাবে কি করে? ধুলো না থাকলে সূর্য কি করে প্রতিভাত হত? থাক না পঙ্ক, পঙ্কের মধ্য থেকে ফোটাও পঙ্কজকে। থাক না কণ্টক, কণ্টকে বিন্ধ করে ফোটাও আরক্ত গোলাপ।

কামকে প্রেম করো। 'ম' ঠিকই আছে, 'কা'-কে 'প্রে' করো। আমি-কে তুমি করো। 'মি' ঠিকই আছে, 'আ'-কে 'তু' করো। জীবকে শিব করো। 'ব' ঠিকই আছে, 'জী'-কে 'শি' করো। অর্থাৎ ভূমি বা ভিত্তি ঠিকই আছে, নতুন করে সৌধ নির্মাণ করো। সংসারের সঙ, মানে ছলনা বা তামাশাকে ফেলে দিয়ে সারটুকু নাও। যেমন হাঁস জল ফেলে দুধ নেয়। পিঁপড়ে বালি ফেলে চিনি নেয়। আর, সারটুকু দান করি বলেই তো আমি সারদা।

আর কিছু নাম মনে না পড়ে, আমাকে ডাকো। মাকে ডাকো। বলো, যে মা সে-ই সন্তান, যে সন্তান সে-ই মা। বলো, মা-ই বন্ধন, মা-ই মুক্তি। যা এখন ভাবছ বন্ধন, দেখবে সে-ই বন্ধনমুক্তির উপায়। বলো, আনন্দ মা, কাতরতা মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা। জীবন-মৃত্যু শিব-শক্তি। হরগৌরী। রামসীতা। রাধাকৃষ্ণ।

তবে আর ভয় কি, কুণ্ঠা কিসের? আমাদের মা আছেন।

রাত তিনটের সময় ওঠেন। ভোরের প্রথম আলোটি ফুটে উঠতেই ছবিতে দেখেন ঠাকুরের মুখ। তাঁর সমস্ত আরম্ভের স্থিরভূমি। বিছানায় বসে-বসেই ছটা পর্যন্ত মালা ফেরান, জপ করেন। পরে ঠাকুরকে প্রণাম করে বলেন, ওঠো। তারপরে, জয়রামবাটিতে হলে, ঘর ঝাঁট দেন, কাপড় কাচেন, বসেন তরকারি কুটতে। তরকারি কুটতে-কুটতে কত কথা, কত গল্প, কত স্নেহবরিষণ। যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, বাসন মেজেছেন, জল টেনেছেন, ধান কুটেছেন। পুজোর ফুল তোলা বা ফল কাটা বরাবর রেখেছেন নিজের হাতে। একশোটি করে পান সাজেন রোজ। আটটা থেকে নটার মধ্যে পুজো করেন। পরে ভক্তসন্তান কেউ এলে দীক্ষা দেন। দীক্ষান্তে খান একটু মিছরির পানা। তারপরে রান্নাঘরে ঢুকে বামুনকে রেহাই দেন।

ঠাকুরের দুপুরে যা ভোগ হবে রাঁধেন নিজের হাতে। ঠাকুর বলেছেন, 'রাঁধলে মেয়েদের মন ভালো থাকে। সীতা রাঁধতেন, পার্বতী রাঁধতেন, দ্রৌপদী রাঁধতেন। রেঁধে সবাইকে খাওয়াতেন স্বয়ং লক্ষ্মী।'

যা-যা ঠাকুর ভালোবাসতেন খেতে তাই রান্না হত বেশির ভাগ। ঝাল-মশলা নেই বললেই হয়।

এগারোটার পরে স্নান সারেন, বারোটার মধ্যে দুপুরের ভোগ হয়ে যায় ঠাকুরের। সবাইকে খাইয়ে নিজে খেতে বসেন। বড্ড দেরি হয়ে যায়, সবাই বলে, এরই জন্যে অসুখ। তাই শেষ দিকে সবাইকে খেতে বসিয়ে তবে নিজে বসেন। দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত একটু শোন। চারটের সময় জাগান ঠাকুরকে। জাগিয়ে কোণের ঘরে গিয়ে জপে বসেন। এবার করজপ। যদি কেউ ভক্ত আসে ওরি মধ্যে কথা কন। বিকেলের শেষে বসেন একটু বারান্দায়। সন্ধ্যায় আরতি হয়ে যাবার পর একটু প্রসাদ খান। তারপর বিছানায় গিয়ে জপে বসেন। রাত নটায় আবার খেতে দেন ঠাকুরকে। সাড়ে নটার মধ্যেই বাড়ির রাতের খাওয়া শেষ হয়। মা খান দু তিনখানা লুচি, একটু তরকারি, আর খানিকটা দুধ। এগারোটা নাগাদ শুতে যান।

কলকাতায়ও প্রায় এমনি। একদিন অন্তর যান গঙ্গাস্নানে, গোলাপ-মাকে সঙ্গে করে। সংসারের খাটুনি এখানে কম, কেননা সব ভার গোলাপ-মা আর যোগেন-মা নিয়েছে। কিন্তু এখানে অন্যরকমের দেহক্লেশ। সময়ে-অসময়ে, সারা দিনমান ভরে, ভক্তের ভিড়। দীক্ষা দাও ভিক্ষা দাও—এই অশান্ত কোলাহল। দুপুর দুটোর পরও একটু নিরিবিলি হয় না, যেহেতু চারটের মধ্যেই আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে, এক্ষুনি দীক্ষা চাই। এমন অবুঝ, এত স্বার্থপর!

সকাল-দুপুর মেয়েরা, বিকেল সাড়ে-পাঁচটার পরে পুরুষ-ভক্তের দল—এমনি বাঁধা আছে সময়। কিন্তু বিকেল হয়ে গেলেও মেয়েরা কি ওঠে! তখন তাদের পাশের একটা ঘরে পুরে রাখে। আসে পুরুষ-ভক্তের শোভা-যাত্রা। শুধু পা দুখানি মুক্ত রেখে মা বসেন তক্তপোশের উপর, সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে। যদি কথা কইতে হয় বলেন অতি মৃদুস্বরে, মধুস্বরে, কখনো বা ছোট্ট একটি মাথা-নাড়া দিয়ে। আর যদি কেউ অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ তুলতে চাও, অপেক্ষা করো, ভিড় কমুক, হোক একটু নিরিবিলি।

একখানি বসনেই মা'র আকাশ-আচ্ছাদ। জামা নেই জুতো নেই, জটা নেই গেরুয়া নেই—এই হচ্ছেন শ্বেতপদ্মাসনা সারদা। ঘামাচি হলে পাউডার মাখেন, আর দিনে চারবার করে দাঁত মাজেন গুল দিয়ে। এই গুল গোলাপ-মা তৈরি করে দেন। শুকনো তামাক-পাতার সঙ্গে বিচালি

পোড়ার ছাই মিশিয়ে। আর সকালবেলা আফিং খান সর্ষে দানার মত।

এই আমাদের মা। রাজরাজেশ্বরী। আমরা সকলে রাজরাজেশ্বরীর সন্তান।

আমরুল শাক খেতে ভালোবাসেন। আর মিষ্টি-মিষ্টি টক-টক আমের প্রতি পক্ষপাত।

কে এক ভক্ত না চেখে আম কিনে এনেছে। দুপুরবেলা খেতে বসে কেউ মুখে দিতে পারল না। শুধু মা বললেন, 'চমৎকার আম তো! কেমন সুন্দর টক!'

যেখানে যান সঙ্গে ঠাকুরের ছবি তো আছেই, আছে একটি ছোট কৌটো। তাতে সিংহবাহিনীর মাটি। নিত্য পুজার পর একটু-একটু খান সেই মাটি।

বিষ্ণুপুর স্টেশনে গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছেন মা, কোত্থেকে এক হিন্দুস্থানী কুলি ছুটে এসে তাঁর পায়ের তলায় বসে পড়ল। বসে কাঁদতে লাগল অঝোরে। তারই মধ্যে বললে, 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যয় নে কিতনে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?'

কবে স্বপ্নে দেখেছিল বুঝি জানকীকে। এখন দেখল সেই স্বপ্ন চোখের সামনে মূর্তিমতী। তার শরীরী মনোবাঞ্ছা।

মা বললেন, একটি ফুল নিয়ে এস।

পারলে বুকের হৃৎপিন্ড উপড়ে দেয়। ছুটে ফুল নিয়ে এল কুলি। এনে মা'র পায়ের উপর রাখলে। মন্ত্র দিলেন মা।

মা মন্ত্রময়ী। সর্বমন্ত্রপ্রণেত্রী।

...পঁয়ত্রিশ...

'রাধু বললে পাঁজিতে লিখেছে এবার নাকি আশ্বিন মাসে খুব মারামারি হবে।' মা মুখ গম্ভীর করে বললেন।

পাশে কে বসেছিল, শুধরে দিল। বললে, 'মারামারি নয়, মহামারী।'

সরলা বালিকার মত হেসে উঠলেন মা। তবু রাধুর মুখের কথা, ভুল হলেও মিষ্টি। ভক্তের আনা আম, টক হলেও চমৎকার।

সবাই বলে কিনা আমি রাধু-রাধু বলে অস্থির। তার উপর আমার

ভীষণ আসক্তি। কে জানে হয়তো তাই। কিন্তু কেন এই আসক্তিটুকুকে শিকড় করে আঁকড়ে আছি সংসারের মাটি, তা কে বোঝে!

'যদি এই আসক্তিটুকু না থাকত তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা আর থাকত না।' বললেন মা : 'তাঁর কাজের জন্যেই না রাধুকে দিয়ে বেঁধেছেন এই দেহটাকে। যখন রাধুর উপর থেকে মন চলে যাবে তখন এ দেহ আর থাকবে না।'

রাধুর ছেলে হয়েছে। তারপর থেকে রাধুর নানান রোগ। সব সামাল দিতে হচ্ছে মাকে, জয়রামবাটিতে। ছেলে একটু শক্ত-সমর্থ না হবার আগে কি করে ফেরেন কলকাতা।

একবছরের উপর রইলেন সেই গাঁ-ঘরে, রাধুর ছেলেকে কোলে-পিঠে করে। শেষ তিন মাস নিজেই রইলেন রোগ নিয়ে। জ্বরের পর জ্বর। শরৎ-মহারাজ লিখলেন, কলকাতায় চলে আসুন।

রাধুর স্বামী মন্মথ, সে পর্যন্ত মন্ত্র চায়। মা বললেন, 'তোমাকে মেয়ে দিয়েছি, তোমাকে আবার মন্ত্র দিই কি করে? কুলগুরু যে তাহলে চটে যাবেন, আর কুলগুরু চটলে আমার মেয়েরই অকল্যাণ। তুমি আমাকে জ্ঞানগুরু করো।'

মন্মথ তা কানেও তোলে না। মন্ত্র চাই, চাই সমাহিত মতি। তোমার এত কাছে এসে আমি ছেড়ে দেব তা ভেবো না। শুধু মেয়ে নিয়ে ভুলব এত মূর্খ আমি নই।

শেষ পর্যন্ত মন্ত্র দিলেন মা। বললেন জনান্তিকে, 'রাধুর কুষ্ঠিতে বৈধব্যযোগ আছে। মন্মথকে মন্ত্র দিলুম—ঠাকুরের নামে বিধির বিধান কাটা যায়। আমার নরেন বলতো অবতার কপালমোচন।'

বিবেকানন্দ চিঠি লিখছেন বেলুড় মঠ থেকে : 'প্রভু মাকে যেরূপ চালান সেরূপই চলা উচিত। আমরা শুধু পরামর্শ দিতে পারি, আর সে পরামর্শ একেবারেই বাজে। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—আমি তো এইটুকু বুঝি।'

এবার লিখছেন শশী-মহারাজকে, 'শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ভাবতে পার, মা তাঁদের সঙ্গে বসে খেয়েছিলেন। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়? কোনো ভয় নেই, প্রভু আমাদের উপর দৃষ্টি রেখেছেন—সাহস হারিও না, খানিকক্ষণ জোরে দাঁড় টেনে তারপর দম নাও—'

মন্মথর খুড়ো ভোলানাথ চাটুজ্জে কম যায় না। মাকে বেয়ান না বলে মা বলে ডাকে।

ভোলানাথকে চিঠি লেখাচ্ছেন মা। বলছেন, 'লেখ, বাবাজীবন—'

শুনতে পেয়েছে সুরবালা। ঝঙ্কার দিয়ে বললে, 'সে কি গো? সে যে তোমার বেয়াই।'

'হলোই বা। সে আমাকে মা বলে আনন্দ পায়। তার কাছেও আমি তাই।'

আমি সর্বানন্দনন্দিতা। সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী। সর্বৈশ্বর্যসমস্ত-বাঞ্ছিতকরী।

'মাগো, আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সব সময়ে তোমাকে আপনি বলতে পারি না, মুখ দিয়ে তুমি বেরিয়ে আসে। কত অপরাধ করি কে জানে!'

মা হাসলেন। 'কিসের অপরাধ। তোমার মন যা চায় তাই বলো, তাই ডাকো। মা'র সঙ্গে ছেলে কি হিসেব-কিতেব করে কথা কইবে?'

জ্বর যখন যায় না কিছুতে স্বামী সারদানন্দ মাকে কলকাতায় আনবার ব্যবস্থা করলেন। ওমা, এ কি চেহারা হয়ে গিয়েছে! যোগেন-মা আর গোলাপ-মা আঁৎকে উঠলেন। কঙ্কালের উপর শুধু চামড়ার পোঁচ, গায়ের রঙ রান্নাঘরের ঝুলের মত! এ তুমি কী হয়ে গিয়েছ!

স্মেরাননা হাসলেন। বললেন, 'ভয় নেই, ভালো হয়ে যাব।'

এর আগে গোলাপ-মা'র যখন ভারী-হাতে অসুখ করেছিল মা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন আকুল হয়ে, ঠাকুর, আমার গোলাপকে সারিয়ে দাও। যদি আমার গোলাপ-যোগেন না থাকে তা হলে আমি থাকব কি করে?

জ্বর আর যায় না। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি চিকিৎসা শুরু করলেন। কিছুটা ভালো হয়ে অসুখ আবার বাঁকা পথ ধরল। ডাকো নীলরতন সরকারকে। বললেন কালাজ্বর হয়েছে। ইনজেকশান দিতে হবে।

কিছুতেই কিছু হয় না, সমস্ত গা জ্বলে যাচ্ছে। অহোরাত্র পাখার হাওয়া চলেছে। হাতের তালুতে বরফ ধরে থাকলে কিছুটা ভালো লাগে। যোগেন-গো, আমার গা ঘেঁষে বোসো, তোমায় জড়িয়ে ধরলে কিছুটা ঠাণ্ডা হই।

পথ্য চলেছে দুধ-ভাত, কখনো বা তরকারি। দেহে রক্ত নেই তাই যা

চান খেতে দিও। য়্যালোপেথিতে কুলোল না বলে এলো এবার হোমিও-পাথি। ডাক্তার জ্ঞান কাঞ্জিলাল। এসে দেখেন ভক্ত-সেবিকা মাকে ভাত খাওয়াতে চলেছে। ভাতের পরিমাণ বেশি মনে হল ডাক্তারের। রেগে ধমকে উঠলেন। বেশি খাইয়ে মাকে মেরে ফেলবে দেখছি তোমরা। সেবিকাকে বললেন, কী ছাই তুমি সেবা করছ, বিকেলে আমি দুটো পাশ-করা নার্স নিয়ে আসব।

ডাক্তার চলে গেলে মা তাঁর কাছে ডাকলেন সেবিকাকে। বললেন, 'তুই মনে কিছু দুঃখ করিসনে, সরলা। ও ডাক্তারের বাড়াবাড়ি। ও ভেবেছে আমি ওই বুট-পরা মেয়েগুলোর সেবা নেব? ও কী জানে? ও ভেবেছে ভাত বেশি আনলেই আমি বেশি খেতে পারব?'

সেই থেকে মা'র ভাত-খাওয়া চলে গেল। আর খিদে নেই, রুচি নেই।

'কাঞ্জিলাল কেন আমার ভাত খাওয়া নিয়ে চটে গিয়েছিল সেদিন? তাই তো উঠে গেল আমার ভাত-খাওয়া।'

অসুখে ভুগে-ভুগে আখখুটে শিশুর মতন হয়ে গিয়েছেন মা। রাত বারোটার সময় সরলা এসেছে মাকে খাওয়াতে। মা, একটু খাও।

'আমি খাব না, কিছুতে খাব না।' মা ঝামটা দিয়ে উঠলেন, 'তোর শুধু ঐ এক কথা, মা একটু খাও, আর বগলে কাঠি লাগাও। আমি আর পারবোনি বাপু।'

'তবে কি মা, মহারাজকে ডাকব?' সরলা বললে শাসনের সুরে।

'ডাক শরৎকে, ডাক। আমি খাব না তোর হাতে।'

মহারাজ চলে এলো তাড়াতাড়ি। চিরকাল ঘোমটার আড়াল থেকে কথা বলেছেন, আজ স্পষ্ট ইশারা করলেন পাশে বসতে। আশ্চর্য, তার চিবুক ধরে দু আঙুলে চুমু খেলেন, তারপর তার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'ওরা আমাকে কেবল বিরক্ত করে। শুধু খাও-খাও, নয়তো বগলে কাঠি লাগাও। তুমি ওকে বলে দাও ও যেন আমাকে বিরক্ত না করে।'

'না মা, আর ওরা বিরক্ত করবে না।' সান্ত্বনা দিল শরৎ। পরে অল্প কিছুক্ষণ বাদে মমতামাখানো স্বরে বললে, 'মা, এখন কি একটু খাবেন?'

ঠান্ডা মেয়েটির মত মা বললেন, 'দাও।' পরক্ষণেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না, না, সরলা নয়, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও। ওর হাতে আমি খাব না।'

ফিডিং কাপে দুধ খাওয়াতে লাগল শরৎ। এক-আধ ফোঁটা দিতে না দিতেই থামল। বললে, 'মা, একটু জিরিয়ে খান।'

'আহা, দেখতো কী সুন্দর কথা! মা, একটু জিরিয়ে খান।' মা স্নেহে দ্রবীভূত হয়ে গেলেন। 'এ কথাটা ওরা একটু বলতে পারে না? ওদের শিখিয়ে দিতে পারো না এমন গলার স্বর?'

দুধ একটু মা খেলেন কি না-খেলেন, বলে উঠলেন, 'যাও বাবা, শোও গিয়ে। বাছাকে এত রাতে কষ্ট দিলে অকারণে।'

যতদিন জ্ঞান ছিল অসুখের মধ্যে, ডাক্তার যারা এসেছে তাদের পর্যন্ত প্রসাদ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। বেশিক্ষণ কাউকে এক নাগাড়ে পাখা করতে দেন না। হাত ব্যথা হয়ে যাবে যে। আর, তোমার হাত ব্যথা হচ্ছে এ ভাবনা ধরলে আমার চোখে আর ঘুম কই? জয়রামবাটির মেয়ে রমণী কি-কটা ফল নিয়ে এসেছিল মা'র জন্যে। মা তখন জ্বরে বেহুঁস, টের পাননি। জানাতে পারেননি তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা। জ্ঞান হয়ে রমণীকে খবর পাঠালেন, আমাকে ক্ষমা করিস দিদি, তোকে তখন জানাতে পারিনি ধন্যবাদ।

ঠাকুরের ছবি আমার ঘর থেকে পাশের ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাও। এর পর আমি তো আর কল-ঘরে যেতে পারব না, তখন এ-ঘর আর ঠাকুরের মন্দির থাকবে কি করে? আর, আমার বিছানা খাট থেকে নামিয়ে দাও মেঝের উপর।

মা'র দিন কি তবে ফুরিয়ে এল?

'মাগো, কবে তুমি ভালো হবে?'

'ঠাকুর জানেন আদৌ ভালো হব কিনা। ঠাকুরের স্রোতে আমি গা ভাসিয়ে দিয়েছি, যেখানে নিয়ে যাবেন সেই আমার কূল, আমার অকূলের কূল।'

আশ্চর্য, কদিন থেকে রাধুর আর কোনো খোঁজ নিচ্ছেন না। রাধুর তো নয়ই, রাধুর ছেলেরও নয়। এ একেবারে অদ্ভুত ব্যাপার মনে হচ্ছে। যারা হচ্ছে মা'র নিশ্বাস আর প্রশ্বাস, দুই নয়নের তারা, তাদের প্রতি এমন উদাসীন!

একদিন রাধুকে ডেকে আনলেন পাশটিতে। বললেন, 'জয়রামবাটিতে চলে যা।'

রাধু তো আকাশ থেকে পড়ল : 'কেন?'

'আমি বলছি, চলে যা। আর এখানে থাকিসনি।'

রাধু বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার এই অসহায় ভাব মা লক্ষ্য করেও করলেন না। কঠোরকণ্ঠে বললেন সরলাকে, 'শরৎকে বল ওদের জয়রামবাটি পাঠিয়ে দিতে।'

সরলাও বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। অবাক হয়ে বললে, 'সে কি কথা? রাধুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন?'

'খুব পারব।' মা বললেন স্পৃহাহীন শুষ্ককণ্ঠে, 'আমি মন তুলে নিয়েছি।'

মায়া কাটিয়ে দিয়েছি। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। ভেঙে দিয়েছি খেলাঘর। যতক্ষণ মায়ায় আছি ততক্ষণই লিপ্ত, আচ্ছন্ন, দ্রবীভূত হয়ে আছি। যেই মায়া কাটিয়ে দিয়েছি অমনি আমি বীততৃষ্ণ, বীতশোক। হৃদিহীন উদাসীন।

সরলা যোগেন-মা আর শরৎ-মহারাজকে খবর দিলে।

যোগেন-মা ছুটে এল মা'র কাছে। বললে, 'এ তুমি কী বলছ মা? কেন রাধুদের পাঠিয়ে দেবে?'

'এর পর ওদের সেখানেই থাকতে হবে যে। আমি মন তুলে নিয়েছি। আর নয়, চাইনে।'

রাধুর দু চোখ ছলছল করে উঠল। দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত।

'ও কথা বোলো না, মা।' যোগেন-মা কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল : 'তুমি মন তুলে নিলে আমরা বাঁচব কি করে?'

'হাতের তাশ এবার জ্বলে গিয়েছে। আর নয়।' কেমন নিষ্ঠুর শোনাল মাকে : 'কি করবে বলো, মায়া কাটিয়ে দিয়েছি সমূলে। রাধু আমার কেউ নয়, ওর ছেলে আমার কেউ নয়।'

যোগেন-মা সব বললে গিয়ে শরৎ-মহারাজকে। শরৎ-মহারাজের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বললে, 'তবে আর মাকে রাখা গেল না। কী হবে! রাধুর থেকে মন যখন তুলে নিয়েছেন তখন আর আশা নেই।'

আশা নেই! রাধুর বুকে লাগল যেন হাহাকারের করাঘাত। পিসি আর ভাববে না, ভালোবাসবে না, শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করবে না, সহ্য করে ফের পরম ক্ষমায় আশীর্বাদ করবে না। এমন কথা বলতে পারল পিসি? ভাবতে পারল?

সরলাকে শরৎ-মহারাজ ডাকলেন নিভৃতে। বললেন, 'তোমরা সব সময় আছ মা'র কাছে, যে করে পারো রাধুর উপর মা'র মন ফেরাও। যাতে রাধুকে ডাকেন, রাধুকে খোঁজেন, রাধুকে ধরেন হাত বাড়িয়ে। এই এখন মা'র একমাত্র চিকিৎসা। বলো, পারবে?'

'পারবে না।' সরলা কাছে আসতেই বললেন মা, 'যে মন একবার তুলে নিয়েছি তা পারবে না নামাতে।'

দেখি একবার আমি চেষ্টা করে। এই আমার শেষ চেষ্টা। শেষ পাশ।

পাঠিয়ে দিলে ছেলেকে। মা'র বিছানা নিচে, হামাগুড়ি দিতে-দিতে ছেলে প্রায় চলে এল বিছানার কাছাকাছি। রাধু দেখতে লাগল আড়াল থেকে, চৌকাঠের ওপিঠে দাঁড়িয়ে। যা, আরেকটু যা, বোকা ছেলে, ঠাকুমা ঘুমুচ্ছে, ঠাকুমার গলা আঁকড়ে ধর গে যা।

মা ঘুমুচ্ছিলেন, হঠাৎ চোখ চাইলেন। দেখলেন রাধুর ছেলে। মমতাশূন্যের মত বললেন, 'আর এগোসনে। আমি তোর মায়া কাটিয়ে দিয়েছি। আর আমাকে পারবি না জড়াতে।'

ছেলেটা স্তব্ধ হয়ে রইল। একজন ভক্ত-মেয়ে ছিল ঘরে, তাকে মা বললেন, 'ওকে নিয়ে যা। ওকে আর আমি চাই না।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রাধু। ছেলেও কাঁদল। ছেলেকে বুকে ধরল রাধু। কিন্তু রাধুকে কে বুকে ধরে।

অন্নপূর্ণার মা এসেছে দেখতে। ঘরে কারু ঢোকবার অনুমতি নেই বলে দুয়ারের কাছে বসে আছে। মা'র চোখ পড়তেই মা তাকে ডাকলেন ইশারায়। বললেন কাছে বসতে। কাছে বসবে কি, মা'র শরীরের দশা দেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'মা, তুমি যখন থাকবে না তখন আমাদের কী হবে?'

মা'র গলার স্বর বসে গিয়েছে, ভালো শোনা যায় না। তবু বললেন মুখের কাছে ওর কান এনে, 'কোনো ভয় নেই অন্নপূর্ণার মা। একটি কথা শুধু বলে যাই, যদি শান্তি চাও, অন্যের দোষ দেখো না। শুধু নিজের দোষ দেখো। কেউ তোমার পর নয় বাছা, সব তোমার আপনার লোক। সবাইকে আপনার করো।'

দৈবী চিকিৎসাও কম হল না। পাঁচ মহাবিদ্যার অর্চনা হল, পাঁচটি গ্রহপূজা হল। বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরীতলায় শত চণ্ডীপাঠ হল। স্বস্ত্যয়ন হল বারাসতের শ্মশানে।

মা ফিরলেন না। শুধু শরৎ-মহারাজকে বলে গেলেন, 'শরৎ, এরা সব রইল। আমার যোগেন, গোলাপ, আমার সকলে।'

ঐ মা'র শেষ কথা। চৌঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩২৭ সাল, রাত দেড়টার সময় মা মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। মর্ত্যদীপ নির্বাপিত হবার আগে মা'র মরদেহ কালো ও কুঞ্চিত হয়ে ছিল। এখন, আশ্চর্য, দীপাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে এল এক অপূর্ব দিব্যজ্যোতি। আড়ষ্ট-কুঞ্চিত দেহ আস্তে-আস্তে নরম হতে-হতে প্রসারিত হল, মুখের ফোলা কমে গেল একদম, আর সমস্ত আননমণ্ডলে এল এক লোহিত লাবণ্য। প্রতিমার মুখে যেমন রক্ত-দ্যুতি থাকে তেমনি। যারা-যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, যাদের ছিল সেই অমেয় সৌভাগ্য, তারা দেখল, ঠিক আশ্বিন মাসের ভগবতীর মূর্তি, সেই নম্র স্বর্ণাভা, সেই স্থির-নির্মল প্রশান্তি।

সকাল হলে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হল বেলুড় মঠে। তার আগে মা'র কথামত স্নান করানো হল গঙ্গায়। শোভাযাত্রার বাহক সারদানন্দ, শিবানন্দ, মাস্টারমশাই—আরো অগণন মা'র সন্ততি। ধুলো-কাদা মাখা ময়লা-কাপড়-পরা ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের দল।

বেলুড় মঠের নির্ধারিত স্থানে মা'র চিতানির্মাণ হল। বেলা প্রায় দুটোর সময় জ্বলল প্রথম অগ্নিশিখা।

এই আমাদের দক্ষিণাকালী। দক্ষিণেশ্বরের পাশে দক্ষিণাকালী। দক্ষিণেশ্বর-রামকৃষ্ণ দক্ষিণাকালী সারদা। একজন দাক্ষিণ্যময়, আরেকজন সুদক্ষিণা।

দক্ষিণেশ্বর তাই শুধু রামকৃষ্ণের পীঠস্থান নয়, সতীসুন্দরী সারদামণির সিদ্ধতীর্থ। এখানে তপস্যা শুধু রামকৃষ্ণই করেননি, সারদামণিও করে গেছেন। পার্বতীর জন্যে ধূর্জটির শিবশঙ্করের জন্যে অপর্ণার।

মাধুর্যময়ী কৃপাসাগরী। লক্ষ্মী, লজ্জা, বিদ্যা, শ্রদ্ধা, কান্তি, পুষ্টি বিনিশ্চলা। শুধু কি তাই? সর্বকামদা সুরথরাজ্যসাধিকা? সদাশিবকরী আনম্র মেঘচ্ছায়া? শুধু তাই নয়। আবার শক্তিসারা, শক্তিসিংহসমন্বিতা। ঠাকুর বলেন, 'ও কি যে-সে? ও আমার শক্তি।' অসুরসংহন্ত্রী, বৈরিবিমর্দিনী। সর্বভূতভয়ঙ্করী।

অতশত জানি না আমরা। আমরা জানি আমাদের মা। পাতানো মা নয়, সৎ-মা নয়, নকল-ডাকের মা নয়, সত্যিকার মা, জলজীয়ন্ত মা।

দয়ার্দ্রহৃদয়া সর্বদুঃখহা সর্বদোষবিঘাতিনী বসুন্ধরা। মারলে মারবেন রাখলে রাখবেন। মারলেও মা ডাকি, ধরলেও মা ডাকি। মা ডেকেই আমাদের সুখ। সম্পদে রেখেছেন না বিপদে রেখেছেন তা জানি না। শুধু জানি মা'র কোলে শুয়ে আছি। কোথায় ফেলবেন? সর্বত্রই মা'র কোল। কোলের বাইরে আর জায়গা কোথায়? কত দৈন্য আর রাখবেন? আমাদের যে মা আছেন এই ঐশ্বর্য তিনি মা হয়ে হরণ করবেন কি করে?

মাকে যে পায় সে আর চায়·কী সংসারে?
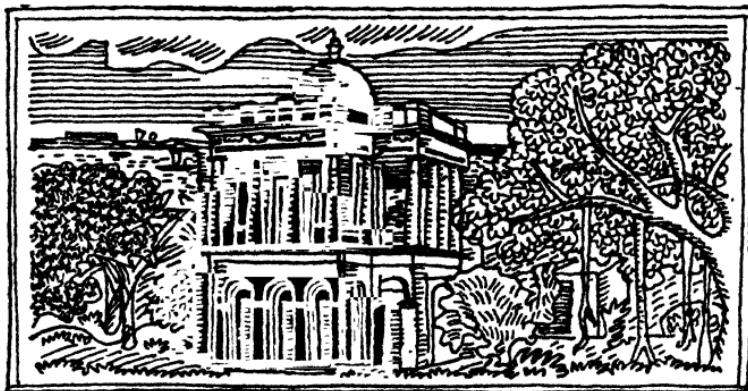
॥ সমাপ্ত ॥

এই রচনার উপাদান নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী থেকে সংগ্রহ করেছি :

"শ্রীশ্রীমায়ের কথা" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (উদ্বোধন)
স্বামী সারদানন্দকৃত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ"
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যকৃত "শ্রীশ্রীসারদা দেবী"
Sri Sarada Devi, the Holy Mother (Ramkrishna Math, Madras)
শ্রীআশুতোষ মিত্রকৃত "শ্রীমা"
অক্ষয়কুমার সেনকৃত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি"
চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়কৃত "শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা"
স্বামী বিবেকানন্দের "পত্রাবলী"
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্তকৃত "শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী"
লক্ষ্মীমণি দেবী ও যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাসকৃত "শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিকথা"
স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত "শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা"
"গৌরীমা" (শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম)

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ অচিন্ত্যকুমার প্রণীত

উপমা রামকৃষ্ণস্য। শ্রীরামকৃষ্ণের যত রসাত্মক বাক্য ও গল্প আছে তার একটি সযত্ন চয়ন ও আলোচনা। কিংবা, যিনি একাধারে আলোক ও লোচন, তাঁর বন্দনা। ব্যাখ্যা করতে করতে বন্দনা। সংসারাশ্রম, সত্যকথা, সরলতা, বিশ্বাস, ব্যাকুলতা, সাকার-নিরাকার, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও সর্বধর্মসমন্বয়—নানা বিষয়ে নানা কাব্যকথা। তা ছাড়া সেই সব আশ্চর্য গল্প—বাইরের বেয়ানের সুতো লুকানো, বুড়ি গয়লানির নদীপার, কৌপীনকা ওয়াস্তে গৃহস্থালী, জটিল বালকের পাঠশালা, স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জল, গাছের উপর বহুরূপী। শুধু আবিষ্কারের দিক থেকে নয়, উদ্ঘাটনের দিক থেকে অদ্বিতীয়। বাংলা সাহিত্যে অশ্রুতপূর্ব। কবি শ্রীরামকৃষ্ণ। (দাম চার টাকা)

'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তত্ত্বের দিক থেকে যেমন গভীর, কাব্যের দিক থেকে তেমনি সুন্দর,' ভূমিকায় বলেছেন অচিন্ত্যকুমার। 'তত্ত্বের তাৎপর্য না-বুঝি কাব্যের আনন্দটুকু আহরণ করি। তত্ত্বের অর্থোপলব্ধিতে সমাহিত না-হতে পারি কাব্যরসাস্বাদে বিমোহিত হই। সুন্দরের চোখ দিয়ে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আনন্দময়ের সত্তা দিয়ে জেনেছেন, সীমাহীন সরলের ভাষায় বলেছেন সুষমান্বিত করে।

'গ্রামের পাঠশালায় পড়েছিলেন কিছুকাল, শুধু নাম দস্তখৎ করতে পারতেন, একছত্র রচনা করেননি নিজের হাতে, তাঁরই কাব্যরূপ উদ্ঘাটন করবার জন্য আহ্বান করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫১ সালের শরৎচন্দ্র-স্মৃতি-বক্তৃতার বিষয় হল কবি শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারের অনেক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে এ একটা। সেই বক্তৃতামালার গ্রন্থনই এই গ্রন্থ।'

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ॥ অচিন্ত্যকুমার প্রণীত

তোমার অন্তর-উৎস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথা ও রূপধারণ সম্বন্ধে যে অপূর্ব বাণী ও তত্ত্ব উঠেছে তা যেমন অভাবনীয় তেমনি মধুর। বাংলার প্রতিভা এখনও বিশ্বকে বহু কিছু দেবে এই মীরাক্‌ল্‌ হচ্ছে তারই প্রমাণ।... **বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩৭ রাজা মণীন্দ্র রোড, পাইকপাড়া**

এই ধর্মবিমুখ জাতীয় সংস্কৃতিবিমুখ ভোগসর্বস্ব লোকায়ত সমাজ, এই ধর্মবিমুখ রাষ্ট্রে এই পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের দূষিত ভাবের দ্বারা বিভক্ত পরিবেষ্টনীর মধ্যে প্রয়োজন হয়েছিল বাংলাসাহিত্যের গড্ডলিকাপ্রবাহকে উজান বহাবার। আমাদের ক্ষীণ চেষ্টায় কোনো ফল হয়নি। কেবল মনে হয়েছিল ঠাকুর কি ধর্মগ্লানির এই যুগে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবেন? তাঁর কৃপা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পাত্রে নেমে এল। তোমাকে আশ্রয় করে তিনি ধর্মবিমুখ তরুণ সমাজে একটা আলোড়ন এনেছেন। আমি জানি তুমি ঠাকুরকে যেভাবে রেপ্রেজেণ্ট করেছ—বিজাতীয়ভাবাপন্ন দূষিত সমাজ সে ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। তবু মনে হয় থীসিসএর জন্যে একটা এ্যাণ্টিথীসিসএর দরকার হয়েছিল সাহিত্য মারফতে। একটা কি সিনথেসিস হবে না? যখন মানব সমাজ এক এক্সট্রীম্‌-এ চলে যায় তখন আর একটা এক্সট্রীম্‌ দেখানোরই প্রয়োজন হয়—তখন মীনএর দিকেই দুই এক্সট্রীম হতে টান পড়ে। ভারতীয় মতে যাকে হাইয়েস্ট কালচার বলা হয় রোমা রোঁল্যাও যাকে হাইয়েস্ট কালচার মনে করেন তুমি তাই পরম হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছ। বাংলাসাহিত্যের দিক হতে এটা দেখাবার প্রয়োজন ছিল।...**কালিদাস রায়, সন্ধ্যার কুলায়, টালিগঞ্জ, কলকাতা**

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নামক পুস্তকখানির প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। বহুদিন পূর্বে রোমা রোঁল্যা মহাশয় বলিয়াছিলেন পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত হইবার মত পরমহংসদেবের একটি জীবনচরিত বাহির হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যদি কোনো মনীষী কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনার পুস্তকখানির ইংরাজি অনুবাদ করেন তাহা হইলে উহার দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ হইতে পারিবে। কিন্তু আমার মনে হয় পাশ্চাত্য দেশের বস্তুতান্ত্রিক অধিবাসীগণ বাইবেলের অলৌকিক কাহিনীগুলি নির্বিচারে বিশ্বাস করিলেও প্রাচ্যের একজন অবতার সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণাই করিতে চাহিবে না।...**ডাক্তার অমলেন্দু গুপ্ত, দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, পাটনা**

আপনার 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' জনসাধারণকে গভীরভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনার লেখার নিপুণতা ঠাকুরের আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি বাংলার জনসাধারণের আগ্রহকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার 'শরৎস্মৃতি' বক্তৃতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রতি সকলকে যেরূপ আকৃষ্ট করিয়াছে তাহা সত্যই অতুলনীয়। ঠাকুর যথার্থই তাঁহার ভাবপ্রচারের জন্য আপনাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন।...**স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচার, কলকাতা ২৬**

তোমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরই সাহায্য করিতেছেন নতুবা লেখনী হইতে এমন অমৃতধারা নিঃসৃত হইত না। তোমার 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বইয়ের দুইটি ভাগ আমি বহুবার পড়িয়াছি এবং পড়িব। তুমি অমৃতবর্ষণ করিতেছ। আমি খুব কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়িয়াছি, কোনও ঘটনা তোমার স্বকপোলকল্পিত নহে। সবই পূর্বে নানা গ্রন্থে ও মাসিকপত্রিকায় প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি ঘটনা ও কথাবার্তা বেশ সাজাইয়া লিখিয়াছ। ভাষা অপূর্ব। তুমি যে অমৃত পরিবেশন করিতেছ তাহাতে তুমি অমরত্ব অর্জন করিবে। সরল প্রাণে ভক্তিপ্রেমের দান বৃথা যায় না।...**কুমুদবন্ধু সেন, ১ ডোভার লেন, কলকাতা**

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' পড়ে ভারি চমৎকার লাগলো। পড়তে পড়তে মনের মধ্যে ঠাকুরের দিব্যজীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি সব যেন দেখতে পেলুম। মনে হল চোখের সামনেই সব ঘটছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র বিশেষ কৃপা না হলে এটি সম্ভব হত না। এই বই রচনায় মনশ্চক্ষে কল্পনায় যা দেখলেন বাস্তবজীবনে আপনার কাছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির অপার্থিব জ্যোতিঃপ্রকাশে সে সব রূপায়িত হয়ে উঠুক।...**স্বামী বেদানন্দ, ১৯বি রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা**

এইমাত্র 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' পাঠ করা শেষ করিলাম। শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণের সেবা অন্য দশজনের মত শুধু ফুলে শুধু জলে এমন কি নন্দনকাননজাত পারিজাত দ্বারা আপনি শেষ করেন নাই। আপনার পূজার উপচার লৌকিক নয়। আপনি তন্ত্রের মন্ত্র দ্বারা পূজা করেন নাই সত্য কিন্তু 'মন তোর' দ্বারা যে পূজা করিয়াছেন তাহা অভূতপূর্ব। এখানে থাকিয়া পত্রিকার মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া অনেক বই কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি কিন্তু এবার জিতিয়াছি।...**হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী, জামালপুর, মৈমনসিংহ**

বিজ্ঞানের ছাত্র আমি। চিত্ত শুষ্ক। ভক্তি কাকে বলে জানি না তবু আপনার অন্তরের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি আমারও মনে যেন সংক্রামিত হল। আপনার শুধু ভক্তি আছে তা নয় আপনার অনুভূতি আছে।...**প্রমোদরঞ্জন গুপ্ত, হুগলী কলেজ, চুঁচুড়া**

সাহিত্যিক খ্যাতি তরুণ বয়েসেই আপনি লাভ করিয়াছেন, আপনার অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু বর্তমান ভক্ত সাহিত্যিক-রূপে যে খ্যাতিলাভ আপনার ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাহার তুলনা নাই। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আপনার 'পরমপুরুষের' কথা ও তাহার প্রশংসায় লোক শতমুখ। আপনার সাহিত্যসাধনা সার্থক হইয়াছে।...**নরেন্দ্রনাথ বসু, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা**

নমস্কার। 'পরমপুরুষ'-এর মুগ্ধ অভিভূত পাঠক হিসাবে অতলান্তিকের পূর্ব উপকূলের এক সহর হইতে বন্ধুর অভিনন্দন গ্রহণ করুন। সাহিত্যিকের সোনার কাঠি দিয়া কত মনে দোলা দিবার ক্ষমতা ও জাগরণীর শক্তি আপনি আনিলেন। কয়েক মাস পূর্বে যখন ভারতবর্ষ ছাড়ি তখনও বই প্রকাশিত হয় নাই। গত সপ্তাহে আমার স্ত্রী কন্যা এখানে আসিবার সময় আপনার বই নিয়া আসিয়াছে।...**বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনরোভিয়া, লাইবেরিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা**

আপনার 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের' সমাদর আমাদের ঈর্ষার বস্তু হয়েছে। এত ভালো লেখা আর এতো তার চাহিদা! আপনি বাস্তবিক যাদুকর। সেই তো বাংলা ভাষা আর শব্দ। কিন্তু কী চমৎকার পরিবেশন-ক্ষমতা আপনার, কি সুন্দরই না চিরপুরাতন বাংলা শব্দের নতুন ব্যবহার হলো আপনার হাতে। পড়ি আর মুগ্ধ হই। এতো ভালো, বিশ্বাস হয় না।...**কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ, রমনা, ঢাকা**

আপনার 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' আদ্যোপান্ত বহুবার পড়িয়াছি। এখনও দৈনিক প্রায়ই পড়িয়া থাকি। বইখানি পড়িয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। বলিতে কি ইহা আমার জীবনসন্ধ্যায় একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।...**বিশ্বনাথ গুহ রায়, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা**

আপনার 'পরমপুরুষ' থেকে খানিকটা সেদিন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়কে পড়ে শোনাচ্ছিলাম। খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, 'অচিন্ত্যবাবু পঞ্চাশ পেরিয়েছেন নিশ্চয়ই, না হলে এমন হৃদয়ঙ্গম হয় না। আর হৃদয়ঙ্গম না হলে এমন জিনিস কলম দিয়ে বেরুতে পারে না।' সত্যি বয়স আপনার যাই হক, এই বই লেখার পর আপনার বনে না গিয়ে উপায় নেই।
...**রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া**

...............১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দাম ৫৲ ৪৲ ৫৲...............

সিগনেট বুকশপ। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। ১৪২-১ রাসবিহারী এভিনিউ